অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমান চেয়ারম্যান ড. আশফাক হোসেন যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঔপনিবেশিক বিশ্বায়ন' বিষয়ে পিএইচডি করেছেন।

যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত স্টাডিজ ইন পোস্ট কলচার কনফ্লিক্ট জার্নাল, Modern Asian Studies এবং London School of Economics থেকে প্রকাশিত Journal of Global History তে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ, গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত The University of Dhaka And The Making and Shaping of Bangladesh (2021) এবং শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ: অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (২০২২) গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক তিনি। তাঁর লেখা গ্রন্থ Colonial Globalization and Its Effects on South Asia: Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874–1971 (2022) বিশ্বখ্যাত Routledge/Taylor & Francis Group কর্তৃক লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও Monohor (India) এবং Routledge (New York) থেকে যৌথভাবে প্রকাশিত The Mughals and the North-East (2023) গ্রন্থে তাঁর লেখা একটি অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের (CARASS) পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

কাজী সামিও শীশ

অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, আন্তর্জাতিক শিক্ষা, শিক্ষা গবেষণা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: অনন্দ নিকেতন (১৯৯৯, ২০০১), প্রোগ, গভর্নর পত্র (২০০৮), মেঘের সাথে কথা (২০১১), জানালার জেলায় (২০১২), Peace Education vs War: A Critical Analysis (2017), A Galtungian Interpretation of Madrasa Graduates Phenomenon on Violence (2018), দাদাবুড়োর জেলা (২০২৩), সর্বজনের শিক্ষা : অ এ শিশি অধিকার (২০২৩)। বর্তমানে তিনি উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে (CARASS) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত।

...এই গ্রন্থটি আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাসের অংশ। সমষ্টির পক্ষে ইতিহাস ভুলে যাওয়া এবং ব্যক্তির পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া একই রকমের দুর্ঘটনা। তবে ইতিহাস তো শুধু ঘটনার ধারাবিবরণী নয়; ইতিহাসে ঘটনার পর্যালোচনা থাকে, থাকতে হয় কার্যকারণ-সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আবশ্যক হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবরও। ...

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

978-984-36-0697-8

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী
সম্পাদক
আশফাক হোসেন
কাজী সামিও শীশ

মুক্তিযুদ্ধে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী

সম্পাদক

আশফাক হোসেন

কাজী সামিও শীশ

... একজন সৈন্য হাসিনা হাফিজের চুল ধরেও টানে। তখনও হাসিনার প্রাণ ছিল কিন্তু নীরবে মৃতের ভান করে পড়েছিলেন এবং ব্যথা সহ্য করছিলেন। ... হাসিনার ছোটো ভাই চিৎকার করে কাঁদে। সেনারা শিশুটির পা ধরে জোরে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে এবং শিশুটি মারা যান। হাসিনার আরেক ভাই: ... গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, সে তৃষ্ণায় পানি চাইলে হাসিনা তাঁকে পানি পান করানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মারা যায়। হাসিনার বাবারও প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আর হাসিনা বালিশ থেকে কাপড় বের করে সেগুলো দিয়ে চেপে ধরে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। এভাবে সে ২৫শে মার্চের পুরো রাত কাটায় ...

... ২৬ তারিখ সকাল হতেই জগন্নাথ হল মাঠে অবস্থান করা বকুল রানী লোকমুখে শুনতে পান, তাঁর স্বামী জগন্নাথ হলের তৎকালীন দারোয়ান সুনীল চন্দ্র দাসকে মেরে ফেলেছে পাকবাহিনী। ... মেডিকেলে পৌঁছানোর পর তার সন্তানেরা কান্নাকাটি করে বলছিল, "মা গো মা, আমারে খাওন দাও।" কিন্তু সন্তানদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য এক পয়সাও ছিল না বকুল রানীর হাতে।...

... শিবেন্দ্র চন্দ্রের মা রেণুবালা দেবী ...স্বামী ও বড়ো সন্তানকে হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন।... যত্নের অভাবে মাথার সব চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীর মধ্যে এটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাঁরা রেণুবালা দে'র কাছে 'জলপড়া' নেওয়ার জন্য আসতেন। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন জট পড়ায় তাঁর মধ্যে নিশ্চয় কোনো দৈব ক্ষমতার আগমন ঘটেছে এবং তিনি বোধহয় সিদ্ধি জানেন। ...

এই বইটির মাধ্যমে আমরা আশা করি বর্তমান প্রজন্ম, গবেষক এবং ভবিষ্যত ইতিহাসবিদেরা মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অবদানের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন এবং তাঁদের সম্মান দেবে অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের জাতির এই গৌরবময় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি যেমন শিক্ষণীয়, তেমনি এ থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

মুক্তিযুদ্ধে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী

মুক্তিযুদ্ধে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী

সম্পাদক

আশফাক হোসেন
কাজী সামিও শীশ

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী

সম্পাদক
আশফাক হোসেন
কাজী সামিও শীশ

প্রকাশক
উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
টিএসসি (TSC) কম্পাউন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
carass@du.ac.bd

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪৩১, ডিসেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ
শাওন আকন্দ

মুদ্রণ
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
press@du.ac.bd

পরিবেশক
বাতিঘর, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ঢাকা।
পাতাপ্রকাশ, দেওডোবা বানিয়াপাড়া, রংপুর-৫৪০০।

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পূর্বানুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ, কিংবা যে-কোনো ধরনের রূপান্তর নিষিদ্ধ।

মূল্য
২৫০ টাকা (কথায়: দুইশত পঞ্চাশ টাকা), ৫ ডলার
© Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS), University of Dhaka
Ashfaque Hossain and Kazi Sameeo Sheesh (Eds.), *Muktijudhwe Dhaka Bishwabidyler Kormocharee* (Dhaka University employees during the Liberation War), Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS)
Price: 250 Tk, US $5
ISBN: 978-984-36-0693-8
DOI:https://doi.org/10.69862/MuktiJudheweDUKormocharee2024

সম্পাদনা পর্ষদ

[উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ]

অধ্যাপক আতিউর রহমান- সভাপতি

অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান - সদস্য

অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির– সদস্য

অধ্যাপক শামসাদ মর্তূজা- সদস্য

অধ্যাপক গোলাম মাওলা- সদস্য

অধ্যাপক আশফাক হোসেন- সম্পাদক

সম্পাদক

আশফাক হোসেন
পরিচালক
উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী সামিও শীশ
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা সহযোগী

মো. হাসাইবুর রহমান

ডেইজি আক্তার

শায়লা ইসলাম নীপা

রুজেল মিয়া

শাহরীন ফারাহ খান

তারানা তাবাচ্ছুম সুইটি

মোস্তাকিম

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস নয়, এটি লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও সংগ্রামের এক মহাকাব্য। এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে যেমন ছাত্র-শিক্ষক, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের অবদান রেখেছেন, তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা। তাঁদের অনির্বাণ নিষ্ঠা, অকুতোভয় মনোবল এবং কর্তব্যে অনমনীয়তার ফলে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অনন্য অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। এই গবেষণাগ্রন্থটি সেই কর্মচারীদের আত্মত্যাগ ও নিরলস অবদানের কাহিনীকে তুলে ধরেছে, যা প্রায়শই আমাদের স্মৃতি ও ইতিহাস থেকে অবহেলিত থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু তাঁদের নিয়মিত দায়িত্ব পালন করেননি; তাঁরা ছিলেন এক একটি প্রতিরোধের নিঃশব্দ স্তম্ভ। ছাত্রসহ নিরাপত্তাহীন মানুষদের আশ্রয়দান, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ, গোপন বার্তা আদান-প্রদান কিংবা বিপদে অগণিত জীবনকে সুরক্ষা প্রদান–এইসব কাজ তাঁরা যেন এক অদৃশ্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় যখন শহরের পরিবেশ অত্যন্ত অস্থির ছিল, তখনও এই কর্মচারীরা নির্ভীক চিত্তে দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন হলেও তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও জাতীয় চেতনাকে সমুন্নত রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা অসাম্প্রদায়িকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারীরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন। তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে মানবতার জন্য কাজ করার অভিপ্রায় স্পষ্ট ছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের বর্বর আক্রমণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপরই অত্যাচার চালিয়েছে, যা তাদের বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টার প্রতিফলন। কিন্তু এসব আঘাত সামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করেছেন। এর মাধ্যমে তারা দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটির মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ, যা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত পরিচয়ের অংশ। তাদের এই চেতনা স্বাধীনতার আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং আজও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্রস্থল নয়; এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে পরিবর্তনের অন্যতম প্রেরণাস্থল হিসেবে পরিচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, এবং সেই অবদানের অংশ হিসেবে কর্মচারীরাও তাদের সাহসিকতা ও ত্যাগের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমরা তাঁদের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি এবং আশা করছি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের তাঁদের কথা তুলে ধরতে পারছি। সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়া আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়।

বর্তমান সময়ের কর্মচারীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা অগণিত শিক্ষার্থী ও এখানকার সেবা গ্রহণে আগ্রহী জনগণকে সেবা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে তাদের পূর্বসূরিদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে পারেন এখনকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, ঠিক যেই মহৎ কাজটি ১৯৭১-এ করেছিলেন তাদের পূর্বসূরিগণ। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে শহিদ এই বীরদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে যেমন নিজেদের মানবিক বিকাশ ঘাটতে পারেন, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও হতে পারেন পাথেয়।

এই বইটির মাধ্যমে আমরা আশা করি বর্তমান প্রজন্ম, গবেষক এবং ভবিষ্যত ইতিহাসবিদেরা মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অবদানের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন এবং তাঁদের সংগ্রাম থেকে অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের জাতির এই গৌরবময় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি যেমন শিক্ষণীয়, তেমনি এ থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

গবেষণা-কাজে মেধা ও নিষ্ঠার সাথে সহায়তা করেছেন তরুণ গবেষক মো. হাসাইবুর রহমান, ডেইজি আক্তার, শায়লা ইসলাম নীপা, রুজেল মিয়া, শাহরীন ফারাহ খান, তারানা তাবাচ্ছুম সুইটি, মোস্তাকিম। সেন্টারের মুদ্রাক্ষরিক সরদার ময়েনউদ্দিন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে গ্রন্থটির কম্পোজের পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন। সার্বিক কাজ সমন্বয় ও তত্ত্বাবধায়ন করেছেন সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও শীশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছেন ডাকসু সংগ্রহশালার সাবেক আলোকচিত্রী ও সংগ্রাহক গোপাল দাস এবং কুমিল্লার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথোপকথনের ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক রাজিব আহমেদ। গবেষণা কাজে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক আফসান চৌধুরী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে ১৯৯৬-৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফারহানা আবেদীন, কাজী সামিও শীশ, গাজী মুনিম শাহরিয়ার বায়েজিদ, মাসুদ পারভেজসহ কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধে কর্মচারীদের ভূমিকা নিয়ে একটি কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্য এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা মুখবন্ধটি এই বইয়ের উৎকর্ষ ও গভীরতা বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটি প্রকাশনার কাজ করেছে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সেন্টারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন
পরিচালক
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪।

মুখবন্ধ- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী i

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়
২৫শে মার্চ ১৯৭১ ১৫
ভয়ংকর এক রাতের কথা: মৃতের স্তূপে প্রাণের আহাজারি

তৃতীয় অধ্যায়
২৬শে মার্চ সকাল, ১৯৭১: তবু ভোর হয় ৪৯

চতুর্থ অধ্যায়
অবরুদ্ধ থেকে বিজয় পর্ব ৮৯

পঞ্চম অধ্যায়
তুলনামূলক মৌখিক ইতিহাস: মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য ১২১

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার ১৩৭

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ ১৪৩

পরিশিষ্ট- ১
মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ কর্মচারীদের তালিকা ১৪৭

পরিশিষ্ট-২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মচারীর ভাষ্য ১৫৭

পরিশিষ্ট-৩
অনুলিখন: কুমিল্লায় সংঘটিত এফজিডি ২১৯

পরিশিষ্ট-৪
অনুলিখন: নরসিংদীতে গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ ২৪৩

পরিশিষ্ট-৫
অনুলিখন: খুলনায় গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ ২৫৭

নির্ঘণ্ট ২৯১

মুখবন্ধ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের সকল অংশের, শ্রেণির, সম্প্রদায়ের, পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করেছেন। পূর্ববঙ্গবাসীর জন্য যা ছিল মুক্তির জন্য লড়াই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দিক থেকে সেটি ছিল পরিকল্পিত এমন একটি গণহত্যা, যার তুলনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল।

গণহত্যার সূচনাতে হানাদার বাহিনী যে কয়টি লক্ষ্যবস্তুকে ভেঙে ফেলবার জন্য নির্দিষ্ট করেছিল; তাদের মধ্যে একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা তাদের শত্রুপক্ষের প্রধান অবস্থানভূমি হিসেবে স্থির করে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। 'অপারেশন সার্চ-লাইট' নামে যে গণহত্যার পরিকল্পনা তারা তৈরি করেছিল তাতে সুস্পষ্টভাবেই লেখা ছিল Operation-এর সাফল্যের জন্য প্রথমে দরকার হবে ঢাকা শহরের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ; এবং তার জন্য "Dacca University will have to be occupied and searched" পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫শে মার্চ রাত্রে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ চালায়, এবং গোলাবারুদ ব্যবহার ও অগ্নিসংযোগ সহ নির্বিচারে গণহত্যা ঘটাতে থাকে। কিছু ব্যক্তি চিহ্নিত ছিলেন, যেমন মধুর ক্যান্টিনের মধু দা, কিন্তু তার বাইরে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যতগুলো আবাসে অতিশয় দ্রুততায় তারা প্রবেশ করতে পেরেছে প্রত্যেকটিতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তাদের আক্রোশের কারণ ছিল এই ধারণা থেকে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও শিল্পপতিরা পূর্ববঙ্গকে যেভাবে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে রেখেছিল তার বাস্তবায়নের পথে প্রতিবাদের শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই, এবং সেটা ঘটে পাকিস্তান নামের অস্বাভাবিক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই। প্রতিবাদের সূত্রপাত রাষ্ট্রের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে ব্যবহার্য ভাষা কী হবে সেটি নিয়ে। তারা উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল ওই ভাষার সাহায্যে রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি জাতি গড়ে তোলা। ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এই দাবির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু ধর্ম যে জাতীয়তার মূল ভিত্তি হতে পারে না, বরং ভাষাই যে জাতিগঠনের প্রধান উপাদান এটা না-বোঝার মতো বুদ্ধির অভাব তাদের ঘটেনি। সে জন্যই আশা করেছিল উর্দুর সর্বজনীন ব্যবহার ও প্রচলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ নামে একটি বস্তু তৈরি করবে। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠবে এটাই ছিল স্বাভাবিক, এবং সেটা ঘটেছে ১৯৪৮ সালেই। শুরু হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। তারপরে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন–প্রত্যেকটি ঘটনাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ছিল অগ্রগণ্য। সে জন্যই হানাদাররা ক্ষিপ্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠানের ওপর। ছাত্ররাই ছিল সর্বাধিক সক্রিয়। তাই তাদেরকে দমন করাটা ছিল একাত্তরে বিশেষ লক্ষ্য। হানাদারেরা শিক্ষকদের ওপরেও চটা ছিল; কারণ তারা ধারণা করেছিল যে শিক্ষকরাই ছাত্রদেরকে 'কুমন্ত্রণা' দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদেরকেও তারা ভালো চোখে দেখতো না; কারণ তাঁরাও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়কে 'দখল' করার সেই রাত্রে এবং পরের দিন সকালেও তারা কাউকেই গ্রেফতার করেনি, যাকে সামনে পেয়েছে ঝটপট হত্যা করেছে। বস্তুত গণহত্যার নয় মাসে তারা গ্রেফতার করেছে নগণ্যসংখ্যক মানুষকেই, এবং যাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তাদেরও অধিকাংশকেই হত্যা করেছে। হত্যাই ছিল তাদের নীতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত মানুষ যে নিহত হয়েছেন তার হিসাব করা সহজ ছিল না। পরে তালিকা তৈরির চেষ্টা হয়েছে। সে তালিকায় শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবার নামই উঠে এসেছে। তবে কর্মচারীদের সংখ্যা ও পরিচয় সে ভাবে পাওয়া যায়নি, যে-ভাবে অন্যদের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর কারণ হয়তো কয়েকটি। একটি হলো তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক; এবং কেবল যে কর্মচারীরা শহীদ হয়েছেন তা নয়, তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও বাদ পড়েননি। দ্বিতীয় কারণ হলো শ্রেণিগত অবস্থানে তাঁরা দুর্বল ছিলেন। তৃতীয়ত, পঁচিশে মার্চের পরে তাঁরা অধিকাংশই চলে গিয়েছিলেন গ্রামের দিকে; পরে তাঁরা ফিরে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রদের মতো দৃশ্যমান থাকেননি। সেই প্রচ্ছন্নতা আবার পেশাগত ভাবে তাঁদের অবস্থানের সঙ্গে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ করেছেন গবেষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাও মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা যে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই সত্যটাতো রয়েছেই। সভা, সমাবেশ ও মিছিলে তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও যোগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া এবং আন্দোলনে উপস্থিত থাকা, দু'টোই হানাদারদের চোখে ছিল অপরাধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদেরকে অপর একটি যুদ্ধে যুক্ত হতে হয়েছিল। সেটা ছিল জীবনযুদ্ধ। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ওই সংগ্রামটাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। কেননা দেশ মানে তো কেবল একটি ভূখণ্ড নয়, ভূমির চেয়ে অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হচ্ছে মানুষ। আমরা দেশের কথা বলি ও শুনি, দেশ মানে আসলে তো দেশের মানুষ। হানাদাররা মানুষ চায়নি, জমি চেয়েছে; যার সরল অর্থ দেশের

মানুষকে উপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ রেখে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করা। মানুষকে মারতে চেয়েছে, বাকি মানুষকে গোলাম করে রাখবে বলে। ওই মানুষদের জন্য তো মুক্তিযুদ্ধ; যুদ্ধের সময়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে কঠিন সংগ্রাম, সেটাও মুক্তি-সংগ্রামেরই অংশ বৈকি। জীবন বাঁচানো দেশ বাঁচানো থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার ছিল না। ছিল অবিচ্ছেদ্য। ভুক্তভোগীরাও যোদ্ধাই ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা।

জীবন বাঁচানোর জন্য যাঁরা আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল মর্মান্তিক। মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে; কিন্তু মানুষের প্রকৃত দুর্ভোগ যে সাহিত্যের যে কোনো বর্ণনার তুলনাতেও নির্মম হতে পারে একাত্তরে তার প্রমাণ রেখে গেছে।

যুদ্ধের ওই দিনগুলোতে বেঁচে থাকাটা সহজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্মচারীরা আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়েছিলেন তাঁরা কোথায় গিয়ে থাকবেন, কেমন করে যাবেন কিছুই জানতেন না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিবারের যিনি প্রধান তিনিই প্রথমে নিহত হয়েছেন। এমনিতেই তাঁদের আয়-উপার্জন ছিল সীমিত; তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ওই সকল মৃত্যু। শোকে দুঃখে বেদনায় প্রতিটি পরিবার ছিল জর্জরিত। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। দুঃসহ ওই যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশ্রয়হীনতা এবং টাকাকড়ির অভাব। খাবার-দাবার নেই। জামাকাপড়ের পর্যন্ত অভাব। এমন ঘটেছে যে, গায়ের যে জামা বা শাড়িটি পরে বের হয়েছেন নয়মাস ধরে সেটিই পরে থাকতে হয়েছে। ওদিকে আবার দেশে তখন শুরু হয়ে গেছে নীরব দুর্ভিক্ষ। চতুর্দিকে অভাব। সর্বোপরি রয়েছে হানাদারদের আক্রমণের শঙ্কা।

সে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে যখন চলছিল মানুষের মনুষ্যত্বের অসম্ভব কঠিন এক পরীক্ষা। সহ্যের পরীক্ষা, পরীক্ষা দয়া-মায়ারও। ওই বিপদে মানুষ মানুষকে সাহায্য করেছে, যে যে-ভাবে পারে। সামর্থ্যের প্রাচুর্য ছিল না, অভাব-অনটন, নিরাপত্তাহীনতা ছিল সর্ববিস্তারী। ওই পরীক্ষায় অধিকাংশ মানুষই উত্তীর্ণ হয়েছেন। হানাদাররা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে আলাদা করতে চাইতো। অমুসলিমদেরকে হত্যা করাটাও তাদের বিশেষ রকমের নেশায় পরিণত হয়েছিল। জগন্নাথ হল এলাকায় বসবাসীদের উপর যে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় তার অতিরিক্ত কারণ এটি যে সেখানে বসবাসকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য। কিন্তু হানাদারদের ওই আক্রমণে বাংলাদেশ থেকে তখন সাম্প্রদায়িকতাকে প্রায় অনুপস্থিত করে দিয়েছিল। বিপন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িক পরিচয় ভুলে গিয়ে পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। মসজিদের ইমাম নিজেকে বিপন্ন করে হিন্দু পরিবারকে বাঁচিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের কয়েকটি পরিবার

আশ্রয়ের খোঁজে যখন দিশেহারা তখন হোসেনী দালানে শিয়াদের ইমামবাড়াতে প্রাথমিক ভাবে আশ্রয় পেয়েছিলেন, সেখানকার ধর্মপ্রাণ মানুষরা আশ্রয়প্রার্থীরা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সেটা জানতেন, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য তাদের বিবেচনায় আসেনি। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে মনুষ্যত্বের পরাজয় যে ঘটেনি তাও নয়। রাজাকাররা ছিল। লুণ্ঠনকারীদেরও দেখা গেছে। যুদ্ধের সময়েই রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হলে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রণেতাদেরকে অভিনন্দন, তাঁদের কাজের জন্য। গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা যেসকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলোর অনেকাংশ হয়তো হারিয়েই যেত যদি তাঁরা উদ্ধার না করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সে বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা ও প্রকাশনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের ওপর একটি নিবিষ্ট সামগ্রিক গবেষণা ও প্রকাশনা এই প্রথম। এই গ্রন্থের প্রাণ তারা প্রকাশিত বইপত্র, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ, এমনকি কথা-সাহিত্যিক রচনা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কর্মচারীদের একটি তালিকাই শুধু নয়, প্রত্যেকের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তাঁরা করেছেন সেটি হলো ভুক্তভোগীদের লেখা সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ। বার জন ভুক্তভোগীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। ওই ভুক্তভোগীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন নিজের মতো করে; নিজস্ব কথনে ও ভঙ্গিতে। সেই মৌলিকত্বও গবেষণা-গ্রন্থটিতে রক্ষিত হয়েছে। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিতে পারতেন তাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই; যে কথাগুলো আমরা সাক্ষাৎকার-দেয়া মানুষদের নিজের মুখে শুনতে পেলাম সেগুলোও হয়তো পাওয়া যেত না গবেষকরা উদ্যোগী না হলে। গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় আশফাক হোসেন এবং কাজী সামিও শীশ, তাঁদের গবেষণা সহযোগী এবং সম্পাদনা পর্ষদের কাছে আমরা ঋণী হয়ে রইলাম সময়োপযোগী পদক্ষেপটি নেওয়ার জন্য।

এই গ্রন্থটি আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাসের অংশ। সমষ্টির পক্ষে ইতিহাস ভুলে যাওয়া এবং ব্যক্তির পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া একই রকমের দুর্ঘটনা। তবে ইতিহাস তো শুধু ঘটনার ধারাবিবরণী নয়; ইতিহাসে ঘটনার পর্যালোচনা থাকে, থাকতে হয় কার্যকারণ-সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আবশ্যক হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবরও।

একাত্তরে যা ঘটেছিল তা হলো পাকিস্তান নামক অস্বাভাবিক রাষ্ট্রটির ভেতরে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনিবার্য দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। রাষ্ট্রটি ভাঙতোই; কী ভাবে ভাঙবে, কতদিন পরে ভাঙবে সেটাই ছিল প্রশ্ন। ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে রাষ্ট্রের শাসকেরাই, গণহত্যার মধ্য দিয়ে।

তা রাষ্ট্র তো ভাঙলোই, কিন্তু প্রশ্ন রইলো তাতে পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী মানুষদের মুক্তি এলো কি? যে মানুষের এমন কঠিন সংগ্রাম, দুর্ভোগ, আত্মত্যাগের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তার অভ্যন্তরে দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল যে মুক্তির, যার জন্য যুদ্ধটাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি, মুক্তির সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে কি? এক কথায় তার জবাব হলো, না ঘটেনি। যুদ্ধে প্রধান শক্তি ছিল জনগণ, জনযুদ্ধ ছিল মূলত মেহনতিদের জনযুদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ছিলেন ওই মেহনতিদেরই অংশ। নেতৃত্বে ছিলেন উঠতি বুর্জোয়ারা। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধে গেছেন, কিন্তু বড় অংশই হয় ছিল নিষ্ক্রিয়, নয়তো শরণার্থী। যুদ্ধশেষে উঠতি বুর্জোয়ারাই কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পেয়ে গেছেন। ক্ষমতা পেয়ে তাঁরা নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছেন, এবং পাকিস্তানি শাসকেরা যা করেছিলেন তাই করেছেন। শোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনী হয়েছেন; এবং ওই ধনের বেশ কিছুটা পাচার করে দিয়েছেন বিদেশে। পাচারের ব্যাপারে আগের শাসকদের চাইতে তাঁদের আচরণ ভিন্ন ছিল না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে মেহনতিদের শ্রমেই—তাঁরা শ্রম দিয়েছেন দেশের ভেতরে এবং বিদেশে গিয়ে। কিন্তু উন্নয়নের ফল থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। আগের শাসকদের শাসনকালে যেমনটা ঘটতো; স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকের কর্মকাণ্ডেও ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ধনীদের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। আগেরকালে সম্পদ চলে যেতো দিল্লিতে, লন্ডনে, এবং পিন্ডিতেও এখন যায় বিভিন্ন দেশে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও দৈন্য ঘোচে না। সামগ্রিক বিচারে দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়। এই হচ্ছে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস। এই ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী কর্মচারীদের জীবনেও সত্য বৈকি।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরও একটি জিজ্ঞাসা থাকে। সেটি এই গবেষণা গ্রন্থটি পাঠকালেও উঠে আসে। জিজ্ঞাসাটা হলো ওই যে, পাকিস্তান হিন্দুস্থানে যে ভাগাভাগি, যার ফলে দুর্ভোগের এতসব ঘটনা, সেটার জন্য দায়ী কারা? জবাবটা আমাদের জানা আছে : দায়ী একদিকে ব্রিটিশ শাসকেরা অপরদিকে জাতীয়তাবাদী দুই রাজনৈতিক দল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। ব্রিটিশের প্ররোচণা ও আগ্রহ ছিল দেশভাগে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ছিল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ওই দুই জাতীয়তাবাদী দলের কোনোটাই এই সত্যটাকে মেনে নেয়নি যে ভারতবর্ষ একটি বা দু'টি নয়, বহুজাতির একটি উপমহাদেশ। কংগ্রেস বলেছে জাতি এখানে একটাই, সেটি ভারতীয়; মুসলিম লীগে দাবি জাতি রয়েছে দু'টি, হিন্দু ও মুসলমান, তাই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বাসভূমি চাই। এই দ্বন্দ্বে সাতচল্লিশের দেশভাগ ঘটে, যেটি ছিল আমাদের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের পর দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি; এবং ওই ট্র্যাজেডির ধারাবাহিকতাতেই একাত্তরের যুদ্ধটি ঘটেছে।

ইতিহাস-পাঠকালে জিজ্ঞাসা থাকে এটাও যে স্বাধীন হয়েও আমরা যে মুক্ত হতে পারলাম না, সেই সমস্যার সমাধান কী? অর্থাৎ মুক্তি আসবে কোন পথে? কোন পথে এগোলে সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচবে। জবাবটাও পাওয়া যাবে আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই। সেটি হলো এই যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন বেশ কয়েকবার ঘটেছে, সর্বশেষ পরিবর্তনটি ঘটলো একাত্তরে। কিন্তু যেটা ঘটেনি সেটি হলো সামাজিক বিপ্লব। রাষ্ট্র বদলেছে নামে ও আয়তনে; শাসক-বদলও দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সমাজের ভেতরে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। সেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ সালের, যার মধ্য দিয়ে মূল সামাজিক সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল জমিদার ও প্রজার, সেই সম্পর্কটাই নানান নামে ও ভাবে পুনঃউৎপাদিত হয়েছে। ওই ব্যবস্থাটা না ভাঙলে মুক্তি যে আসবে না সেটা ঐতিহাসিক ভাবে ও কারণে সত্য।

পরিশেষে, ইতিহাসের চর্চা যে অত্যাবশ্যকীয় সে কথাটা পুনরায় স্মরণ করা যাক। ইতিহাস পাঠে আমরা নিজেদের পরিচয় জানি, বর্তমানকে বুঝতে পারি, এবং ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দেশ পাই। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে ইতিহাসের চর্চা এখন কমে গেছে। নিম্নগতির সেই ধারার বিপরীতে অন্য একটি ধারাও অবশ্য আছে; বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি ওই বিপরীত ধারারই একটি প্রতিনিধি। এর রচয়িতাদেরকে পুনরায় অভিনন্দন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইমেরিটাস অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীগণ ১৯৪৮ সালে তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্যে জনমত তৈরি, আন্দোলন এবং সবশেষে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়। ১৯৭১ সালে কর্মচারীগণ নিজেদের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানান। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরতে গণহত্যা শুরু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীর সাথে অনেক কর্মচারীও শহিদ হন। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকে স্বাধিকার আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে কর্মচারীগণ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আত্মত্যাগ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

১.১. গবেষণা উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো: মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ও পর্যালোচনা করা।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক, ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতের ঘটনা উপস্থাপন (দ্বিতীয় অধ্যায়); দুই, ২৫শে মার্চ রাতের অব্যবহিত পরের উদ্ধার-পর্বের ঘটনা উপস্থাপন (তৃতীয় অধ্যায়); এবং তিন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বিজয় অর্জন পর্যন্ত যাপিত জীবনের অবস্থা উপস্থাপন (চতুর্থ অধ্যায়)।

১.২. তাত্ত্বিক কাঠামোর সন্ধানে

সাবলটার্ন তথা নিম্নবর্গের ইতিহাস-তত্ত্বের আলোকে এই গবেষণার জন্য একটি জুতসই তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই ইতিহাস-তত্ত্বের প্রবক্তা রণজিৎ গুহ মার্কসীয় শ্রেণি-চেতনার বিষয়টিকে ইউরোপীয় ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। এবং তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন দক্ষিণ এশীয় 'কৌম চেতনা'র

প্রতি। ইতিহাস লেখার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন জানিয়ে একাধিক গবেষণা-কর্ম সম্পাদন করেছেন যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত সরকার, ডেভিড হার্ডিম্যান, শহিদ আমিন, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২০২৩)।

গৌতম ভদ্র তাঁর *ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়* গ্রন্থে কীভাবে বাংলায় কৃষক সমাজ নিজেদের উদ্যোগে ব্রিটিশ ও তাদের সহযোগী স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে অংসখ্য লড়াই ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছেন তার এক অনুপুঙ্খ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকগণ দাবি করেছেন যে, “নিচু থেকে ইতিহাস” নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব কৃষক বিদ্রোহ হচ্ছে ‘স্বর্ণখনি’ যেখানে একইসাথে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন এবং এলিট শ্রেণির আধিপত্যের বিপরীতে কৃষকদের স্বাধীন জগৎ নির্মাণের বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল (গৌতম ভদ্র ১৯৯৪)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীগণের প্রায় সবাই এসেছিলেন গ্রাম থেকে এবং এরা কৃষকদেরই সন্তান ছিলেন। ১৯৫০, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে এদের সিংহভাগের পরিবার গ্রামে বসবাস করতো। আর পূর্ব-বাংলার গ্রাম মানে তো কৃষক সমাজেরই চালচিত্র। ফলে *সাবলটার্ন* ঐতিহাসিকদের প্রস্তাবিত কৃষক সমাজের ‘কৌম চেতনা’র (১.২ এ উল্লেখ্য) সাথে এদেরও মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ধারণাকে মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করার জন্য অনেকাংশে (সম্পূর্ণরূপে নয়) উপযোগী বিবেচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণা হলো এমন একটি গবেষণা-পদ্ধতি যা ইতিহাসের সেই অংশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সাধারণত উচ্চবর্গের ইতিহাসবিদদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। এটি নিম্নবর্গের মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

ক) মৌখিক ইতিহাস: মৌখিক ইতিহাস হলো এমন একটি পদ্ধতি যা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অতীতের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণায় মৌখিক ইতিহাস ব্যবহার করা যেতে পারে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রথম-হাতের দৃষ্টিভঙ্গি পেতে।

খ) ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান: ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান হলো এমন একটি পদ্ধতি যা ঐতিহাসিক তথ্য এবং নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণায় ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান ব্যবহার করা যেতে পারে নিম্নবর্গের মানুষের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে গভীরতর বোঝাপড়া অর্জন করতে।

গ) সাংস্কৃতিক ইতিহাস: সাংস্কৃতিক ইতিহাস হলো এমন একটি পদ্ধতি যা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে অধ্যয়ন করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণায় সাংস্কৃতিক ইতিহাস ব্যবহার করা যেতে পারে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনযাত্রা এবং অভিজ্ঞতাকে বোঝার জন্য সাংস্কৃতিক প্রথা এবং বিশ্বাসগুলি বিবেচনা করে।

নিম্নবর্গের ইতিহাস গবেষণার জন্য কিছু নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটি চ্যালেঞ্জ হলো তথ্যের অভাব। নিম্নবর্গের মানুষদের দ্বারা লিখিত বা রেকর্ড করা তথ্য প্রায়শই সীমিত থাকে। এই কারণে গবেষকদের প্রায়শই অন্যান্য উৎস; যেমন মৌখিক ইতিহাস, নথিপত্র এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলিতে নির্ভর করতে হয়।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো পক্ষপাত। ঐতিহাসিকভাবে, ইতিহাস লিখিত হয়েছে উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা। এই কারণে, নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রায়শই উপেক্ষিত বা বিকৃত করা হয়। সমস্যাগুলোর প্রতি এই গবেষণার গবেষকগণ সচেতন থাকার চেষ্টা করেছেন।

১.৩ গবেষণা-পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি বিবরণমূলক। এই গবেষণায় প্রধানত মৌখিক গবেষণা পদ্ধতি আংশিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের সময় উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং স্মৃতিকথার মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা কথন

(narration) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একই সাথে বিভিন্ন গবেষণা ও বইয়ে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সাক্ষাৎকারও ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত কর্মচারী অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা ব্যক্তিগণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের কাছে গৃহীত পরামর্শ অনুযায়ী(*স্নোবল পদ্ধতি অনুসরণে*) আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী নির্বাচন করা হয়েছে।

একটি সেমি-স্ট্রাকচার্ড প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ২৫শে মার্চ রাত, ২৫শে মার্চ রাতের অব্যবহিত পরের উদ্ধারপর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বিজয় অর্জন পর্যন্ত যাপিত জীবনের অবস্থা ও অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বক্তব্য গ্রহণ করার সময়ে ২৫শে মার্চ অতর্কিত আক্রমণ ও স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনে বিক্ষিপ্ত, অস্থির, অগোছালো ছিল এবং তার বর্ণনা করার সময় তাঁদের কথায় নানা ধরনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। সেই ভাবরূপটির প্রতি সম্মান রেখে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে লিখিতভাবে প্রকাশ করার জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু আবেগ ও বিক্ষিপ্তভাবটি বজায় রাখার প্রয়াস করা হয়েছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের অনুমতি সাপেক্ষে গবেষণায় তাঁদের মূল নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নন এমন সাব-অলটার্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে, সাথে লিপিবদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধে অভিজ্ঞতাসমূহের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে (পঞ্চম অধ্যায়)। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গবেষণা করতে এই প্রয়াস কাজে লাগবে।

১.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত কয়েকটি গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ

গবেষণাটি প্রধানত মৌখিক ইতিহাসভিত্তিক। তবে ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা ও তাঁদের সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা হলো। এখানে উল্লেখ্য, এই গ্রন্থগুলো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন কোনো দাবি এখানে করা হচ্ছে না এবং উপস্থাপিত গ্রন্থগুলোকে গুরুত্বানুসারেও উপস্থাপন করা হচ্ছে না।

১.৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)- রতন লাল চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্ত্তী রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭-১৯৭১* অন্যতম। দুই খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের ১৫টি অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং বিজয়ের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক ঘটনা বা বিষয়াবলি আলোচিত হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ফুটে উঠেছে। তথ্যবহুল এবং বিশ্লেষণধর্মী এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে "শহীদ কর্মচারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৯৭১" নামে ১১ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় যুক্ত রয়েছে। এই অধ্যায়ে পাকিস্তানি আক্রমণে শহিদ হওয়া কর্মচারীদের পরিচিতি তুলে ধরা হলেও তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা বা তাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা হয়নি (লেখক যদিও তাঁর রচিত অন্য *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা ১৯৭১: জগন্নাথ হল* গ্রন্থে জগন্নাথ হলের কর্মচারীদের ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চের অভিজ্ঞতার ভাষ্য যুক্ত করেছেন, ১.৪.৪. এ আলোচিত) তবে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হত্যাকাণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসের বিবরণ উল্লেখ করতে লেখক বিভিন্ন সময় কর্মচারীদের ব্যাপারে তথ্য উপস্থাপন করেছেন যেগুলো বর্তমান গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪.২. *একাত্তরের ডায়েরি* - মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

বইটির লেখক শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭১- এর পুরো বছর ধরে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে প্রতিদিনকার কর্মযজ্ঞের বিবরণ টুকে রাখতেন যা তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর ২০০৫ সালে আগামী প্রকাশনী থেকে "একাত্তরের ডায়েরি" নামে প্রকাশ করা হয়। তার এই ডায়েরি শুরু হয় ১৯৭১ সালের জানুয়ারির ১ তারিখ হতে এবং শেষ হয় ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে।

৭২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে পুরো বছরজুড়ে শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবনে কী কী ঘটেছিল তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি ঢাকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার অবস্থার একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় এই বইতে। তবে ২৫শে মার্চ রাতের পাক আক্রমণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছুই লিপিবদ্ধ করেননি তিনি তাঁর ডায়েরিতে। মার্চের ২৭ তারিখ তাঁর পরিবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে এবং অন্যত্র তাঁদের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় প্রতিদিনকার তথ্য থাকলেও ১লা এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত দিনসমূহের কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি এখানে। তবে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন, ছাত্রশূন্য ক্যাম্পাস, নির্দিষ্ট দিনে ব্যাংক থেকে বেতন উত্তোলন এবং প্রায়শই ঢাকায় কারফিউ, বোমাবাজি ইত্যাদির উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর এই রোজনামচায়।

১.৪.৩. *Historicizing 1971 Genocide: State versus Person*- ইমতিয়াজ আহমেদ

বাংলাদেশের গণহত্যা আধুনিক সময়ে একমাত্র গণহত্যা যা এর জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার নীতির ফলে ঘটে। অন্যান্য গণহত্যা তাৎক্ষণিক ধর্মীয়, ভাষাগত বা জাতিগত শত্রুতার ফলে হয়েছে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে অন্তত প্রকাশ্যে এমন কোনো শত্রুতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায় মেনে নিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্বীকৃতি। পাকিস্তানের পূর্ব শাখা থেকে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত

রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ক্ষমতার ভারসাম্য পাকিস্তানের পূর্ব শাখায় স্থানান্তরিত করবে। মূলত এই ভয়ের কারণেই ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অস্বীকৃতি। প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্রের দাবি এবং গণহত্যার শিকারের জটিল সংমিশ্রণই জাতির পরিচয় রচনা করেছিল এবং অবশেষে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু গণহত্যা যতটা রাষ্ট্রের গল্প, ততটাই ব্যক্তির গল্প। ১৯৭১ গণহত্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যামূলক আলোচনায় একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছে এবং এটি রাষ্ট্রের জন্য যতটা কারণ এটি ক্যাম্পাসে নির্বিচারে এবং এখনও গণনাকৃত হত্যার জন্য।

পদ্ধতিগতভাবে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ফোকাস করা অর্থবহ হয়ে ওঠে। কারণ, এটি হত্যা এবং ধ্বংসের একটি পরিসংখ্যান নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং যারা বেঁচে ছিল তারা এখনও ব্যক্তিগত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার অবস্থানে রয়েছে। অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার সময় নিরাপত্তারক্ষী, পিয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কম স্বীকৃত পদাধিকারীদেরসহ সাবল্টার্নদের অনুসন্ধান এবং তাঁদের কাছে পৌঁছানোর একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। গণহত্যা সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক সচেতনতা এবং মানবতার বিরুদ্ধে সমস্ত অপরাধের অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.৪.৪. *রাইফেল রোটি আওরাত*- আনোয়ার পাশা

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে যে কয়টি সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তার মধ্যে শহিদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশার ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ অন্যতম এক সৃষ্টিকর্ম। গ্রন্থটির সাহিত্যিক গুরুত্বের পাশাপাশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যধিক। লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ করা ঘটনাবলি উপন্যাসের আলোকে লেখ্য রূপ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে লেখক আনোয়ার পাশা ঢাকা শহরে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরিচালিত গণহত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ-নির্যাতনের পরবর্তী চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে এতে মার্চ মাসের পরের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও উঠে এসেছে। গ্রন্থের একটি অংশে লেখক ‘রূপক’ চরিত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলিম কর্মচারীর মধ্যকার সম্পর্ক যুদ্ধের পূর্বে

কেমন ছিল তাও তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানিদের পরিকল্পনা/ মতলব বিষয়ে লেখকের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার প্রতিফলনও গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে লেখক নিজেকে উপস্থাপন করেছেন সুদীপ্ত শাহীন নামে। ছদ্মনাম ব্যবহার করার অন্যতম একটি কারণ সম্ভবত এই যে, তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক যেন তাঁর সন্ধান না করতে পারে। একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ হন আনোয়ার পাশা। তাঁর লিখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের মে মাসে। বর্ণিত ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল। এটি কোনো গবেষণাধর্মী রচনা না হলেও বর্তমান গবেষণা কর্মের সাথে অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক।

১.৪.৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা ১৯৭১: জগন্নাথ হল - রতনলাল চক্রবর্ত্তী (সংকলিত ও সম্পাদিত)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল স্থানে পাকিস্তানি মিলিটারি গণহত্যা পরিচালনা করেছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল জগন্নাথ হল। এই হলের গণহত্যা-নির্যাতনের চিত্র বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে রতনলাল চক্রবর্ত্তী সংকলিত ও সম্পাদিত *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা ১৯৭১: জগন্নাথ হল* গ্রন্থে। মোট ১৮৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ১৯93 সালে আগামী প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মূল উপজীব্য একাত্তরে জগন্নাথ হলের গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ভাষ্য বা অনুলিখন। তবে ভূমিকাংশে লেখকের বিশ্লেষণধর্মী সংক্ষিপ্ত লেখাটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে ২৫টি নতুন সাক্ষাৎকার এবং পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত সাতটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলো থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, পরিচয়ের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে জগন্নাথ হলে ২৫শে মার্চ ও ২৬মে মার্চ পাকিস্তানি মিলিটারির কর্মতৎপরতা, হলের বাসিন্দাদের আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা এবং শহিদ ব্যক্তিদের ব্যাপারে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটি ভাষ্যে ২৭শে মার্চের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাওয়া যায়। বর্ণিত সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যে ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মচারী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন এমন নয়জন এবং জগন্নাথ হলে শহিদ কর্মচারী পরিবারের চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে সংযুক্ত দলিলপত্র ও অন্যান্য বিষয়ের আলোকচিত্রাবলি গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে মার্চের গণহত্যা-

ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর অনালোচিত রয়ে গেছে বেঁচে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের যুদ্ধকালীন অনিশ্চিত জীবনের/জীবনযাত্রার বিবরণ। তবে বর্তমান গবেষণা-কর্মের জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪.৬. *রোকেয়া হল গণহত্যা: আহত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য* - মো: আল আমিন ও বাসার খানের (সম্পাদনা)

১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র রোকেয়া হলই ছিল নারী শিক্ষার্থীদের আবাসস্থল। অপারেশন সার্চলাইটের অংশ হিসেবে পাকিস্তান ফৌজের সদস্যরা এই হলে আক্রমণ করে হত্যা করে ৪৫ জনকে। হত্যা করেছিল তাঁদের, যারা ছিলেন ঐ হলের কর্মচারী ও তাঁদের স্ত্রী-সন্তান। রোকেয়া হলের এই গণহত্যাকে উপজীব্য করে মো: আল আমিন ও বাসার খানের সম্পাদনায় ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় *রোকেয়া হল গণহত্যা: আহত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য* গ্রন্থ। এতে রোকেয়া হলের পরিচিতি উল্লেখপূর্বক ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনীর আক্রমণে আহত হওয়া ও আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছেন বা ২৫শে মার্চের পরে হলে এসে পরিস্থিতি অবলোকন করেছেন এমন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্রও সংযুক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের (১০ জন) উল্লেখকৃত বিষয়াবলি কর্মচারীদের ভূমিকা তুলে ধরতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪.৭. *যাত্রিক* - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিয়মিত প্রকাশনা যাত্রিক-এর মূল বিষয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যাকে নির্ধারণ করে ২০২৩ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে *২৫শে মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* শিরোনামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারীদের ভূমিকা ও আত্মত্যাগের ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে। এই পুস্তকের শহিদ পরিবারের সদস্য হিসেবে ১৩ জনের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮ জন শহিদ-কর্মচারী পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য স্থান পেয়েছে। এগুলো থেকে গণহত্যার দিনে কর্মচারীদের অবস্থা এবং অবরুদ্ধ সময়ে তাদের পরিবারের সার্বিক

পরিস্থিতির ব্যাপারে খণ্ড-খণ্ড কিছু চিত্র পাওয়া যায়। এগুলো বর্তমান গবেষণা-কর্মটির জন্য অন্যতম আকরসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪.৮. *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর* – আফসান চৌধুরী (সম্পাদিত)

একাত্তরের দিনগুলিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা ফুটে উঠেছে আফসান চৌধুরী সম্পাদিত *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর* গ্রন্থে। হিন্দুরা পাকিস্তানি সামরিক ফৌজের সদস্যদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষাপট ভূমিকাংশে উল্লেখপূর্বক গ্রন্থটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিষয়ভিত্তিক চিত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকজন ব্যক্তির আত্মকথন দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ২৮ জনের অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের পরিচালক মধুসূদন দে-এর পুত্রের অভিজ্ঞতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন কর্মচারী ও সহধর্মিণীর অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। তাঁদের বর্ণনায় গণহত্যা-নির্যাতনসহ যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ নয়-মাসের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে শরণার্থী-শিবিরে যাত্রা ও শরণার্থী-ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কয়েকজনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লড়াই করার বীরত্ব ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং ধারা-বর্ণনা, প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার উল্লেখপূর্বক ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

১.৪.৯. অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা–সুকুমার বিশ্বাস

সুকুমার বিশ্বাস রচিত *বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা* গ্রন্থটি ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য হলো পাকবাহিনী কর্তৃক শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী গঠন ও তাদের ট্রেনিং সম্পন্ন করার বিভিন্ন সময়ের কর্মতৎপরতা। এই সকল কার্য-প্রণালীর মধ্যে দিয়েই উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক-দোসরদের তৎপরতা ও

তৎকালীন চিত্র। এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, উচ্চপদস্থ রাজাকারদের ট্রেনিং হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন সময়ে রাজাকার বাহিনী তাদের অনুশীলন করেছিল এখানে। ২৫শে মার্চ পাক-বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যে আক্রমণ ও নির্যাতন চালিয়েছিল তার একটি চিত্র পাওয়া যায় এই গ্রন্থের মাধ্যমে। যুদ্ধের শেষের দিকে ১৪ই ডিসেম্বর আল-বদর বাহিনীকে দিয়ে দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদেরকে নিজ নিজ বাসস্থান থেকে অপহরণ ও তাঁদের হত্যা সম্পর্কিত তথ্যও এই গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন সুকুমার বিশ্বাস। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন জুন মাসে ঢাকা শহরের ২১০টি এলাকার রাস্তার নতুন নামকরণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। যার মধ্যে ৬৪টি রাস্তার নতুন ও পুরাতন নামের একটি তালিকা এই গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে গ্রন্থের মূল উপজীব্য যেহেতু পাক-দোসরদের যুদ্ধকালীন তৎপরতা তাই যুদ্ধের অন্যান্য দিক এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

১.৪.১০. *হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন*- মন্টু খান

গ্রন্থের লেখক মন্টু খান ১৯৭১ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে কর্মরত ছিলেন। ষাটের দশকে বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্র ছিল না তাঁর। তা সত্ত্বেও পাকবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাননি তিনি। ২১শে মে হঠাৎ পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। সেই থেকে পাঁচ মাস পাকবাহিনীর নানান পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন মন্টু খান। তাঁর এই বন্দিজীবনের দুর্বিষহ স্মৃতিই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে ১৯৯০ সালে 'উত্তরণ' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। ১৪৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে উঠে এসেছে তাঁর প্রতি পাক সৈন্যদের আক্রোশ ও নির্যাতনের চিত্র। দফায়-দফায় তাঁর উপরে চলেছে মারপিট। কাঙ্ক্ষিত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে অত্যাচারের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল। এ সময়ের মধ্যে কাছ থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা উপলব্ধি করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অন্যের মৃত্যু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষকে জীবনের যে মূল্য দিতে হয়েছে তার এক জলজ্যান্ত সাক্ষী মন্টু খানের এই অভিজ্ঞতা। তবে এই গ্রন্থটি যেহেতু মন্টু খানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমাহার, তাই পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর তাঁর বন্দিজীবনে পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক নির্যাতন ও বাঙালিদের ধরপাকড় করার চিত্রই প্রধানতম গুরুত্ব পেয়েছে এখানে।

১.৪.১১. *পাকিস্তানে বন্দীজীবন* ১৯৭১- হেলেন কাদের

১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের মেয়ে হেলেন কাদেরের বিয়ে হয়েছিল ক্যাপ্টেন কাদেরের সাথে। চাকুরির সুবিধার্থেই তাঁকে স্বামীর সাথে পাড়ি জমাতে হয়েছিল অজানা-অচেনা দেশ পশ্চিম পাকিস্তানে। যুদ্ধের পুরো নয়-মাস তিনি পাকিস্তানে অবরুদ্ধ জীবন কাটিয়েছেন যার দুর্বিষহ স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে ২০০৬ সালে আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হেলেন কাদেরের *পাকিস্তানে বন্দীজীবন* ১৯৭১ নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোটো শহর 'রহিম ইয়ার খানের' কৃষি, সংস্কৃতি, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছেদসহ লোকজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত, তাঁর স্বামী (হেলেন কাদেরের) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য হওয়ার দরুন তাঁকে (ক্যাপ্টেন কাদের) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছিল। তখন হেলেন কাদের ছিলেন গর্ভবতী। গর্ভবতী থাকাকালীন প্রবাস-জীবনে স্বামীহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন, নজরবন্দি অবস্থায় তাঁর দুর্বিষহ বন্দিজীবনের লোহমর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। যুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী যেখানে তাদেরকে অনেক আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করেছিল, সেখানে যুদ্ধ চলাকালে তা পরিণত হয়েছিল ঘৃণায়। যার দরুন একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকেও সাহায্য করতে তারা অনীহা প্রকাশ করেছিল। হেলেন কাদেরের স্বামী ক্যাপ্টেন কাদের নানান সময় মৃত্যু-মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত সমস্ত বাঙালি সামরিক অফিসারদেরকে দ্রুত দেশে ফেরত না পাঠিয়ে পাঠানো হলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এবং সেখানেও তাদেরকে বন্দি এবং নজরবন্দি জীবন কাটাতে হয়েছিল। মাসিক ৩০০ টাকা কেবল হাত-খরচ তাঁদের দেওয়া হতো। ক্যাপ্টেন কাদেরের বেলায় তা ছিল ২৫০ টাকা মাত্র। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্যাম্পে দুর্বিষহ বন্দিজীবন তাঁরা অতিবাহিত করে। কখন দেশে যাবে এই আশায় সময় অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। বর্তমান গবেষণা-কর্মে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪.১২. *Experiences of an Exile at Home: Life in Occupied Bangladesh* - মফিজুল্লাহ কবীর

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাক হানাদের বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক হত্যা চালায় যার অন্যতম একটি ক্ষেত্র ছিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলগুলোতে সারারাত ধরে চলে ধ্বংসযজ্ঞ। নির্বিচারে হত্যা করা হয় মানুষদেরকে। সেই ভয়াবহ রাতে কাঠের স্তূপের মাঝে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মফিজুল্লাহ কবীর ও তাঁর পুরো পরিবার। পরবর্তী সময়ে ২৭শে মার্চ তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের পরামর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে সর্বপ্রথম অবরুদ্ধ জীবনের পথে পা বাড়ান। অবরুদ্ধকালীন (যুদ্ধের পুরো নয়-মাস) ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকার বিস্তারিত বিবরণ এবং হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারিবাজার এলাকার দুর্বিষহ চিত্র এবং বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বর্ণনা পাওয়া যায় অধ্যাপক ড. মফিজুউল্লাহ কবীর রচিত *Experience of an Exile at Home: Life in Occupied Bangladesh* নামক গ্রন্থে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিচালিত আক্রমণের চিত্র, তাদের বিভিন্ন তাণ্ডব, ছাত্রছাত্রীদের কর্মসূচি, পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সার্বিক পরিস্থিতি কেমন ছিল তার বর্ণনা এই গ্রন্থটি থেকে পাওয়া যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রোশের হাত থেকে যে বৃক্ষও ছাড় পায়নি, তা এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় (কলাভবনে) অবস্থিত ঐতিহ্যের সাক্ষী বটবৃক্ষও তাদের আক্রোশের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ছাত্ররা এর নিচে বসে কর্মসূচি পালন করতো বিধায় তা কেটে ফেলা হয়। বিভিন্ন স্থানের কসেনন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিচালিত ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্রও ফুটে উঠেছে উক্ত গ্রন্থটিতে। বর্তমান গবেষণা-কর্মের জন্য গ্রন্থটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৪.১২. *একাত্তরের ঈদ*- বাশার খান

একাত্তরের ইদ কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল, এর নানা দিক নিয়ে রচিত গবেষণা-গ্রন্থ *একাত্তরের ঈদ*। ১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর (শনিবার) ছিল ইদুল ফিতর। বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলমান। দুঃখ-কষ্ট ও বিজয়ের স্বপ্নের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে পালিত হয়েছে ইদ।

ঢাকা, ঢাকার বাইরে, রণাঙ্গন ও ক্যাম্পে গেরিলা যোদ্ধা, প্রবাসী সরকার, স্বাধীন-বাংলা বেতারকেন্দ্র, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর পরিবার, শরণার্থী, ব্রিটেনে প্রবাসী বাংলাদেশি, পত্র-পত্রিকা, ইদের দিনে যুদ্ধ, ইদের দিনে শহিদ

আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নির্যাতন ও হত্যা, ভারত দখল করে ইদের জামাত পড়ার ইচ্ছা, রাজাকারদের বেতন বাড়ানো, ইয়াহিয়ার ভাষণ, ইদের দিনে পাকিস্তান রেডিওর ঘোষণা, আর্মির ট্রাকে জায়গা না হওয়ায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ইদ-ইদুল আজহা (২৭শে জানুয়ারি, ১৯৭২)– এর বর্ণনা আছে ও বিশ্লেষণ রয়েছে এই বইটিতে। গ্রন্থটি ইদ পালনের ইতিহাসটি একটি ভিন্ন মাত্রায় *একাত্তরকে* দেখার সুযোগ করে দেয়।

১.৫ অধ্যায়-বিন্যাস

বর্তমান গবেষণাটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বর্তমান অধ্যায়ে এই গবেষণা সংক্রান্ত একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে। *ভয়ংকর এক রাতের কথা: মৃতের স্তূপে প্রাণের আহাজারি, ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের রাতের ঘটনা* শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইটের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনে ঘটে যাওয়া ভয়াল অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *২৬শে মার্চ সকাল, ১৯৭১: তবু ভোর হয়;* এই অধ্যায়ে ২৫শে মার্চ রাতের অব্যবহিত পরের উদ্ধার-পর্বের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে (*অবরুদ্ধ জীবন থেকে বিজয়-পর্ব*) স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এর বিজয় অর্জন পর্যন্ত যাপিত জীবনের অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়, *তুলনামূলক মৌখিক ইতিহাস: মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য*-এ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নন এমন সাব-অলটার্ন জনগোষ্ঠীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধে অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়, *উপসংহার*- এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করে ভবিষ্যত গবেষণার জন্য কয়েকটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ কর্মচারীদের তালিকা এবং গবেষণার জন্য গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহের অনুলিখন সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৫শে মার্চ ১৯৭১

ভয়ংকর এক রাতের কথা: মৃতের স্তূপে প্রাণের আহাজারি

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের মানুষের জীবনের ভয়ংকরতম রাত। আবেগতাড়িত হয়ে বলা যায়, ইতিহাসের 'নিকষতম কালরাত'। সেই রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। তৎকালীন শাসকশ্রেণির পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানি সমরবাহিনী কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চালানো 'অপারেশন সার্চলাইটে'র নীল-নকশা বাস্তবায়নের অন্যতম কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরিকল্পনামাফিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও রোকেয়া হলসহ ক্যাম্পাসের আরো কয়েকটি স্থানে চালানো হয় গণহত্যা। সেই রাতে শহিদ হন হলের ছাত্র, শিক্ষকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের অনেক সদস্য। গণহত্যার কবল থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে হলগুলোর কর্মচারীবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য থেকে সেই রাতের ভয়াবহতার তথ্য-চিত্র পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শী নন, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে শুনেছেন এমন কয়েকজন কর্মচারী পরিবারের সদস্যের বক্তব্যও এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরুর পূর্বে (মার্চ ১৯৭১) ও অপারেশন চলাকালীন (২৫শে মার্চ, ১৯৭১ রাত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও অভিজ্ঞতার একটি চিত্র বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো।

২.১. অপারেশন সার্চলাইট

পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকেরা মুক্তিকামী বাঙালিদের কঠোর হস্তে দমনের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে, তাকে সামরিক কর্তৃপক্ষ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিহিত করে। এ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলিতে রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র-নেতৃবৃন্দ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে হত্যা, সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ; অস্ত্রাগার, রেডিও ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দখলসহ প্রদেশের সামগ্রিক কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন

কঠোর হস্তে দমন করে প্রদেশে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে এগারোটা থেকে অভিযান পরিচালিত হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অভিযান শুরুর সময় নির্ধারিত ছিল ২৬শে মার্চ রাত ১টা। কিন্তু ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল না পেয়ে সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান জানান। সে রাতেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও এ.কে. নিয়াজীর জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালেক মন্তব্য করেছেন যে, বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে ২৫শে মার্চ রাত ১১-৩০ মিনিটে শুরু হয় (Salik, 1997)।

এই প্রসঙ্গে 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর Basic Requirements for Success-এর একটি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'Operation must achieve a hundred percent success in Dacca. For that Dacca University will have to be occupied and searched'. 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর At Tactical Level অংশে উল্লেখ করা রয়েছে: Surrounding the important halls of the Universities- Iqbal Hall DU [Dacca University], Liaqat Hall Engineering University.'

২.১.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, মার্চ ১৯৭১: অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে – কিছু খণ্ডচিত্র

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ রাতের ঘটনার পূর্বে পুরো মার্চ মাস জুড়ে আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সম্পৃক্ততার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেম স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। মার্চ মাস জুড়ে কর্মচারীদের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় তৎকালীন একজন কর্মচারী গোপাল দাসের কাছ থেকে। উঠে আসে সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী গোপাল দাসের ভাষ্য থেকে যেখানে উঠে আসে সেই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র, বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুভূতি। ছোটোবেলাতেই অভাবের তীব্রতা অনুভব করেছেন তিনি।

এমনো সময় গিয়েছে যে, খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হতো তাঁর পরিবারকে। শুধু খাবারের বিনিময়ে কাজ নিয়েছিলেন গ্রামের চায়ের দোকানে। কিন্তু, সেখানে মারধর করায় বেশিদিন টিকতে না পেরে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন তাঁর বাবা ঢাকায় এসেছে কাজের সন্ধানে। পরে পরিচিত একজনের সাথে তিনিও চলে আসেন ঢাকা নগরে। তখন থেকে শুরু হয়ে তাঁর ঢাকার জীবন। ঢাকায় এসে নাগরিক চাকচিক্য দেখে অবাক যেমন হয়েছিলেন, পাশাপাশি মায়ের জন্য মন খারাপ করছিলেন। একজনের সাহায্যে বাবার কাছে পৌঁছালেন যিনি জগন্নাথ হলে ডাইনিং-এ কর্মরত ছিলেন। ক্যাম্পাসের সকলের সুন্দর ব্যবহার, পরিবেশ, খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে গোপাল দাস মিশে গেলেন ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের সাথে। পরবর্তীতে তিনি নিজেও মধুর ক্যান্টিনে কাজ শুরু করেন। এমনকি, ১৯৭১ সালের পুরো সময় জুড়ে তিনি ছিলেন ক্যাম্পাসের অন্যতম সক্রিয় ব্যক্তি। ছিল সকলের সাথে যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে ছাত্রসমাজ যে পাকিস্তানিদের পছন্দ করছে না এবং পাকিস্তানিরাও যে সেটা জেনে গিয়েছিল তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন। যেহেতু মধুর ক্যান্টিন ছিল তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু গোপাল সেই সময়ের রাজনৈতিক অনেক কিছুর সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

মার্চ মাসের শুরু থেকে দেশে যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন কিছু ঘটে যেতে পারে এরূপ আশঙ্কা করা হচ্ছিল। মার্চের দুই তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-কর্মচারীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। সেই প্রশিক্ষণের জন্য বিএনসিসি থেকে অস্ত্র এনে ডাকসুতে রাখতেন আবার প্রশিক্ষণ শেষে বিকেলবেলায় তা বিএনসিসিতে (বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) জমা দিয়ে আসতেন গোপাল দাস। সেই সময় ডাকসু ছিল বর্তমান কলাভবনের ভেতরে। তিনটা রুম নিয়ে চলছিল ডাকসুর কার্যক্রম। ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে গোপাল দাস বলছিলেন যে, খুন্তি, কোদাল নৌকা নিয়ে বহু লোক এসেছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে। লোকজন যত গাছ-গাছালি ছিল– তালগাছ, জামগাছের আগায় বসে ভাষণ শুনেছিল। গোপাল দাস বলেন, "মনে হচ্ছিল যেন গাছের মধ্যে মানুষ ধরে আছে"। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়ছিল তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ববাংলার রাজনৈতিক গতিপথ ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। দেশের সকল ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থগিত ছিল। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো স্বাভাবিকভাবে সচল ছিল। তৎকালীন

ইকবাল হলের ছাত্র-সংসদ হয় উঠেছিল সেই সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। হল-মাঠে স্থাপন করা হয়েছিল একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রও।

ছাত্র ইউনিয়ন খেলার মাঠে, ছাত্রলীগ কলাভবনে, কর্মচারীরা জগন্নাথ হলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখে। এভাবে ২৫শে মার্চ বিকেল পর্যন্ত চলেছিল। তখন ক্যাম্পাস ছিল প্রায় ফাঁকা। কয়েকজন ছাত্র নেতাদের আনাগোনা ছিল শুধু। কেউ জানত না যে রাতে কী ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে হবে। তখন রাত প্রায় দশটা-এগারোটা বাজে। গোপাল দাসের বাবা তখনও বাসায় ফিরেননি। ব্রজানন্দে কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন। উনি খুব ভালো মাদল বাজাতে পারতেন। মন্দির থেকে উনি জগন্নাথ হলে প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, “বাবাকে খুঁজে ওখানে গিয়ে উনাকে বাসায় নিয়ে আসি। তখন দেখেছিলাম ছাত্ররা গাছ কেটে রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করছে। এই কাজে কর্মচারীরা তাদের সহযোগিতা করেছিল। গাছ কাটার কাজে কর্মচারীরা ছাত্রদের চেয়ে বেশি দক্ষ ছিল। গাছ কেটে তারা বেরিকেড দিচ্ছিল পাকিস্তানিদের আসার আশঙ্কা থেকে।” (গোপাল দাস, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়- দুপুর ২.৩০, তারিখ- ৩০/১০/২০২৩)

২৫শে মার্চ সকালের দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের খবর যখন হলের কর্মচারীরা শুনতে পারেন, তখন খুব অল্পসংখ্যক লোকই হলে অবস্থান করছিল (Ahmed, 2009)

তখনকার দেশের পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যায়ের কর্মচারীদেরকেও বিভিন্নভাবে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত মোহাম্মদ মোশারফ তাঁর বাবা আহমেদ আলীর সাথে কাটানো ঐ সময়ের স্মৃতিচারণ করছিলেন। আহমেদ আলী সেই সময় রোকেয়া হল অফিসের কর্মচারী ছিলেন। ১৯৭১-এর মার্চে মোশারফ গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন তাঁর বাবার সাথে সুন্দর সময় কাটাতে। তাঁর বাবা তাঁকে সবসময় সঙ্গে রাখতেন। ২৫শে মার্চ দিনেরবেলায় মোশারফ শামসুন্নাহার হলের ৬ নম্বর কক্ষে ছিলেন। মার্চ মাসের পুরো সময় তিনি ঢাকায় ছিলেন। বাবার হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেছেন। তিনি বলেন যে, বাবা সকালবেলায় তাঁকে গ্রামের বাড়ি চলে যেতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “গ্রামের বাড়ি যাব। আপনিও চলেন। একসাথে যাব।” ঐসময় মানুষের মধ্যে এমন একটা আশঙ্কা ছিল যে কিছু একটা হবে। ভাষণের পরে দিন

যত যাচ্ছিল, ক্যাম্পাসে মানুষের সংখ্যা তত কমছিল। শহিদ আহমেদ আলী তাঁর ছেলেকে গ্রামে পাঠানোর আগে তিনি রোকেয়া হলের প্রভোস্ট আখতার ইমামের কাছে নিজের জন্য ছুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছুটি পাননি। প্রভোস্ট আখতার ইমাম তাঁকে বলেছিলেন "আমরা যদি বেঁচে থাকি, তোমরাও বেঁচে থাকবে।" তারপর মোশারফের বাবা তাঁকে সকালবেলা নাস্তা করিয়ে বলেন যে ম্যাডাম (প্রভোস্ট আখতার ইমাম) তাঁকে ছুটি দেননি। তখন মোশারফকে গ্রামে পাঠানোর জন্য তাঁর বাবা তাঁর খালু আবদুস সাত্তারের কাছে গেলেন। আবদুস সাত্তার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রিতে চাকরি করতো। তিনি মোশারফের বাবার সাথেই থাকতেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন ছাত্র-ছাত্রী ছিল না। ঢাকা শহরের লোকের সংখ্যাও দিন দিন কমছিল। কারণ, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। এগুলো মোশারফও দেখেছিলেন। তিনি গ্রামে যাওয়ার জন্য আবদুস সাত্তারের সাথে রওনা দিলেন। মোশারফকে নিয়ে আবদুস সাত্তার গ্যান্ডারিয়া স্টেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্যান্ডারিয়া স্টেশনে যাওয়ার পর তাঁর মনে কী অদ্ভুত কারণে একটি পরিবর্তন আসলো। তিনি মোশারফকে স্টেশনে একা রেখে আবার স্টেশন থেকে ঢাকায় ফিরেন। মোশারফ একা হয়ে গেলেন। কিন্তু সাহস নিয়ে তিনি একাই বাড়িতে গেলেন। একা বাড়িতে যাওয়ায় তাঁর মা অবাক হয়ে যান (Ahmed, 2009)

এদিকে রোকেয়া হলের মালী আব্দুল খালেক শহরের দাঙ্গা পরিস্থিতি যুদ্ধ অবধি গড়াতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর স্ত্রী ফুলবানুর কাছে। এ পরিস্থিতিতে আব্দুল খালেকের পরিবার ডেমরায় ফুলবানুর বাবা-মায়ের বাড়িতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (Ahmed, 2009)

এর ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায় জগন্নাথ হলের শহিদ কর্মকর্তা সুনীল চন্দ্র দাসের পরিবারে। তাঁর স্ত্রী বকুল রানী স্বপ্নে হাতাহাতি ও অমানবিক হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখেছিলেন। তবে তাঁর স্ত্রীর আশঙ্কাকে আমলে না নিয়ে কর্মস্থলেই থেকে গিয়েছিলেন। সুনীল চন্দ্র অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুরোধকে উপেক্ষা করেছিলেন (Ahmed, 2009)

২৫শে মার্চ সকালটি ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। অন্যান্য দিনের মতো সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। সেদিন বিকেলে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা হলের মালীকে ফুল গাছ এনে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সন্ধ্যায় নিপার (ন্যাশনাল

ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্মচারী শহিদ মনোভরনের স্ত্রী রাজকুমারী দেবী নিজ ঘরের জন্য পানি সংরক্ষণ করে রাখছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ জিসি দেব (শহিদ গোবিন্দ চন্দ্র দেব) গীতা রানীর বাসায় এসে তাঁর স্বামী ধীরেন চন্দ্রের সাথে দেশের অরাজক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। এই কথোপকথনের মাঝেই প্রাধ্যক্ষ ধীরেনকে উপাচার্যের কোয়ার্টারে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়ছে কি না তা দেখে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ধীরেন সেখানে গিয়ে কোনো কিছু দেখতে পাননি (Ahmed, 2009)

রাত নয়টার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর স্বাভাবিক পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে। রাত ৯টার দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে সেনাবাহিনী হলের দিকে আসছে। আর এই খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। হল থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্ররা অনেকেই পালিয়ে যাচ্ছিল। আবদুস সোবহানের ভাষ্য থেকে এসময় ইকবাল হলের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়।

...দেখলাম কিছু লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। তাদের অবস্থা জানতে চাইলাম। হলের নাইট-গার্ড শামসু সেখানে উপস্থিত ছিল... আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে শামসুকে নিয়ে প্রভোস্ট অফিসে গেলাম। শামসু প্রভোস্টকে ফোন করল। তিনি হলের পরিস্থিতি প্রভোস্টকে অবহিত করে একাই হলের নিরাপত্তা বজায় রাখতে অপারগতা প্রকাশ করেন। প্রভোস্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আর কেউ হলে এখনও আছে কি না। শামসুর ছেলে সাত্তার আর আমি ছিলাম। এরপর প্রভোস্ট আমাদেরকে তাঁর বাসায় আসতে বলেন। এরই মধ্যে পালিয়ে যাওয়া ২/৩ জন কর্মকর্তা হলে ফিরে আসছেন। আমরা তাদের সঙ্গে করে প্রভোস্টের বাড়িতে নিয়ে যাই... হঠাৎ বাইরে একটা হৈচৈ শুনতে পেলাম। করিডর থেকে সাত্তারকে সিদ্ধান্তহীনভাবে দৌড়াতে দেখলাম। আমি জনতাকে বলতে শুনেছি যে মিলিটারি হলগুলো অনেকবার ঘেরাও করেছিল, কিন্তু হলগুলিতে আক্রমণ করেনি (অনূদিত) (Ahmed, 2009, pp. 97-8)

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত নৈশপ্রহরী শামসুর প্রকৃত নাম মো. সামসুদ্দীন। তাঁর গ্রামের বাড়ি তৎকালীন কুমিল্লার মতলবে (বর্তমানে চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত)। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি হলের পশ্চিম দিকের পুকুর-পাড়ের পাশে কাঁচা ঘরের ছাউনিতে বসবাস করতেন। তাঁর বড়ো ছেলে দেলোয়ার হোসেন পাকিস্তান আর্মির

নতুন সৈনিক হিসেবে করাচিতে ট্রেনিং শেষ করে যুদ্ধের মাস দু'য়েক আগে দেশে ফিরেছিলেন। গ্রামে ঘর বানানোর কাজের তদারকি করার উদ্দেশ্যে সামসুদ্দীন তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের (সাত্তার ও তাঁর এক বোন বাদে) বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুই সন্তানসহ নিজে রয়ে গিয়েছিলেন হল-আঙিনায়। ২৫শে মার্চে হলে পাকিস্তান আর্মি আসার আগে সামসুদ্দীনের মেজো ছেলে আবদুস সাত্তার হলের ছাত্রদের দৌড়াদৌড়ি দেখে তাঁর পিতাকে সতর্ক করেছিলেন। সামসুদ্দীন তখন বলেছিলেন, "করুক গা, ছাত্রদের কাজ ছাত্ররা করবে। আমরা তো দারোয়ান। আমাদের তো কাজ ডিউটি করতেই হবে।" তিনি তখন চলে গিয়েছিলেন তাঁর নিয়মিত ডিউটিতে। সামসুদ্দীনের এক সহকর্মীও বলেছিলেন, "বুলুর বাপ, তুমি আজকে যাইও না ডিউটিতে। তোমারেও মাইরা ফালাইবো।" সামসুদ্দীন উত্তরে বলেছিলেন, "না, আমরা দারোয়ান; আমাদেরকে কী করব?" সন্তান-সহকর্মীর বাধা উপেক্ষা করেই ডিউটিতে গিয়েছিলেন তিনি (জমিলা খাতুন, যোগাযোগ-স্থান: শিববাড়ি আবাসিক এলাকা, তারিখ: ১/১১/২০২৩)

আরেকটি উৎস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিলিটারি আগমনের পূর্ব-মুহূর্তের ব্যাপারে জানা যায়। আব্দুল হাই কিশোর বয়সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক ভাতাপ্রাপ্ত হিসেবে স্টেট অফিসে পিয়ন পদে চাকুরি শুরু করেন। ২৫শে মার্চ সকালে তিনি রোকেয়া হলের কর্মচারী কোয়ার্টারে তাঁর স্ত্রীর বড়ো বোনের বাসায় যান। সেখান থেকে ডিউটিতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে আবার রোকেয়া হলে ফিরে এসে তাঁর জেঠাসের বাসায় খাবার খান। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই হলের পরিস্থিতি অনেক থমথমে ছিল এবং চারপাশ থেকে পাক-বাহিনীর আক্রমণ করার সম্ভাবনা সংক্রান্ত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তাঁর জেঠাস তাঁকে সেই রাতে থাকতে বললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে এরূপ আশঙ্কায় তিনি তাঁদের সাবধান করে সাড়ে এগারোটায় হল থেকে তাঁর কাটাবনের বাসার দিকে রওনা হন। যাওয়ার পথে দেখেন পাক-সেনাদের রুখতে ছাত্ররা গাছ কেটে বর্তমান আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের স্থলে যে রাস্তা ছিল তখন তা বন্ধ করছিল। সন্ধ্যার মধ্যে অনেক ছাত্র হল ছেড়ে চলে গিয়েছে এরকম শুনতে পাচ্ছিলেন। কাঁটাবনে গিয়ে দেখতে পান পাক-বাহিনীর গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং গুলি করতে করতে যাচ্ছে। কাঁটাবনের ওখানে একটি খাল ছিল যাতে তিনি নেমে পড়েন। সেখানে এত পানি ছিল না। তাই তিনি চুপটি মেরে সেখানে ছিলেন এবং

তাঁর মাথার উপর দিক দিয়ে গুলি যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অনবরত গোলাগুলি হচ্ছিল তা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন(আল-আমিন ও খান, ২০২০) ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অন্যান্য রাতের মতোই প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সাথে একত্রে গীতা পাঠ করছিলেন মিস্ত্রী রাজভর। রাত প্রায় দশটার দিকে তাঁদের এক আত্মীয় এসে সবাইকে বাইরের সামরিক অবস্থান সম্পর্কে জানালে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ত্যাগ করে নিজেদের ঘরে চলে যান (Ahmed, 2009)।

রাত প্রায় এগারোটার দিকে গীতার স্বামী বাসায় ফিরলে তাঁকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলেও তিনি কোনো খাবার খাননি। একটু পরেই গীতার স্বামী পুকুরের দিকে গেলে হঠাৎ দেখলেন যে ছাত্ররা হাতে লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তিনি আগ্রহী হয়ে ছাত্রদেরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানায় যে, "আগামীকাল সকাল থেকে ধর্মঘট হতে পারে।" (Ahmed, 2009)

জগন্নাথ হলের মালী চান্দ দেবও জানান যে, রাত এগারোটার দিকে কয়েকজন ছাত্র তার কাছে কুড়াল চাইতে এসেছিল রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়ার জন্য। জগন্নাথ হলের দারোয়ান মাখনলাল বলেন যে, ২৫শে মার্চ রাতে ছাত্ররা রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়ার জন্য হলের পুরোনো সব পানির ট্যাংক নিয়ে গিয়েছিল যাতে করে মিলিটারিদের পথরোধ করতে পারে আর তারা যেন এই হলের দিকে এগোতে না পারে (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯) ।

রোকেয়া হলের মালী আব্দুল খালেকের স্ত্রী ফুলবানু জানান, ঐ রাত এগারোটায় রেডিওতে শুনতে পান যে, ইয়াহিয়া খান ১১-দফা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। এই খবর শুনে আব্দুল খালেকের পরিবার প্রতিবেশীদের সাথে বাসার ছাদে গিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ করছিলেন (Ahmed, 2009)

২.১.২. অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ২৫শে মার্চ, ১৯৭১

গোপালদাস ও তাঁর বাবা বাসায় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ গোলাগুলি আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। তখনো বারোটা বাজেনি। বাইরে দেখলেন তখনকার যে রেললাইন (পলাশী নীলক্ষেত হয়ে সোনারগাঁও রোডে) ছিল তার পাশের বস্তিতে ভীষণ আগুন লেগেছে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিটারি

ক্যাম্পাসে ট্যাংক নিয়ে ঢুকে। যখন বস্তিতে গোলাগুলি শুরু হয়, তখন তাঁরা আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে আরো অনেককে দেখতে পেয়েছিলেন, যারা তাঁদের মতোই আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ হলে মেডিকেলের কিছু ছাত্র থাকতেন, তাঁরা মূলত নেপালি। তাঁরা আহতদের সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। কারো হাতে, কারো বা বুকে গুলি লেগেছিল। এভাবে সারারাত গুলি চলল (সাক্ষাৎকার: গোপাল দাস, স্থান- সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ফর আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়- দুপুর ২.৩০ তারিখ- ৩০/১০/২০২৩)।

কিছুক্ষণ পরে হলগুলোর সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। হলের বাহিরে, অর্থাৎ ক্যাম্পাসে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে আবদুস সোবহান ইকবাল হলের খেলার মাঠের দিকে এগোতেই সেখানে কিছু ছায়া দেখতে পেলেন এবং বুটের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্য মতে, "আমি যদি তাদের খেয়াল না করতাম, আমি এখন জীবিত থাকতাম না।" তৎক্ষণাৎ মিলিটারিদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি প্রথমে হলের পশ্চিমে থাকা তেঁতুল গাছ, পরে একটি ছোটো কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেসব জায়গায় সমবেত হয়েছিলেন আরো অনেকে। সেনাবাহিনীর গুলি, বোমা বিস্ফোরণ, আগুন লাগানো দেখে কুঠিরে আশ্রয় নেওয়া লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। মহিলারা অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। মিলিটারিদের আক্রমণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় আবদুস সোবহান কুটিরে অবস্থান করাকে নিরাপদ মনে করছিলেন না। তখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে কুটিরের পাশের একটি গর্তে তিনিসহ (আবদুস সোবহান) কয়েকটি পরিবার সারারাত লুকিয়ে থাকেন। গর্তে থেকেই তিনি অনুভব করলেন যে বুলেট ঠিক তাঁর কানের উপর দিয়ে যাচ্ছে (Ahmed, 2009)।

মিলিটারির এই আক্রমণেই সেদিন রাতে শহিদ হয়েছিলেন ইকবাল হলের নৈশপ্রহরী মো. সামসুদ্দীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবও ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার শিকার হয়েছিল। এই সময় সেখানে কোনো শিক্ষক অবস্থান করছিলেন না। তবে পাকিস্তানি বাহিনীর এলোপাথাড়ি গুলিতে শহিদ হন ক্লাবের চারজন কর্মচারী (কামাল। মেসবাহ (সম্পা.), ২০২২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবের চারজন শহিদের নাম পাওয়া যায় ক্লাবের ভেতরের গেইটের সামনের স্মৃতিফলক থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শহিদ কর্মচারীরা হলেন:

আবদুল মজিদ: তিনি ছিলেন ক্লাবের বেয়ারা হিসেবে কর্মরত। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার সুবিদপুর গ্রামে।

আলী হোসেন: তিনিও ঐ রাতে অন্যান্য ক্লাব কর্মচারীদের সাথে শহিদ হন।

সিরাজুল হক: তিনি ছিলেন এই ক্লাবের কর্মচারী। তাঁর বাড়ি পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার কারখানা গ্রামে।

সোহরাব হোসেন: তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম লাল গাজী। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার সুবিদপুর গ্রামে (চক্রবর্ত্তী, ২০১৫)।

ক্লাবের শহিদ কর্মচারী আবদুল মজিদের পরিবার সেই রাতে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আবদুল মজিদের স্ত্রী সেইসময় সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। মজিদ তাঁর পরিবারের সাথে ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি সুবিদপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২৫শে মার্চ সকালবেলা তিনি ঢাকায় চলে আসেন। পরিবারের লোকজন তাঁকে ঢাকায় আসতে বাধা দিলেও তিনি তা মানেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর চাকরি হারানোর ভয় রয়েছে। কেননা তিনি ছুটি শেষে যে বাড়িতে বাড়তি একদিন থাকবেন তা তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর মতো দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ছিল না। অগত্যা তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। আবদুল মজিদ ছিলেন ধার্মিক গোছের মানুষ। তিনি ও অন্যান্য কর্মচারীরা ভেবেছিলেন যে, তাঁদের উপর কোনোপ্রকার আক্রমণ আসবে না। শিক্ষকরা ক্লাবের কর্মচারীদেরকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু রেহাই পাননি তাঁরাও। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও বর্তমানের গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকার পাশে একটি দোকান ছিল। সেই দোকানির বাড়ি ছিল নোয়াখালীতে। তিনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মালী প্রত্যক্ষ করেছিলেন কীভাবে পাকসেনারা ক্লাবে নিহত হওয়া ব্যক্তিদের লাশগুলোকে টেনে টেনে ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য আবদুল মজিদসহ অন্যান্য কর্মচারীদের লাশগুলো পাওয়া যায়নি (সাক্ষাৎকার: মো. ইকবাল, যোগাযোগ স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন

আর্টস অ্যান্ড স্যোশাল সায়েন্সেস, তারিখ: ৩০/১০/২০২৩)। এখানে উল্লেখ্য, ঘটনার সময় মো. ইকবাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। পরবর্তী সময় তিনি আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের কাছ থেকে তাঁর বাবার আত্মত্যাগ সম্পর্কে জেনেছেন।

ঐতিহ্যবাহী মধুর ক্যান্টিনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মধুসূদন দে তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করতেন শিববাড়ি ও জগন্নাথ হলের মধ্যবর্তী স্থানে। ২৫শে মার্চ রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ বিকট গুলাগুলির আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। তাঁরা জানালার পর্দা সরিয়ে জগন্নাথ হলে মিলিটারি আক্রমণের চিত্র দেখতে পেলো। তাঁরা জগন্নাথ হলের বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পায়, অবলোকন করতে পারে মানুষের বাঁচার আকুতি। তারা তখন বুঝতে পারেনি যে, কিছুক্ষণ পরে তাঁদের সাথেও এমন ভয়ানক কিছু হতে যাচ্ছে (Ahmed, 2009)।

জগন্নাথ হলে সেই রাতের মিলিটারি আক্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন রাজকুমারী দেবী, যার চোখের সামনে তাঁর স্বামী মনোভরণ রায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাজকুমারী দেবী ২৫শে মার্চ শুনতে পেয়েছিলেন গোলমাল হতে পারে এবং তিনদিন জল থাকবে না। তবে কেন থাকবে না সেটা জানা যাচ্ছিল না। তাই সন্ধ্যার দিকে জল তুলে ঘরের কাজ সেরে শুয়ে পড়েছিলেন। রাত ১১টার দিকে কয়েকজন ছাত্র এসে বস্তির মানুষদের ডেকে তুলছিল কুড়াল দেওয়ার জন্য। কেউ যখন দরজা খুলছিল না, তখন তাঁদের মধ্যে একটা ছাত্র বললেন, "ঘুমাও বাবু বুঝবা। রাস্তা ব্লক করতে হবে, তা আর হলো না।" রাজকুমারী স্বামীকে ডেকে তুলে তখন ছাত্রদের কথা বললেন। তার প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে একজন এসে তাঁর স্বামীকে বললেন যে, নিউমার্কেটের দিকে আগুন লেগেছে। এর কিছুক্ষণ পরে প্রায় বারোটার দিকে একটা বিকট শব্দ শোনা যায় হলের খেলার মাঠের সামনে যে গ্যালারি আছে সেখানে। বাহিরে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছিল। এতে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লাইট নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়েন। মেঝেতে শুয়ে থেকেই গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত কামান দাগার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। এদিকে ছাত্ররা আবার জানালা দিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে বস্তির দিকে আসছিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যে হানাদার বাহিনী তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের পুরুষলোক কারা আছে তাঁদের খোঁজ করে। রাজকুমারী দেবীর বৃদ্ধা কাকী তখন বললেন যে তাঁরা সামনে গিয়েছে। পাকসেনা দুই গ্লাস পানি খেতে চাইল। তারপর তাদের গান-পয়েন্টে রেখে মাঠে যেতে বাধ্য

করল। তখন আবার একজন মেজর তাঁদেরকে ঘরই ছেড়ে দিতে বলল। তখন ঘরে নিরাপদ না ভেবে রাজকুমারী দেবী তার তিন বাচ্চাকে নিয়ে মেথর-পল্লীতে মন্‌জুদের বাসায় আশ্রয় নিতে যান এবং সেখানে তাদের দেওয়া কাপড় পরে নেন। মিলিটারি পরবর্তীতে সেই বাড়িতেও ঢুকে এবং তাঁদের সুন্দরী বউদের নিয়ে টানাটানি শুরু করে। তখন রাজকুমারী দেবী তাঁর সন্তানদের নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই পাশের একটা টয়লেটের আড়ালে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন। তখন তিনি ভাবছিলেন আলমারির ভেতর তার স্বামী সুরক্ষিত আছেন। যখন সুধীর বাবুর ক্যান্টিনে আগুন ধরিয়ে দিলো, তখন তাঁর স্বামীর সাথে দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে সাবধানে থাকার কথা বলেছিলেন। এভাবে আতঙ্ক-অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে সেই রাত কেটেছিল তাঁর (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

২৫শে মার্চের ভয়াবহতার মধ্যে গুলিবদ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে যাওয়া মোহন রায়ের (মালী) বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর স্ত্রী শান্তি রায় তাঁকে ডেকে তুলে মিলিটারিদের আগমনের খবর দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে মোহন রায় ঘরের জানালা ভেঙ্গে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিলেন। এই সময় বাংলার নারীদের আত্মত্যাগের চিরায়ত মহিমায় অবতীর্ণ হয়ে শান্তি রায় পরিকল্পনা করেছিলেন খাটের নিচে স্বামী, সন্তান, ভাইকে লুকিয়ে কীভাবে সশস্ত্র ও হিংস্র মিলিটারিদের সামনে নিজেই দাঁড়িয়ে বলবেন ঘরে তাঁর স্বামী অনুপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু পাকিস্তানিরা স্টাফ কোয়ার্টারের দরজাগুলোতে আঘাত করে করে অনবরত গুলি চালানো শুরু করলে তাঁর এই পরিকল্পনা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। মিলিটারি মোহন রায়ের ঘরের দরজা ভেঙে গুলি চালালে তাতে তিনি ও তাঁর শ্যালক গুলিবদ্ধ হন; নিহত হন তাঁর স্ত্রী। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছোট্ট বাচ্চাটি (শিবু) সে যাত্রায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মোহন রায় ঐ সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও মাঝরাতে শিবুর কান্নায় তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুজন মিলিটারি আবারো তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে। মোহন রায় মৃতের অভিনয় করে পড়ে থাকলেও মিলিটারিদের পায়ের আঘাতে শিবুর মৃত্যুতে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। এ পর্যায়ে মিলিটারি তাকে আবার গুলি করে, মারাত্মকভাবে আহত হন তাঁর শ্যালক শঙ্করও। তবে দুজনেই বেঁচে ছিলেন ২৫শে মার্চ কালরাতে। তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর শ্বশুর নমী রায়কে (দারোয়ান) যাকে মিলিটারি জগন্নাথ হলের প্রবেশমুখে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল (Ahmed, 2009)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্মরত কেশব চন্দ্র পাল ২৫শে মার্চের জগন্নাথ হলের তৎকালীন পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ২৫শে মার্চ বিকেলে অফিস থেকে জগন্নাথ হলে তিনি তাঁর বাসায় আসলেন। রাত দশটা পযন্ত চারিদিকে একটা থমথমে পরিস্থিতি ছিল এবং লোকজন ভীত ছিল। রাত বারোটার দিকে গোলাগুলির শব্দ শুনে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে এসেম্বলি হাউজের অডিটোরিয়ামে রেখে এলেন। যেহেতু অডিটোরিয়াম খালি ছিল এবং বেশ কিছু বড়ো বড়ো প্রতিমা রাখা ছিল, তাই তিনি নিরাপদ মনে করেছিলেন। এসেম্বলিতে যাওয়ার পথে একজন ছাত্র বলল ভয় না পেতে। কারণ ইকবাল হলে ছাত্ররা ট্রেনিং করছিল। আত্মীয়দের এসেম্বলিতে রেখে বাসায় ফিরে বুঝতে পারলেন জগন্নাথ হলে পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে। পাকবাহিনী পশ্চিম দিক থেকে বোমা ফাটিয়ে গুলি করতে করতে ভেতরে ঢুকল। পাকবাহিনী ভিতরে ঢুকে কর্মচারীদের কোয়ার্টারে তল্লাশি শুরু করল। একে একে তল্লাশি করতে করতে তাঁর বাসায় ঢুকল। হল আক্রান্ত হবার কারণে বকশিবাজারের এক ডাক্তারের ড্রাইভার, বুদ্ধি, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কেশব চন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকবাহিনী ঘরে ঢুকলে বুদ্ধি ও তিনি খাটের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘরের সামনে উনার শাশুড়ি আর্মিদের জানান যে, বাসায় কেউ নেই। তাঁদের টর্চলাইটে বেশি আলো হয়নি বিধায় দেখতে না পাওয়ায় ঐ মুহূর্তে উনারা বেঁচে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের ভিতরে পাক সেনাবাহিনী উত্তর-পূর্ব পজিশন নিলো। ভোর হওয়ার আগে ছাত্রদের টিনশেডের আবাস ঘর জ্বালিয়ে দিলো। এই ঘরটার আগুন চারপাশে ছড়িয়ে কেশব চন্দ্র পালের ঘরের দিকেও আসতে লাগল। পাকবাহিনীর ধরানো আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকায় তাঁরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন। অন্যদিকে, এসেম্বলিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবস্থা জানতে পারলেন। সেইখানে বাহিরে তালা দেখে মিলিটারি চলে যাচ্ছিল। তবে সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চার কান্না শুনে তারা তালা ভেঙে এসেম্বলির ভিতরে ঢুকেছিল। মিলিটারি তল্লাশি চালিয়ে হলের দারোয়ান সুনীলকে পায় এবং তাঁকে বর্তমান সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া হলের হাউজ-টিউটর অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের হাত তাঁর নিজের ধুতি দিয়ে বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি ছিলেন বেশ অপ্রকৃতিস্থ। তাঁকে প্রথমে মারধর করা হয়েছিল এবং তাঁকেও সুধীরদার ক্যান্টিনের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

ল্যাবরেটরি স্কুলের কর্মচারী শহিদ খগেন দের স্ত্রী রেনুবালা দের কাছেও ২৫শে মার্চের জগন্নাথ হলের পরিস্থিতির কথা জানা যায়। সেদিন রাতে গোলাগুলির শব্দে তাঁদেরও ঘুম ভেঙে যায়। পরে রেনুবালা ও তার স্বামী খগেন চন্দ্র পালাক্রমে একজন জেগেছিলেন এবং আরেকজন ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এসব শব্দের উৎস হচ্ছে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। কিন্তু, অল্প সময়ের ব্যবধানে শব্দের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় রেনুবালা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বাইরে প্রচুর লাইট জ্বলছে। লোকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। "বিয়ের বাজি ফুটছে না কি ফায়ার হচ্ছে কিছুই বুঝা যায় না। একবার আমি ঘরে যাই, একবার বাইরে আসি।" শব্দের বেগ আরো প্রচণ্ড হলে তিনি তাঁর স্বামীকে ঘুম থেকে জাগাতে গেলে তাঁর স্বামী বললেন, "এগুলো বাজি নয়, ফায়ারের শব্দ। আমি উঠে কী করব?" এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো হলের বিদ্যুৎ চলে যায়। রেনুবালা বাইরে এসে দেখেন, বিন্দুর মা এবং আরো অনেকে তাদের স্ব স্ব ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। শিবু নামের একটি ছেলের কাছ থেকে রেনুবালা মিলিটারিদের হল আক্রমণের খবর শুনতে পান। শিবু তাঁকে বলেছিলেন, "আমাদের বাঁচার তো কোনো উপায় নেই। ছাত্র তো নেই। সব বিপদ আমাদের উপর পড়বে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। ফায়ার করলে উপর দিয়ে যাবে।" তিনি ঘরে গিয়ে তাঁর স্বামীকে বললেন, "মনে হয় বিহারি এসেছে, রায়ট লেগে গেছে, এবার সব শেষ করে ফেলবে।" কিন্তু তাঁর স্বামী রেনুবালার এ বক্তব্যের সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এরই মাঝে বিকট আওয়াজে তাঁদের ঘরের সকলে (বাচ্চারা) জেগে ওঠে। ঘুম ভেঙে রেনুবালার বড়ো ছেলে মতিলাল বলতে থাকে, 'বাবা আমি বারবার আপনাকে বলেছিলাম বাড়ি যেতে। আপনি গেলেন না। আর আমাকেও যেতে দিলেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইলাম তাও আপনি দিলেন না। কাউকে যেতে দিলেন না। আজকে আর কারোরই বাঁচার কোনো উপায় নাই। আজ এখানেই মরণ।' ছেলের এই কথাতে বাবা খগেন ধমক দিয়ে তাকে বলেন, "চুপ থাক! যদি পরমআয়ু থাকে তা কেউ কোনোদিন নিতে পারে না। কত যুদ্ধ গেল। কত রায়ট গেল। আমার তো কিছুই হলো না। আমি সেই একইরকম আছি।" কিন্তু তাঁর এই নিশ্চয়তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। মিলিটারি ফৌজ প্রত্যেকের ঘরের দরজায় গিয়ে লোকজনকে ধরে নিতে শুরু করে। রেনুবালাদের ঘরের দরজায়ও এসেছিল একসময়। কিন্তু তখন সৈন্যরা অন্য আরো লোকজনকে ধরার ব্যস্ততায় তাঁরা প্রথমে ধরা পড়েননি। তবে ভাগ্য তাঁদের বেশিক্ষণ সহায় হয়নি। তাঁদের ঘরের পেছনের টিনশেডে আগুন

ধরিয়ে দেওয়া হলে রেনুবালা তাঁর ছোটো ছেলে শিবু ও মেয়ে বাসনাকে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

মায়ের হাত ধরে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা সেই ছোট্ট মেয়ে বাসনা পরবর্তীতে ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর অগ্নি-সংযোগের স্মৃতিচারণ করে বলেন, পাকসেনাদের কয়েকজন না কি প্রতিটা ঘরের সামনে গিয়ে বলেছে, "তোমরা তোমাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে আসো। আমরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগে সব বের করে নিয়ে আসো।" বাসনার বাবা খগেন তাঁর ও তাঁর বড়ো ভাই মতিলাল তাঁদের ঘর থেকে সকল জিনিসপত্র টেনে বাইরে আনবার কাজে লেগে গিয়েছিলেন (বিস্তারিত জানতে দেখুন: বাসনা দে লিখিত '২৬ মার্চ'৭১: যা ঘটেছিলো, যা দেখেছিলাম' লিখিত *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, পৃ. ৩১)

রেনুবালা তাঁর দুই সন্তানকে (বাসনা ও শিবু) নিয়ে গোয়ালঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্বামী খগেন চন্দ্র ও বড়ো সন্তান মতিলাল এসে তাঁদের সাথে যোগ দেন। আগুনের জ্বলন্ত শিখা চারপাশকে এত আলোকিত করে ফেলে যে, তাঁরা বুঝতেই পারছিলেন না এই আলো কি উষার আলো কি না? এই সময়ে সৈন্যরা তাঁদের দেখতে পায় এবং তাঁদের সাথে আরো কিছু লোককে ধরে এনে গোয়ালঘরের মধ্যে রাখেন। এরপর তারা (মিলিটারি) বন্দুক উঁচিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, "শুয়োর কি বাচ্চে! জয় বাংলা বল। বল জয় বাংলা। তোমারি বাপকো বোলাও, বাঁচায়ে গা।" (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ.৯৮-৯)

মায়ের কোলে থাকা সেই ছোট্ট শিবু পরবর্তীকালে তাঁর মা রেনুবালাদের কাছ থেকে শুনেছিলেন ২৫শে মার্চ রাতের সেই ভয়াবহতার কথা। হানাদার বাহিনী জগন্নাথ হল আক্রমণ করার পর তাঁর বাবা ও ভাই মতিলাল প্রথমে গোবর দিয়ে বানানো গৈঠা বা ঘুটের পেছনে লুকালেও কিছু সময়ের ব্যবধানে তাঁরা পাকসেনাদের নজরে পড়ে যায়। তাঁর ভাই শহিদ মতিলাল নবম শ্রেণির ছাত্র হলেও শারীরিক গঠনে বড়োসড় ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি পাকসরকার-বিরোধী মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। পাকসেনাদের কাছে না কি খবরও ছিল যে মতিলাল সামরিক প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কিশোর বালক মতিলালকেও পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায় (সাক্ষাৎকার: শিবেন্দ্র দে, যোগাযোগ-

স্থান: দর্শন বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ৮/১১/২০২৩)

জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ের কর্মচারী গোপালচন্দ্র দে ২৫শে মার্চের গণহত্যার ঘটনাবলিকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর দেখা বিবরণ থেকে তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সেদিনের পরিণতি সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। ২৫শে মার্চ রাতে তিনি প্রাধ্যক্ষের বাসায় কর্মরত ছিলেন। সে সময় হলে মানুষ কম ছিল। মুক্তি-বাহিনীর সাথে কর্মচারীদেরও তখন ট্রেনিং নিতে হয়েছিল জগন্নাথ হল মাঠে। সেদিন রাতে গোপাল দে বাসায়ই কর্মরত ছিলেন। আনুমানিক রাত বারোটায় ৫/৬টা গাছ কেটে আর ইট-পাথর দিয়ে লোকজন ও ছাত্ররা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সেটা দেখছিলেন এবং হলগেটের সকল দারোয়ানকে সাবধানে থাকতে বলেন। প্রাধ্যক্ষ তখন তাঁর বাসভবন অর্থাৎ জগন্নাথ হলের পূর্বদিকের ৫২নং টিচার্স কোয়ার্টারের মেইন গেটে তালা দিতে বলেন। গোপাল চন্দ্র দে গেটে তালা দিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রাধ্যক্ষের বাসায় তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং একজন গৃহকর্মী ছিলেন। আনুমানিক রাত দুই থেকে তিনটার দিকে বুঝতে পারেন যে, মিলিটারি পুরো হল ঘিরে ফেলেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন মিলিটারি কাঠের গুঁড়িগুলো সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ভেতরে ঢুকে গেল। চারিদিক থেকে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল এবং কান্নার শব্দ আসছিল। তিনি দ্রুত গুহঠাকুরতার বাসায় যান। তখন কিছুটা দূর থেকে তিনি দেখলেন প্রাধ্যক্ষের বাসায় লাথি দিয়ে দরজা খুলতে বলছিল এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল। গৃহকর্মী এসে গোপালকে জানালেন যে, প্রাধ্যক্ষকে মিলিটারি মেরে ফেলেছে। তিনি পানি খেতে চাইছিলেন। (তিনি হয়তো ভয় পেয়ে কথা বলছিলেন। তিনি তখনও জানতেন না প্রাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সাথে ঠিক কী হয়েছিল। গুলিতে আহত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ৩০ মার্চ ১৯৭১ শহিদ হন) এর দশ মিনিটের মধ্যে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে মিলিটারি এবং বাসায় ঢুকে সবাইকে খুঁজে বের করে। প্রাধ্যক্ষের বাসায় গিয়ে তখন গোপাল দে জানতে পারলেন যে প্রাধ্যক্ষকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি। প্রাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা গোপাল দে'কে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বলেন। তখন আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পাঠানোর কথা চিন্তা করছিলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা। কিন্তু টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তখন কোয়ার্টারের পেছনের দিকে পুকুরপাড়ে গিয়ে চিন্তা

করছিলেন কী করা যায় এবং তার ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে দেখা গিয়েছিল আগুনের মতো গোলাগুলি আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। মিলিটারি প্রাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঘরের পেছনে রেখে যায়। সবাই গিয়ে দেখেন উনার দুটো গুলি লেগেছে এবং তখনও জ্ঞান আছে। গোপাল দে জানান যে, তখন স্যারের (জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা) সমস্ত শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক চেষ্টার পরও উনাকে তুলে বাসায় নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময় মনিরুজ্জামান এবং তাঁর ভাইকেও গুলি করে মারা হয়েছিল এবং উনাদের সন্তানেরা কান্নাকাটি করছিল। সেখানে আরেকটা ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং পানি চাচ্ছিল। গোপাল দে আরও জানান যে, প্রাধ্যক্ষকে অনেক কষ্টে ধরে হাঁটিয়ে ঘরে আনা হয় এবং স্যারের গলায় তখনও গুলি ছিল। সে রাতে চারদিকের গুলাগুলির মধ্যে ডাক্তার আনা সম্ভব হচ্ছিল না এবং ঘরের মধ্যে প্রাধ্যক্ষকে নিয়ে সে রাতে এভাবেই কাটানো হলো (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯) (শহিদ বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও তাঁর শহিদ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন বাসন্তী গুহঠাকুরতার লেখা *একাত্তরের স্মৃতি*, ১৯৯৪ সালে ইউপিএল থেকে প্রকাশিত)

অপারেশন সার্চলাইটের আগ-মুহূর্তে পানির ট্যাংক দিয়ে রাস্তা ব্লক করার কাজে ছাত্রদের সাথেই ছিলেন জগন্নাথ হলের তৎকালীন প্রধান দারোয়ান মাখনলাল রায়। গোডাউন থেকে ছাত্ররা পুরাতন পানির ট্যাংক নিয়ে রাস্তা বন্ধের কাজ করছিলেন যেন মিলিটারিদের আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইকবাল হলে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়ার পর সে বিষয়ে মাখলাল রায়ের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ছাত্রদের সাথে তাঁর কথোপকথন ছিল এমন, “তাঁরা (ছাত্ররা) বলেন যে, না; ও তো আমাদের ছেলেরা করছে। আমি বললাম এত গোলাগুলি ছাত্ররা করছে বলে আমার মনে হয় না।” তখন তাঁরা বললেন, “দেখি তো কী ব্যাপার?” তখন দুই থেকে তিনজন ব্রিটিশ কাউন্সিলের দিকে গেলেন এবং দৌড়ে এসে জানালেন যে মিলিটারি ইকবাল হলে গোলাগুলি করছে। এখন কী করতে পারি? এই কথা ভাবতে ভাবতে মিলিটারি এসে আমাদের হল ঘিরে ফেলেছে। মিলিটারি জগন্নাথ হলে প্রবেশ করেছিল মাঠের পাশের ভাঙা দেওয়ালের অংশ দিয়ে। তাঁরা ঢুকেই গুলিবর্ষণ শুরু করেছিল। তখন ৩০ থেকে ৩৫ জন আবাসিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। গুলির হাত থেকে বাঁচতে ছাত্ররা দিগ্‌বিদিক ছুটাছুটি করছিল। মাখনলালে’র মতে এই সময় মিলিটারি

আক্রোশবশত উত্তর-বাড়িতে গুলি করেছে। মাখনলাল ঐ সময় তাঁর সহকর্মী প্রিয়নাথের সাথে দক্ষিণ-বাড়ির গেটে ছিলেন, যেখানে উত্তর-বাড়ির গেট থেকে একটি আর্মির গাড়ি এসে থামে এবং তারা গাড়ি থেকে নেমে প্রিয়নাথকে ধরতে পারে। মাখনলাল ছুটে পালিয়ে যান। তিনি পরে শুনেছিলেন যে, প্রিয়নাথকে হলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সুধীরের ক্যান্টিনের দিকের বরই গাছের নিচে হত্যা করা হয়েছিল। আর মাখনলাল ছুটে গিয়ে দক্ষিণ-বাড়ির দক্ষিণ দিকের একটি রুমে আলো নিভিয়ে চেয়ারের নিচে অন্য কয়েকজন ছাত্রীর সাথে লুকিয়ে পড়েছিলেন। চারজন মিলিটারি সেখানে খুঁজে গেলেও কাউকে না পেয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এ সময় সেখানে অবস্থান নেওয়া ছাত্রদের সাথে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন তা ছিল এমন, "আমরা আস্তে আস্তে কথা বলছি যে, বাবু ওরা এভাবে হামলা করছে এখন কী হবে? এভাবে বসে বসে কথা বলছি আর এদিকে খুব গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এত শব্দ হচ্ছে যে, সমস্ত হলটাই কাঁপছে। ছাত্র-বাবুরা বলছে, কী আর করবে, ধরে ক্যান্টেনমেন্টে নিয়ে যাবে, মারধর করবে, পরে ছেড়ে দিবে" এইটুকু আশ্বস্ত করল ছাত্র-বাবুরা আমাকে। তাদের এই আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় যে, হলের অন্যত্র ঘটতে থাকা গণহত্যার স্বরূপ সম্পর্কে দক্ষিণ ডাইনিং সংলগ্ন রুমে ভাঙ্গা চেয়ারে লুকিয়ে থাকা মোহনলাল ও তার ছাত্র-বাবুরা তখন পযন্ত আঁচ করতে পারেননি। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আরো পরে (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

২৫শে মার্চ পাকবাহিনীর জগন্নাথ হলে আক্রমণের মধ্য দিয়ে অন্যান্যদের পাশাপাশি মালী চান্দ দেব, মোহন ও শ্যামলালকেও অনাকাঙ্ক্ষিত বহু অভিজ্ঞতার স্বীকার হতে হয়েছিল। ২৫ তারিখ বিকেল পাঁচটার দিকে মালী চান্দ দেব রায় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাড়ি গেলে বিষণ্ন মনে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা চান্দ দেবকে পরের দিন রজনীগন্ধার চারা এনে দিতে বলেন। চান্দ দেব সম্মতি জানালে গুহঠাকুরতা তাঁকে বলেন "দেখো চতুর্দিকে কিরকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে, অবস্থা বিশেষ ভালো মনে হচ্ছে না। রাতে তোমরা একটু সাবধানে থাকবে, সম্ভবত রোড কারফিউ হতে পারে। তোমরা ঘর থেকে বের হবে না। নিরাপদে থাকবে বাসায়।" চান্দ দেব রাত দশটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সম্পন্ন করে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বারোটা বাজার কিছু আগেই ক্রমাগত ব্রাশফায়ারের শব্দ হতে লাগলো। এই শব্দে ভয় পেয়ে তাঁরা সকলে মাটিতে শুয়ে পড়েন। রাত তিনটার দিকে চান্দ দেবের পরিচিত কয়কজনকে পাক-সৈন্যরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য তিনি গরুর ঘর

থেকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। এরপর তিনি গায়ে একটি কালো চাদর জড়িয়ে বাহিরে বের হয়ে আসেন সার্বিক পরিস্থিতি দেখার জন্য। আর তখনই দুজন সৈন্য তাকে দেখে ফেলে এবং তাকে ধরার জন্য এগিয়ে আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ হেড-দারোয়ান মাখনের হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন। তিনি দেখছিলেন, পাক-বাহিনী যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই ধরে মারধর করছিল। এরপর তাঁরা ডাইনিং হলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সম্ভবত কেমিক্যাল বা পাউডার ব্যবহার করেছিল আগুন ধরাবার জন্য। চান্দ দেব বলেন "তারা সম্ভবত বুঝতে পারল যে ঘরের ভেতর লোক আছে। আগুন ধরিয়ে দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।" (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ৭৪-৬)

এই আগুনের কথা মালী মোহনও বলেছিলেন। মোহন বলেন, "কী একটা পাউডার দিয়ে ওরা আগুন লাগালো।" মোহন ২৫শে মার্চ রাতে প্রচণ্ড জ্বরে ঘুমে প্রায় অচেতন ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে দেখেন আকাশে লাল আলো এবং ধোঁয়ার আভা। তাঁদের ঘর থেকে তিনি দেখলেন পাকিস্তানি আর্মি জগন্নাথ হল এবং হল সংলগ্ন এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাক আর্মি তাঁদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং দরজা খুলতে বলে। মোহনের পরিবারের সকলেই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং উর্দুতে পাক সৈন্যদের বলে "হাম লোক কই কাছর নেই হ্যায়, হাম লোককা ওপর মা জুলুমছে আয়া।" তাঁদের কথা শুনে সৈন্যরা তাদেরকে মেজরের কাছে নিয়ে যায়। তখন রাত প্রায় চারটা বাজে। এই দিশেহারা অবস্থাতেই ২৫শে মার্চ রাতটা কাটে মোহনের পরিবারের (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ৮৫-৬)।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করা নিরাপদ নয় বিবেচনা করে লোকজন যেখানে অত্র এলাকা ত্যাগ করছিলেন, সেখানে ২৫শে মার্চ তারিখটিতে ভাগ্যের উপর ভরসা রেখেই নিজেদের ডেরায় থেকে গিয়েছিলেন জগন্নাথ হলের অনেক কর্মচারী। সন্ধ্যায় কয়েকজন প্রতিবেশীর সাথে মহাভারত পাঠের পর বাড়িতে খাবার গ্রহণ শেষে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন জগন্নাথ হলের প্রাক্তন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি চিৎবল্লী। ঘুমানোর পূর্বে কিছু আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে শিববাড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন যে কতগুলো বন্দুকের নল তাক করে রাখা হয়েছে জগন্নাথ হলের চারদিকের দেওয়ালে। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে চিৎবল্লী চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরিবারসহ বাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় অনবরত গুলির আওয়াজে বাইরে আসেন। তিনি দেখলেন দুজন লোক ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য শিববাড়ি যাওয়ার দিকের

দেওয়ালের কাছে গিয়ে ফেরত আসলো। তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, মিলিটারি চলে এসেছে হলে। এক পর্যায়ে দুজন মিলিটারি যখন তাঁর বাসায় আসে, তখন তিনি তাঁর মেয়েকে কোলে করে দাঁড়িয়েছিলেন। মিলিটারিদের নির্দেশমতো মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে চিৎবল্লীকে তাদের সাথে যেতে হয়েছিল। পিঠে বন্দুক তাক করে তারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল মেথর বুদ্ধ'র বাড়িতে। মিলিটারি সেই বাড়ির চারটি ঘরে ঢুকে কী খুঁজছিল তা চিৎবল্লীর অজানা। পরে তিনি বাড়িতে চলে আসার পরে মিলিটারি তাঁর বাড়িতে আরেকবার এসে তাঁর খোঁজ করে গিয়েছিল। মিলিটারি সেই রাতে আর তাঁর (চিৎবল্লী) বাড়িতে হানা দেয়নি। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ক্যান্টিন, ক্যান্টিন সংলগ্ন ছাত্রাবাস, হল-কর্মচারীদের বাসস্থানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার নৃশংসতা। সেই আগুন তাঁদের বাসার (বর্তমান পূর্ব-বাড়ির উত্তর দিকে) দিকে আসতে থাকায় চিৎবল্লীর পরিবারসহ বুরাম, দাসুরাম, নরেশের পরিবারের লোকজন একত্রিত হয়ে ঘরের সামনের একটি জায়গায় অবস্থান নিয়েছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ের প্রাক্তন কর্মচারী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে ২৫শে মার্চ রাতের বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন। ২৫শে মার্চ রাতে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর প্রতিদিনের কাজ করেন। বাইরে থেকে তিনি রাত নয়টা-দশটার দিকে ঘরে ফিরেন। ঘরে ফেরার পথে বিভিন্ন বিষয় দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিছু একটা ঘটতে পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিটারি ট্যাংক নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অনেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়। তিনি যখন বাসায় ফিরে আসেন, তখন বাসা থেকে বিকট আওয়াজ শুনতে পান। তখন তাঁরা ঘরের সব লাইট বন্ধ করে দেয়। অনেকে ওই সময় বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি শুরু করল। রাত দুইটা থেকে তিনটার দিকে তাঁদের দুইজন ছাত্র এসে আশ্রয় নিলেন। তখনো প্রচণ্ড গুলি হচ্ছিল। সেখানে দুই থেকে তিনটা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি আরো দেখতে পান যে, নর্থ হাউসে কোনো কোনো ঘরে আগুন জ্বলছে। ওই রাতের দুইটা বা তিনটার দিকে আরো তিনজন ছাত্র তাঁদের ঘরে এসে আশ্রয় নিলো। কিন্তু এই তিনজন ছাত্র তাঁদের বিবাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কারণ যখনই কোনো আওয়াজ শোনা যেত, তখনই তাঁরা জোরে চিৎকার দিয়ে উঠতেন। তখন ধীরেন চন্দ্র দে তাঁদের মুখে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন যাতে আর চিৎকার করতে না পারে। যখন ধীরেন তাঁদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল, তখন তাঁরা চিৎকার

বন্ধ করে দেয়। এভাবে ধীরেনচন্দ্র দে ২৫শে মার্চ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পার করেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

রাত এগারোটার দিকে বকুল রানী বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে শঙ্কিতমনে তাঁর সন্তানদের জড়িয়ে ধরে বসে কাঁপছিলেন ও কাঁদছিলেন। পরে রাত ১/২টার দিকে এক বৃদ্ধ লোক তাঁদের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বকুল রানী মিলিটারি কর্তৃক এলাকা ঘেরাও, কোয়ার্টারের দরজা ভেঙে ভেঙে গুলি করার বর্ণনা সম্পর্কে জানতে পারেন। বকুল রানীর ভাষ্যমতে, মিলিটারি হত্যার পরে মৃতদেহগুলো বাথরুমে ও পানির ট্যাংকে ফেলে দিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তানদের সাথে করে বকুল রানী হলের সমাবেশ-কক্ষে অন্য অনেকের সাথে গিয়ে জড়ো হয়েছিলেন, যেখানে তাঁর স্বামী সুনীলও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। পরে মিলিটারি এলে তাঁরা সরস্বতী দেবীর মূর্তির আড়ালে লুকালেও শেষ রক্ষা হয়নি। মিলিটারি তাঁর স্বামীর কোল থেকে তাঁদের মেয়েকে আলাদা করে ফেলে। পরে তারা সুনীলকে ধরে নিয়ে যেতে থাকে। বকুল রানী তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে মিলিটারি তাঁকে (বকুল রানী) ধমক দেয়। বকুল রানী তাঁর চোখের সামনে স্বামীকে বরই গাছের দিকে নিয়ে যেতে দেখলেন, যা ছিল তাঁর স্বামীকে শেষবার দেখা। এরপর তিনি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। সমাবেশ-কক্ষে আশ্রয় নেওয়া সকলে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করে। পরে গভীর রাতে তাঁরা গ্যালারিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সময় এক যুবকের কাছে তিনি জানতে পারেন যে, মিলিটারি অনেককে গ্রেফতার করেছিল, যাদেরকে দিয়ে তারা লাশগুলো টেনে গণকবরে ফেলার কাজ করিয়েছিল। তাদেরকে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে বলা হলেও তাঁরা ভয়ে তা বলতে পারেনি এবং তখন তাঁদেরকে ভাঙা দেওয়ালের দিকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। ওই যুবকের কাছে বকুল রানী তাঁর স্বামীর বেঁচে থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, যদিও তা বাস্তবে ঘটেনি (Ahmed, 2009)।

জগন্নাথ হলের মিস্ত্রি রাজভরের মেয়ে উমা রানী বলেছিলেন অন্য এক অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর বাবা শুনেছিলেন পাকবাহিনী স্ত্রী ও মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। এতে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উমা রানী এবং তাঁর প্রতিবেশী একজন মেয়েকে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখলেন। উমা রানীর বাবা গোবরের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। এভাবে রাত পার করেন (Ahmed, 2009)।

এরকম অনেকেই ছুটাছুটি করছিলেন নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাগিদে। এমন একটা দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় গীতা রানীর বক্তব্যে। ২৫শে মার্চ রাতে খাবার শেষে বাইরের গোলাগুলির আওয়াজ শুনে তাঁরা ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। এর কিছুক্ষণ পরে দুজন ছাত্র তাঁদের দরজায় আশ্রয়ের জন্য এলে গীতা রানীর পরিবার তাঁদেরকে ঘরে আশ্রয় দেন। ভোরের দিকে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরেকজন ছাত্র তাঁদের ঘরে আশ্রয় চাইতে এলে তাঁকেও আশ্রয় দেন। এইসব উৎকণ্ঠার মধ্যে তাঁদের ঘরের পাশ দিয়ে সামরিক বাহিনীর তিনটি জিপ যাওয়ার সময় তাঁদেরকে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে রাখতে নির্দেশ দিয়ে যায়। আর তাঁরা সারারাত ঐ ঘরবন্দি অবস্থায় কাটান (Ahmed, 2009) ।

জগন্নাথ হলের এই নৃশংসতার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন রোকেয়া হলের তৎকালীন কর্মচারী নেওয়াজ আলীর পরিবার। তাঁর মেয়ে হাসিনা হাফিজের (পরবর্তীতে রোকেয়া হলের প্রধান সহকারী) ভাষ্যে সেই রাতের ভয়াবহতার আরেকটি চিত্র পাওয়া যায়। হাসিনা হাফিজের বাবা নেওয়াজ আলী হঠাৎ গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজে ঘুম ভেঙে দেখলেন পাকিস্তানি বাহিনী জগন্নাথ হলে ছাত্রদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে এবং কিছু বাঙালি লাশগুলোকে স্তূপাকারে রাখছেন। এ আর্তনাদের মধ্যেই তিনি দেখলেন যে, রোকেয়া হলের গার্ড নমি রায়কে মেশিনগান দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রোকেয়া হলে প্রাঙ্গণেও হানাদার বাহিনীর বর্বরতা শুরু হয়ে যায়। তিনজন সেনা রোকেয়া হলের স্টাফ আলী আক্কাসের স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিবস্ত্র অবস্থায় ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে।

দেখতে দেখতেই পাকিস্তানিরা হানা দেয় হাসিনা হাফিজেরর পরিবারে। পাঁচ থেকে ছয়জন সেনা যখন তাঁদের ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে, তখন হাসিনা হাফিজ কোরআন তিলওয়াতরত অবস্থায় ছিলেন। এই সময় তাঁর বাবা নেওয়াজ আলীও কুরআনের আয়াত তিলওয়াত করছিলেন। দেওয়ালে কবি ইকবাল, কবি নজরুল, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও কাবা শরিফের ছবি টাঙানো ছিল। একটি ক্যালেন্ডারে শেখ মুজিবের ছবি ছাপা হয়েছিল এবং এটি দেখে পাকিস্তানি সৈনিকরা তাঁদেরকে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করেছিল। কেন বিশেষ ছবি সেখানে ছিল তা নিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করেছিল। নেওয়াজ আলীর ছোটো মেয়ে রওশন আরা এই প্রশ্নটিতে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, যে তাঁরা সবাই মুসলমান। চোখের পলকে

সেনারা রওশন আরা ও নেওয়াজ আলীকে গুলি করে। তাঁদেরকে বাঁচাতে হাসিনার মা এগিয়ে এলে তাঁকেও গুলি করা হয় এবং পরক্ষণে হাসিনা হাফিজের ভাই ও হাসিনা হাফিজকে গুলি করা হয়। হাসিনা হাফিজের পেটে ও ডান হাতে গুলি লাগে। তিনি মেঝেতে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে। তাঁর প্রচণ্ড পানি পিপাসা পায়। হঠাৎ করে তিনি তাঁর বাবা, ভাই ও বোনের গলা শুনতে পায়, তাঁরা সকলে 'পানি, পানি' বলছিলেন। হাসিনা হাফিজ দেখেন তাঁর মা নিহত হয়েছেন এবং মায়ের গায়ের সাথে দেড় বছর বয়সী ছোটো ভাই মায়ের শরীরে উপর ঝুঁকে আছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার আসে এবং লাথি দিয়ে ও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে পরখ করে কেউ বেঁচে আছে কি না। একজন সৈন্য হাসিনা হাফিজের চুল ধরেও টানে। তখনও হাসিনার প্রাণ ছিল কিন্তু নীরবে মৃতের ভান করে পড়েছিলেন এবং ব্যথা সহ্য করছিলেন।

এরপরে যা ঘটল তা ছিল আরও হৃদয়বিদারক। হাসিনার ছোটো ভাই চিৎকার করে কান্না করছিল। সেনারা সেই শিশুটির পা ধরে জোরে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারে এবং শিশুটি মারা যান। হাসিনার আরেক ভাই; যে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, সে তৃষ্ণায় পানি চাইলে হাসিনা তাঁকে পানি পান করানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে মারা যায়। হাসিনার বাবারও প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল আর হাসিনা বালিশ থেকে কাপড় বের করে সেগুলো দিয়ে চেপে ধরে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। এভাবে সে ২৫শে মার্চের পুরো রাত কাটায় (Ahmed, 2009)।

সেদিন রাতের অভিজ্ঞতা জানা যায় নেওয়াজ আলীর ছোটো মেয়ে রওশনা আরার বর্ণনা থেকেও। তখন তিনি ছিলেন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী। ২৫শে মার্চ রাত বারোটায় পাকিস্তানি বাহিনী যখন স্টাফ কোয়ার্টারে আক্রমণ করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি চালায়, তখন চারদিকের গুলির শব্দ ও চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তাঁর বাবা-মা, দুই ভাই, বড়ো বোনকে তাঁর সামনেই গুলি করা হয় এবং তিনি নিজেও গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। রওশন আরা শুধু মনে করতে পারছেন বাসার চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল এবং এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সে রাতে আর কী হয়েছিল তিনি জানেন না (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

সময় অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু পঁচিশে মার্চ রাতের ভয়াবহতা আজও ভুলতে পারেনি রোকেয়া হলের মালী আব্দুল খালেকের স্ত্রী ফুলবানু। পাকবাহিনী ফুলবানুদের বারান্দার বেড়া বা বেষ্টনী টেনে ফেলে দিয়ে তাঁদের ঘরের দিকে

এগোতে থাকলে তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ফুলবানুর স্বামী আব্দুল খালেক তাঁদের ঘরের পেছন দিকের জানালা ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তাঁদের জীবন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তবু আব্দুল খালেক রড হাতে নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর এর মধ্যে হানাদার বাহিনী তাঁদের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে। ফুলবানু তাঁর বাচ্চাকে জোরে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন আর বাকি সবাই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর স্বামী তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায়ও শান্ত হতে বলছিলেন এবং কোরআনের আয়াত তিলওয়াত করছিলেন। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি তাঁর জ্ঞান হারালেন এবং সারারাত অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন (Ahmed, 2009) ।

রোকেয়া হলের মালী শহিদ চুন্নু মিয়া তাঁর সন্তান মো. শাহজালালকে নিয়ে হলের ভেতরে কর্মচারী কোয়ার্টারে থাকতেন। মো. শাহজালাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর থেকেই ক্যাম্পাসে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। রোকেয়া হলের অন্যান্য কর্মচারীদের মতো চুন্নু মিয়াও অস্ত্রের ট্রেনিং নিতেন। ২৫শে মার্চ সারাদিন ক্যাম্পাস বেশ থমথমে অবস্থায় ছিল। এদিকে মানসিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতিও সবাই নিচ্ছিলেন। আনুমানিক রাত একটা বা দেড়টার দিকে হানাদাররা রোকেয়া হলেও পৌঁছে যায়। তারা প্রথমে হলের বাউন্ডারি ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং কর্মচারীদের কোয়ার্টারের দিকে নিশানা তাক করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। এতে কোয়ার্টারের প্রায় ১৪টি বাসভবনের দরজা ভেঙে পড়ে। এই গোলাগুলিতে মো. শাহজালালের পিতা চুন্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যান। মো. শাহজালাল তখন খাটের নিচে আসবাবপত্র বানানোর জন্য রাখা কাঠের আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে যান। হানাদাররা চলে যাওয়ার পরে আহতাবস্থায় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের আর্তনাদে পরিবেশ-পরিস্থিতি ভারী হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা ঘরেই মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। মো. শাহজালাল স্মৃতিচারণ করে বলেছিল,"আমার মনে আছে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফেও লাথি মেরে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল।" সেই রাতে চুন্নু মিয়ার আরেকজন বন্ধুও তাঁর সাথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন (বিস্তরিতের জন্য পড়ুন: মো. শাহজালাল রচিত, 'সেই দুঃস্বপ্নের রাত আজও আতঙ্কিত করে' যাত্রিক: বিশেষ সংখ্যা: ২৫শে মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২৫, ২০২৩, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অল্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, পৃষ্ঠা- ৪৬)।

রোকেয়া হলের নৈশপ্রহরী হাবুল মিয়া ছিলেন শহিদ চুন্নু মিয়ার সহকর্মী ও ভাতিজা। ১৯৭১ সালে ২৮ বছর বয়সী রোকেয়া হলের নাইট গার্ড হাবুল মিয়ার নৈশপ্রহরার সময়েই ২৫শে মার্চ রাতের অতর্কিত আক্রমণটি হয়েছিল। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারছিলেন যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। তবে ঐদিনই আক্রমণ হবে তা জানতেন না। তিনি ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনেন এবং পরবর্তীতে হলের অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে তিনিও ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তাঁদের তখন ট্রেনিং দিতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ক্যাফেটেরিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাকের কমান্ডার। ২৫শে মার্চ রাত দশটার দিকে তিনি ডিউটি শুরু করেন। রাত বারোটায় আক্রমণ করে পাকবাহিনী তাদের গাড়ি দিয়ে গেট ভেঙে রোকেয়া হলের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। হলে পাকবাহিনীর তৎপরতা শুরু হওয়ায় তিনি এক ফাঁকে গিয়ে প্রভোস্ট আখতার ইমামকে ডেকে তুলেন। এরমধ্যেই পাকসেনাদের কয়েকজন প্রভোস্ট বাংলোর দিকে যাচ্ছিল। সেনারা তখন সেখানে হাবুল মিয়াসহ উপস্থিত অন্যান্য কর্মচারীদের বলে "লাইনে দাঁড়াও, লাইনে দাঁড়াও।" এসময় আখতার ইমাম ভেতর থেকে বের হয়ে এলে তাঁর সাথে সেনাবাহিনীর কথোপকথন এবং তর্ক হচ্ছিল। আর একজন সেনা তাঁদেরকে (কর্মচারীদের) প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাত্রীরা কোথায় তা জিজ্ঞেস করেছিল। এদিকে ঐ রাতে রোকেয়া হলে তখন সাতজন ছাত্রী ছিল। যখনই নৈশপ্রহরীরা ইকবাল হলে আক্রমণের খবর পান, তখনই ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষিকার স্টোর-রুমে লাইট বন্ধ করে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রেখে যান, যাতে কেউ বাইরে থেকে বুঝতে না পারে। পাকসেনাদের প্রশ্নের প্রতিউত্তরে হলের কর্মচারীরা যখন বলে ছাত্রীরা বাসায়, তখন তারা তা বিশ্বাস করছিল না। পাকসেনারা তাঁদের দিকে বন্দুক নিশানা করে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে বলতে থাকে যে, "তোমরা সবাই জয়বাংলার লোক।" আখতার ইমাম তখন বলেন, "ওদের গুলি করো না। ওরা জয় বাংলার লোক না, মুসলিম লীগের সমর্থক।" এ কথার পর ওরা কিছুটা শান্ত হলে হাবুল মিয়াসহ অন্যান্য কর্মচারীরা এবং হলের আবাসিক ছাত্রীরা সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল। প্রভোস্ট বাংলো থেকে আর্মির দলটি যখন চলে গেল, তখন প্রভোস্ট তাঁদেরকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে বললেন। তখন তাঁরা আবাসিক শিক্ষিকাদের ভবনের খোপগুলোতে সারারাত অতিবাহিত করে এবং সেখানের পাঁচতলা থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন কীভাবে জগন্নাথ হলে সব লাশ স্তূপ করা হচ্ছে এবং যাঁদের দিয়ে স্তূপ করানো হচ্ছিল তাঁদেরই আবার সারিবদ্ধ করে গুলি করে মেরে ফেলছিল। সেখান থেকে কান্না ও বিলাপের আওয়াজ আসছিল কিন্তু তখন তাঁদের করার কিছু ছিল না।

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এভাবেই খোপগুলোতে সারারাত অতিবাহিত করেছিলেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে পাকবাহিনী কর্তৃক রোকেয়া হলে ঘটে যাওয়া আক্রমণের আরও বিবরণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী গিয়াস উদ্দিন দেওয়ানের কাছে। তিনি সে সময় রোকেয়া হলে চাকরি করতেন লিফটম্যান হিসেবে। সে রাতে তিনি হলের কর্মচারীদের কোয়ার্টারেই ছিলেন। ২৫শে মার্চ ডিউটিরত অবস্থায় জানতে পারেন যে, সেনা সদস্যরা আক্রমণ করতে পারে এবং ছাত্ররা এজন্য রাস্তা বন্ধ করছে গাছপালা কেটে। রাতে নয়টার দিকে এ ঘটনা প্রভোস্টকে জানালে তিনি অভয় দিয়ে হলেই অবস্থান নিতে বলেন। এদিকে জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করার পর সেনারা রোকেয়া হলে প্রবেশ করে এবং সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। পাকসেনারা কোয়ার্টারে ঢুকে তাদের ট্রাকের মাধ্যমে দেওয়াল ভাঙে। সেখানে ১৪টি বাসা ছিল, গিয়াসউদ্দিন দেওয়ানের বাসা প্রথমেই ছিল। সেখানে তাঁর সাথে আরো দুজন থাকতো। পাকসেনারা দরজাগুলো ভাঙে এবং অনবরত গুলি চালাতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যায় এবং চারপাশ মানুষের চিৎকারে ভরিয়ে তুলে নারী ও শিশুসহ অনেককে হত্যা করে। সাত মার্চের ভাষণ শোনার পর অন্যান্যদের সাথে জগন্নাথ হলে তিনি (গিয়াস উদ্দিন দেওয়ান) ট্রেনিং নিয়েছিলেন, তাই আত্মরক্ষার কিছু কৌশল তাঁর জানা ছিল। পাকসেনারা বাসার ভেতর ঢুকেই বলে “হোল্ড” এবং স্টেন গান তাক করেছিল। তিনি তখন আত্মরক্ষার জন্য এক পাশে মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাঁর কক্ষে থাকতো মুনিরউদ্দিনের পুত্র মোহসীন , খাটের নিচে তিনি লুকিয়ে যান। মোসলেমউদ্দিন নামে অন্য যে ব্যক্তিটি ছিল কক্ষে, তাঁর গুলি লেগে পেট থেকে নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে যায়। পাকসেনারা অন্ধকারে তাঁকে (গিয়াস উদ্দিন দেওয়ান) না দেখতে পেয়ে পাশের কক্ষে যেতেই গিয়াসউদ্দিন ঘরের মধ্যে রাখা খালি ড্রামে লুকিয়ে পড়েন আর ড্রামের মুখে কাঁথা দিয়ে রাখেন যাতে কেউ ভেতরে আছে কি না বুঝা না যায়। পাকসেনারা কিছুক্ষণ পর আবার এসে ড্রামটাকে গাড়িতে করে নিতে চাইলেও অন্য এক সেনার কথায় পরে আর নেয়নি। তবে কক্ষ থেকে যাওয়ার পর থ্রিব্যান্ড রেডিওটি নিয়ে গিয়েছিল। এভাবে তিনি ড্রামেই বাকি রাতটি অতিবাহিত করেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০)

অন্যদিকে মহসিনের পরিবারের উপর ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। রোকেয়া হলের প্রধান নিরাপত্তাকর্মী মনিরুদ্দিনের ১৪ বছর বয়সী ছেলে মোহসীন চাচার বাসায় ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরের দরজায় আঘাতের শব্দে জেগে ওঠেন। তাঁর চোখের সামনে একজনকে মিলিটারি গুলি করে মারে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সেখানে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিলিটারি চলে গেলে তিনি আহত লোকটিকে পানি পান করিয়ে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়েন। বাইরে গোলমালের শব্দে তিনি অত্যন্ত ভীত ছিলেন এবং তাঁর পরিবারের জন্য চিন্তিত ছিলেন। ভোরের দিকে তিনি দৌড়ে বাড়ি যান। গিয়ে দেখেন তাঁর মা, বোন, ভাবি, ছোটোভাই সকলেই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মেঝেতে তাঁর মা ও বড়ো বোনের লাশ রক্তে ভেজা অবস্থায় পড়ে ছিল; তাঁদের পাশে তাঁর ছোটো ভাই, তাঁর (ছোটো ভাই) কোমরে গুলি লেগেছে, তিনি "পানি! পানি!" বলে কাঁদছিলেন। মোহসীন তাঁর ভাবিকে কম্বল আবৃত অবস্থায় খাটে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং দেখে মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর (ভাবির) ঘাড়ে গুলি লেগেছে। মহসিনের আহত ছোটো ভাই অনবরত পানি চাইছিলেন। মোহসীন কোনো পানি না পেয়ে দৌড়ে বাইরে থেকে পানি ভর্তি একটি কলস নিয়ে আসে। তাঁর ভাই পানি খেয়ে একটু শান্ত হলেন। তাঁর আরও দুই ছোটো ভাইয়ের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক; গোড়ালিতে গুলিবিদ্ধ হন ৯ বছর বয়সী মহিউদ্দিন আর অন্য একজন শামীম, তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। মহসিনের বড়ো বোনের বয়স ছিল ৪০ বছর এবং তাঁর ছোটো ছেলে তার লাশের পাশে অবিরাম কাঁদছিল। সেই রাতে বেঁচে ছিলেন শুধু তাঁর একজন ছেটো ভাই এবং বোনের দুই বছরের শিশু। তিনি এই শিশুদেরকে নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় সময় পার করেন (Ahmed, 2009) ।

রোকেয়া হলের এমন পরিস্থিতির আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় মো. মোশারফের বক্তব্যে যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ওই সময়ের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল খালেকের (দারোয়ান) কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা সম্পর্কে জেনে তাঁর বাবার জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। পাকবাহিনী যখন রোকেয়া হলে আক্রমণ করেন, তখন আব্দুল খালেকের সাথে মোশারফের বাবাও একটি রুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আব্দুল খালেক কোনোভাবে সেখান থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও ওই রুমের উপর তীব্র গোলাবর্ষণ হওয়ায় সেখানে কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে তিনি জানান। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, রোকেয়া হলের নিরাপত্তাকর্মী

নমী রায়ের সাথে পাকিস্তানি আর্মির কথোপকথনের সময় তিনি বলেছিলেন “হাম হিন্দু হায়।” এর প্রতিউত্তরে আর্মিরা নমী রায়কে মর্টারশেল দিয়ে হত্যা করে। হলের প্রভোস্ট-রুমে প্রবেশ করে ২০ থেকে ২৫ জনকে সারিবদ্ধ করে গুলি করা হয়, যারা মূলত ছিলেন হলের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্য। এখান থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা তৎকালীন প্রভোস্ট আখতার ইমামের বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন (Ahmed, 2009) ।

২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে শহিদ হন স্যার এ এফ রহমান হলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হাজী মো. মিন্নত আলীর বাবা মো. হাফিজ উদ্দিন। শহিদ হাফিজ উদ্দিন ১৯৬৯ সালে রোকেয়া হলের মালী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ঐ রাতে তিনি রোকেয়া হল স্টাফ-কোয়ার্টারে ছিলেন। এর প্রায় ৫দিন আগে তিনি ভৈরবে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে কর্মস্থলে ফিরে এসেছিলেন। তিনি ঢাকায় আসার আগে তাঁর পরিবার যদিও তাঁকে বাঁধা দিচ্ছিলেন, তবু তিনি ঢাকায় চলে এসেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁদের ওপর কোনো আক্রমণ হবে না। কিন্তু রোকেয়া হলে সেই রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণে তিনিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। হাফিজ উদ্দিনের পরিবার তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন এক সপ্তাহ পরে (ফোনালাপ: জামিলা খাতুন ও মিন্নত আলী, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ আন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, তারিখ: ৬/১১/২০২৩)

ভিন্ন চিত্র দেখা যায় তনু মিয়ার কেস স্টাডি করলে। ২৫শে মার্চ রাতে রোকেয়া হলের কর্মচারীদের মধ্যে সপরিবারে জীবনরক্ষা করতে পারা একজন ব্যক্তি হলেন তনু মিয়া। রোকেয়া হলের অন্যান্য কর্মচারীদের মতো তিনিও অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলন। ২৫শে মার্চ রাত বারোটার দিকে আকস্মিক শব্দে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ঘুম ভাঙে। এসময় চারদিক থেকে গোলাগুলি ও চিৎকারের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এত শব্দের কারণ জানতে তিনি দরজা খুলতেই দেখলেন, পাকিস্তান সমরবাহিনীর সদস্যরা রোকেয়া হলের দেওয়াল ভেঙে হলে প্রবেশ করছে। প্রবেশ-মুহূর্তে তারা তনু মিয়াকে লক্ষ্য করে ঘরের দরজা বন্ধ করে করে দেওয়ার ইশারা প্রদান করে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকবাহিনী তনু মিয়ার ঘরের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর দরজা খুলতে বিলম্ব হওয়ায় সৈন্যরা ঐ ঘর ছেড়ে অন্য কর্মচারীদের ঘরের দিকে চলে গিয়েছিল। এই সুযোগে

তিনি জানালার শিক ভেঙে তাঁর স্ত্রী ও পনেরো দিন বয়সী শিশু সন্তানসহ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। বর্তমানে শামসুন্নাহার হল যেখানে অবস্থিত, সেখানের একটি কড়ই গাছের নিচে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছু সময় বাদে তাঁরা আবার রোকেয়া হলের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন তৎকালীন অনার্স ভবনের গেটটি কোনো কারণে খোলা থাকার ফলে। সেই সময়ে সেলাইঘর হিসেবে ব্যবহৃত ছোট্ট রুমটিতে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তনু মিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে বাঁচানোর জন্য সেই রুমের উভয় দিক থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যেন বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে ভেতরে কেউ আছে। এরপর তিনি বাহিরে থেকে তাঁদেরকে পাহারা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি লাইটের আলো দেখে অনুমানে বুঝতে পারছিলেন যে, পাকবাহিনী হলের মেইন গেট দিয়ে আক্রমণ করতে আসেনি, এসেছে প্রভোস্ট বাংলোর গেট দিয়ে (সুলতানা ও কামাল, ২০২২)।

রেহাই মেলেনি যুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)-তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা শহিদ আবদুস সামাদের। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে গোছের ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাগমের অন্যতম কেন্দ্র টিএসসির মতো জায়গায় দায়িত্ব পালনে কখনই অবহেলা করেননি আবদুস সামাদ। টিএসসির স্টাফ কোয়ার্টারেই বাস করতেন তিনি। কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা মানিকগঞ্জে শিবালয়ের শিমুলিয়া ইউনিয়নের পাচুরিয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে বসবাসরত ছিল। আবদুস সামাদ মাসে দু'একবার তাঁর গ্রামের বাড়িতে যেতেন পরিবারের সাথে থাকার উদ্দেশ্যে। স্বাভাবিকভাবেই চলছিল তাদের দৈনন্দিন সবকিছু। এই স্বাভাবিকতায় বাঁধ সাধে ২৫শে মার্চের কালরাত্রির গণহত্যা। আবদুস সামাদ টিএসসি-চত্বরে দায়িত্বরত অবস্থায় পাক-ফৌজের আক্রমণের সময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এসময় তাঁর পুত্র মো. আবু জাফর ছিলেন খুব ছোটো। সামাদের পরিবার গ্রামে অবস্থান করায় তাঁর মৃত্যুর খবর জেনেছিল অন্যদের কাছ থেকে (ফোনালাপ: মো. জাফর, স্থান- সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, তারিখ: ৩১/১০/২০২৩)

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পুরোটা সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থানকারী তৎকালীন কলাভবনের কমনরুমের এটেন্ডেন্ট আমির হোসেন ২৫শে মার্চে রাতের স্মৃতি অবতারণা করে বলেন যে, পাকবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা তাঁদের মনেও দানা বেঁধেছিল। অন্যান্যরা যখন গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করছিল, তাঁরাও তখন

তাদের বাসস্থান আজিমপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার-এর গেট বাউন্ডারির সমান করে ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয় যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। এরপর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি দেখার জন্য তিনি তাঁর বন্ধু সুভাষচন্দ্রকে (যিনি তখন ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে চাকরি করতেন) নিয়ে পলাশী পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু কখন কোন দিক দিয়ে হানাদার বাহিনী চলে আসে এই ভয়ে আমির হোসেন ও তাঁর বন্ধু সেখান থেকেই বাসায় ফিরে গিয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ১২টার দিকে চারপাশের হট্টগোল ও প্রচণ্ড শব্দে আমির হোসেনের মনে হচ্ছিল যেন তাঁদের ভবন কাঁপতে শুরু করেছে। আমির হোসেন তাঁর মা ও বোনকে নিয়ে সিঁড়িঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সারারাত তাঁরা সেখানে ঐ অবস্থায়ই কাটিয়েছিলেন (সাক্ষাৎকার: আমির হোসেন, স্থান: কলাভবন কমনরুম এ্যাটেন্ডেন্ট, তারিখ- ০৮/১১/২০২৩)

২৫শে মার্চ রাতের স্মৃতিচারণ করে ক্যাম্পাসের তৎকালীন পরিস্থিতির কথা জানাচ্ছিলেন মনির হোসেন বাচ্চু। তিনি তখন কাজ করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে। যুদ্ধের সময় তিনি একজন তরুণ। তখন পর্যন্ত মনির হোসেন বাচ্চু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত কর্মচারী হননি। অন্যান্য দিনের মতো ২৫শে মার্চ রাতেও কাজ শেষে মধুদাকে তাঁর বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন মনির হোসেন বাচ্চু। যাওয়ার পথে তিনি খেয়াল করেছিলেন যে, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কাছে বহু পাকিস্তানি সৈন্য টহল দিচ্ছে। মধুদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তিনি তাঁদের ক্যান্টিনে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁরা প্রায় ১০/১৫ জন লোক একসাথে থাকতেন। রাত প্রায় বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাক-ফৌজ আক্রমণ চালালে লোকজন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দিগ্‌বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে দিয়েছিল। এসময় মনির হোসেন ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে প্রথমে নিপা বিল্ডিং-এ এবং পরে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে যেহেতু সকলে বিদেশি, তাই সেখানে আক্রমণ হবে না। আরো বহু লোক এসে সেখানে আশ্রয় নেওয়ায় তিনি কোনোরকমে বাথরুমের সামনে দাঁড়ানোর মতো একটু জায়গা পেয়েছিলেন। সারাটি রাত তাঁকে এই অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছিল (সাক্ষাৎকার: মনির হোসেন বাচ্চু, স্থান- সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ আন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, তারিখ-১২/১১/২০২৩)

২. ৩. 'অপারেশন সার্চলাইট' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা; একটি পর্যালোচনা

২.১.১. ও ২.১.২. অংশে উপস্থাপিত 'অপারেশন সার্চলাইট' আরম্ভের পূর্বে ও পরে মার্চ ১৯৭১ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্রগুলো থেকে কয়েকটি পর্যালোচনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

২.৩.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, মার্চ ১৯৭১: অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে – পর্যালোচনা

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজ করছিল। সেইসাথে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের অবনতির বিষয়টি আঁচ করা যাচ্ছিল।

খ. মার্চ মাসের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। ট্রেনিংয়ের কাজে কর্মচারীরা সহযোগিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে আন্দোলনে গতি এনেছিল। ছাত্রদের সাথে গাছ কেটে বেরিকেড তৈরিতে কর্মচারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

গ. ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর সকাল থেকে নানা ধরনের গুঞ্জন চলছিল। এই সময় উপাচার্যের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল কি না দেখতে গিয়ে একজন কর্মচারী সেখানে বাংলাদেশের পতাকা দেখতে পাননি।

ঘ. শীঘ্রই আক্রমণের কথা শোনা যাচ্ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অনেকটা খালি হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন কর্মচারী গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ছুটি না পাওয়ায় যাননি। আবার কর্মচারীদের উপর আক্রমণ হবে না এই বিশ্বাসে অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলেন।

ঙ. ২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাতে অন্যান্য রাতের মতো গীতাপাঠের আয়োজন ছিল এবং কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের কয়েকজন তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

চ. আক্রমণের পূর্বেও নানা ধরনের খবর (ধর্মঘট হতে পারে, তিন দিন পানি থাকবে না ইত্যাদি) ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া ইয়াহিয়া খান ১১ দফা মেনে

নেওয়ার গুজব শুনে আনন্দে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ঘটনার কথা বক্তব্যে এসেছে।

২.৩.২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, মার্চ ১৯৭১: অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর– পর্যালোচনা

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। জীবিত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পিতা, মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু ও অন্যান্য পরিজনদের এই রাতে হারানোর মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি বহন করছেন।

খ. কয়েকটি জায়গায়-অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

গ. আক্রমণের খানিক পূর্বে কর্মচারীদের কিছু হবে না ('কত যুদ্ধ গেল... আমাদের কিছু হলো না') এমন বিশ্বাসও কোনো কর্মচারী ধারণ করেছেন।

ঘ. রোকেয়া হলে ট্রেনিং গ্রহণকারী ছাত্রীদের পাকিস্তানি সেনারা খোঁজ করেছিল। প্রভোস্ট ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় লুকিয়ে থেকে রোকেয়া হলে অবস্থানকারী সাতজন জীবন রক্ষা পান।

ঙ. একই বাড়িতে কাবা শরিফ, জিন্নাহ, বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানোর উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখে পাকিস্তানি সেনারা ক্ষেপে গেলে কাবা শরিফ, জিন্নাহ এসব ছবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'নিজেরা মুসলমান' এমন পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তবে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের (পরিবারের সদস্যদের) উপরও গুলিবর্ষণ করে।

চ. মৃতের ভান করে থেকে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৃতের ভান করে থাকার সময় পাকিস্তানি আর্মির বেয়নেটের খোঁচা, চুল ধরে টানা সহ্য করতে হয়েছে।

ছ. নারীদের বিবস্ত্র করার কথাও কোনো কোনো বক্তব্যে এসেছে।

জ. আক্রান্ত অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস পালন (সুরা, আয়াত পাঠ, স্বরস্বতী মূর্তির পিছনে লুকানো) এমন ঘটনা ঘটেছে।

ঝ. 'মুসলিম লীগ সমর্থক' এমন কথা বলার কারণে পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় রাত। ঐ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনের সকল স্বাভাবিকতা চিরতরে নসাৎ হয়ে যায়। এই আক্রমণের চিত্র ছিল অত্যন্ত করুণ এবং ভয়াবহ। এই একরাতে অনেকেই হারায় তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়জনদের আবার কেউ তাঁদের চোখের সামনে তাঁদের সবচেয়ে আপনজনকে মরে যেতে দেখছে। কখনও সেই প্রিয়জনেরই মৃতদেহকে ফেলে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। ভয়ংকর সেই রাতের কিছু কথা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হলো।

তৃতীয় অধ্যায়

২৬শে মার্চ সকাল, ১৯৭১
তবু ভোর হয়

২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ভোর হলেও অপারেশন সার্চলাইট-এর ভয়াবহতা তখনও চলমান ছিল। কেউ স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর, কেউ অনুভূতিশূন্য। কেউ বাঁচার আকুতি জানাচ্ছেন। কেউ মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। কেউ করছিলেন প্রিয়জনের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। কেউ ছুটাছুটি করছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। যেহেতু ২৬শে মার্চ কারফিউ জারি ছিল, তাই আহতদের শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালেও নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না এবং আত্মীয়-স্বজন কে কেমন অবস্থায় আছে খোঁজ নেওয়াও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। অনেকে নিজে আহত হয়েও কিংবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও গুটিকয়েকের ক্ষেত্রে এর ভিন্নতাও দেখা যায়। এভাবে ২৬শে মার্চ দিনটি অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, জীবনের অনিশ্চয়তা, স্বজন হারানোর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। কর্মচারীদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ২৫শে মার্চের ভয়াবহ রাতের পরবর্তী কয়েকটি দিনের একটি চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলো।

৩.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, ২৬শে মার্চ ১৯৭১, সকাল ও তার পরবর্তী কয়েকদিন – কিছু খণ্ডচিত্র

আবদুস সোবহান (বর্তমান জহুরুল হক হলের কর্মকর্তা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত) তৎকালীন ইকবাল হলের কম্পাউন্ড থেকে সকাল দশটার দিকে সৈনিকদের তৎপরতা ও উপস্থিতি না দেখতে পেয়ে হলে ফিরে আসেন। হলে ফিরেই তাঁর সাথে দেখা হয় হল-তত্ত্বাবধায়ক শামসুদ্দিনের ছেলে সাত্তরের। সাত্তার জানালেন যে, তাঁর বাবার আদেশ অনুযায়ী সে তাঁর বাবাকে অফিসে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রেখে এসেছে। আবদুস সোবহান সাত্তারকে নিয়ে শামসুদ্দিনের খোঁজ করতে এগোলেই দেখলেন যে, সেনাবাহিনী হলগেটে অবস্থান করছে এবং মৃতদেহগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি এতই হতচকিত হয়ে যান যে, তিনি দিশেহারা হয়ে ছুটতে গিয়ে

ক্যান্টিনের সিলিং-এর রডে লেগে মাথা ফাটিয়ে ফেলেন। তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে একজন মহিলা তখন তাঁর মাথা বেঁধে দেন। দুইজন পুরুষ তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যায় পাশের একটি ভবনে, যেখানে আরও বহু লোক আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে আশ্রয় নেওয়া একজন নার্স তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে বেঁধে দেন। রক্তে ভেজা শার্ট নিয়েই ২৬শে মার্চ কাটিয়েছিলেন সোবহান। ২৭শে মার্চ কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলে সাত্তারকে নিয়ে শামসুদ্দিনের খোঁজে তখন হল অফিসের দিকে গিয়ে দেখতে পেলেন শামসুদ্দিনের মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তাঁর মৃতদেহ টেলিফোনের তার দিয়ে প্যাঁচানো ছিল। তাঁর পা মচকানো ছিল। সোবহান ও সাত্তার মিলে পা সোজা করার চেষ্টা করলে তখন তাঁর শরীর থেকে পোড়া গন্ধ পায়। তাঁরা হাউজ টিউটর অফিসে জনাব জালাল ও জনাব মমিনকে জানালে তিনি শামসুদ্দিনের দাফনের জন্য তাঁদেরকে ৫০ টাকা দিয়েছিলেন। সোবহান হোম ইকেনোমিক্স কলেজে অবস্থানকালে জানতে পেরেছিলেন যে, চিশতি হেলাল নামের এক শিক্ষার্থী ও ডাইনিং-এর কর্মচারী জলিল একইসময়ে পাকসেনার দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়। বুলেট তাঁদের পেট এফোড়-ওফোড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। সোবহান সেই জখমস্থানে কাপড় চেপে ধরে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু ২৬শে মার্চ কারফিউ জারি ছিল, তাই তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ২৭শে মার্চ যখন আবদুস সোবহান হলে ফিরে আসেন, তখন মৃতদেহগুলো দেখতে পাননি সেখানে। হাউজ-টিউটরের দেওয়া ৫০ টাকা পেয়েও সোবহান দাফনের জন্য সাদা কাপড় যোগাড় করতে পারেননি। এই কথা জনাব মমিনকে জানালে তিনি তাঁর বাসার জানালার সাদা পর্দা খুলে দেন শামসুদ্দিনের মৃতদেহ ঢাকার জন্য। দশ টাকা দিয়ে দু'জন লোককে ভাড়া করেন মৃতদেহ বহন এবং দাফনের জন্য। শামসুদ্দিনের জন্য কবর খোঁড়ার মুহূর্তে গুলিবিদ্ধ হওয়া জলিল নামক লোকটিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সময় স্বল্পতার কারণে তাঁর জন্য আলাদা কবর খোঁড়া সম্ভব হয়নি। এজন্য দুজনকে একই কবরে রাখা হলো। শামসুদ্দিনের মচকানো পা কোনোভাবেই সোজা না হওয়ায় কবর দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাঁরা বাঁশ দিয়ে চেপে প্রথমে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কোনো উপায় না পেয়ে মচকানো পাটা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়। এরকম বেদনাদায়ক স্মৃতি মনে করে আবদুস সুবহান আজও কেঁদে ফেলেন। যুদ্ধ অনেকের মনে গভীর ক্ষত রেখে গিয়েছে (Ahmed, 2009)।

আবদুস সোবহান কর্তৃক বর্ণিত এই ঘটনার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী শহিদ শামসুদ্দিনের ছেলে আবদুস সাত্তারের ভাষ্যে উঠে আসে যে, পাকবাহিনী মার্চের ২৫ তারিখ রাতে বর্তমান জহুরুল হক হলে ব্রাশফায়ার করলে হলের সর্বত্র আগুন লেগে যায়। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু পরদিনও পাকবাহিনীর তৎপরতা জারি থাকায় সেদিনও তাঁরা কারো কোনো খোঁজ নিতে পারেনি। এর পরের দিন, অর্থাৎ ২৭শে মার্চ তাঁর বাবার লাশ সনাক্ত করেন এবং হলের আবাসিক শিক্ষক কামরুল হাসান চৌধুরীর বাসা থেকে সাদা পর্দার কাপড় এনে তাঁর বাবা এবং স্টুয়ার্ট শাখার জামিলের দাফন সম্পন্ন করেন (চৌধুরী, ২০২০)।

অন্যদিকে, তৎকালীন কুমিল্লার মতলবে বসবাসরত জমিলা খাতুন (শহিদ শামসুদ্দিনের স্ত্রী) স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পান পাকবাহিনীর আক্রমণের একদিন পর। জমিলা খাতুনের এক জ্যেঠাতো ভাই ঢাকা থেকে গ্রামে গিয়ে বলেছিলেন, "তামা কইরা লাইছে ইকবাল হল।" এই খবরে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন জমিলা খাতুন। ২৭শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়া হলে তাঁর ছেলে আবদুস সাত্তার ও এক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে ২৮ তারিখে মতলবে তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছান এবং তাঁদের বাবার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেন (জমিলা খাতুন, বয়স-৯৮, শহিদ মো. শামসুদ্দিনের স্ত্রী, যোগাযোগ-স্থান: শিববাড়ি আবাসিক এলাকা, সময়: সন্ধ্যা ৬টা, তারিখ: ০১/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত)।

বড়ো ভাই ও বোনের কাছ থেকে বাবার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সেই ঘটনা মনে করে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন শহিদ শামসুদ্দিনের তৃতীয় ছেলে মো. সাজাহান। মো. সাজাহান তাঁর বড়ো ভাই আবদুস সাত্তারের কাছে শুনেছিলেন কীভাবে আবদুস সাত্তার ভয়ে-ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন বাবাকে খোঁজার জন্য এবং বাবার মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে কোনোরকমে দাফন সম্পন্ন করেছিলেন সেই কিশোর। তাঁর বাবার সাথে একই কবরে আরো একজনকে দাফন করে রেখে নিজেদের প্রাণ বাচাঁনোর জন্য বাড়ি চলে গিয়েছিলেন সাজাহানের ভাই আবদুস সাত্তার (মো. সাজাহান, বয়স-৫৫, শহিদ মো. শামসুদ্দিনের ছেলে, যোগাযোগ-স্থান: শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময়: দুপুর ৩ টা, তারিখ: ০২/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

অন্যদিকে জগন্নাথ হলে অবস্থান করা কর্মচারীদের পরিবারগুলো ভিন্ন আরেক ধরনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ২৬শে মার্চের দিনটি অতিবাহিত করেছিল। সকালবেলা মোহন রায় ও তাঁর শ্যালক শঙ্কর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় যখন ঘরের বাইরে আসে, তখনও বারান্দায় দুজন মিলিটারি দাঁড়িয়ে টহল দিচ্ছিল। তাঁদের চোখের সামনেই মোহন রায়ের কন্যাকে মিলিটারি টেনে-হিঁচড়ে বের করে। তাঁদেরকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে বলা হচ্ছিল। তাঁরা মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। যখন তাঁদেরকে গুলি করতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে একজন অফিসারের কথায় তাঁদের দেওয়ালের বাইরে রাস্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। মোহন রায় স্টাফ কোয়ার্টারে ৩০ থেকে ৩৫ জন ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন; যাঁর মধ্যে তাঁর শ্বশুর নমী রায় ও শাশুড়ি শান্তি রায়ের লাশও ছিল। এসব দৃশ্য দেখে তিনি যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন, তখন আর্মি অফিসার তাকে শুয়ে পড়তে আদেশ দেয়। এই ঘটনার পরেই মোহন রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন (Ahmed, 2009)।

২৬ তারিখ সকাল হতেই জগন্নাথ হল মাঠে অবস্থান করা বকুল রানী লোকমুখে শুনতে পান, তাঁর স্বামী জগন্নাথ হলের তৎকালীন দারোয়ান সুনীল চন্দ্র দাসকে মেরে ফেলেছে পাকবাহিনী। তাঁর সাথে যারা মাঠে অবস্থান করেছিল তাঁদেরকে দিয়েই লাশ টানানোর কাজ করিয়েছিল। সারি সারি লাশ এনে শুইয়ে রাখছিল তারা। এসব তিনি (বকুল রানী) মাঠে বসে প্রত্যক্ষ করছিলেন। সন্তানকে একা রেখে যেতেও পারেননি স্বামীকে শেষবার দেখতে। বকুল রানীর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, পাকবাহিনী লাশ টানার কাজে নিয়োজিতদেরকে 'জয় বাংলা' বলতে হুকুম করেছিল আর একটু পরপরই গোলাগুলি চলছিল। বকুল রানীর হিতাহিত জ্ঞান কোনো কাজ করছিল না তখন। এমতাবস্থায় দুপুরের দিকে কারফিউ ছেড়ে দিলে তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে তিনি রওনা দেন পাশের লোকজনদের সাথে। কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন কোনো ভাবনাই তখন কাজ করছিল না তাঁর। পাশের লোকজনকে অনুসরণ করে জগন্নাথ হল থেকে বেরিয়ে ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে অবস্থান করেন। যাবার পথে হলগেটে তিনি কয়েকজনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। রাস্তায় লোকজনকে ধারালো দা, চাকু নিয়ে ছুটাছুটি করতেও দেখেছিলেন। মেডিকেলে পৌঁছানোর পর তাঁর সন্তানেরা কান্নাকাটি করে বলছিল, "মা গো মা, আমারে খাওন দাও।" কিন্তু সন্তানদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য এক পয়সাও ছিল না বকুল রানীর হাতে। বাচ্চাদের এই কান্নাকাটি দেখে মেডিকেলের

চায়ের দোকানের ছেলেটি বকুল রানীকে বলেন, "এই যে আপা, একটা রুটি নেন, নিয়া আপনার বাচ্চাটারে খাওয়ান।" এই বলে তাঁর মেয়ের জন্য একটি রুটি ও ছেলের জন্য এক কাপ দুধ দিয়েছিল। এই খাবারটুকু খাইয়ে কিছুক্ষণের জন্য ছেলে-মেয়েদেরকে শান্ত করলেও রাতেরবেলা আবারও ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অসহায় বকুল রানী সন্তানদের এই কাকুতিতে নিজেও তখন কান্না শুরু করেন। তখন তাঁর সাথে থাকা লোকজন 'হরলিক্স' বানিয়ে দিয়েছিল তাঁর ছেলের জন্য আর মেয়েকে খাবার দিয়েছিল খাওয়ার জন্য। এভাবে ২৭শে মার্চ দুপুর একটা পর্যন্ত তিনি ঢাকা মেডিকেলেই ছিলেন। একটার পর লোকজন জিঞ্জিরা, সদরঘাট যে যেদিকে পারছিল চলে যাচ্ছিল। তিনি আবারও তাঁদেরকে অনুসরণ করেন। দুই সন্তানকে সাথে নিয়ে চলতে শুরু করেন তাঁদের পাশে পাশে। নদী পার হয়ে ওপারে যেতে বকুল রানীর নৌকা ভাড়াও তাঁর সাথে থাকা লোকজনেরাই পরিশোধ করে দেন। তখন নৌকার মাঝি বলে উঠে, "বইন, আপনার পয়সা লাগব না। আপনি এমনিই পার হইয়া যান।" এভাবেই এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন বকুল রানী (চৌধুরী, ২০২০)।

সারারাত গোবরের স্তূপে লুকিয়ে থেকে ২৬শে মার্চ সকালবেলায় মিস্ত্রি রাজভর সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁরা কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন; কারণ তাঁর পরিবারের সকলে উর্দু জানতেন। এছাড়াও তাঁরা শুনেছিল যে, পাকবাহিনী ঝাড়ুদার, ধোপা ও মুচিদের (ভাঙ্গি) মারতো না। তাই তাঁরা পাকবাহিনীর সামনে ঝাড়ুদার বা ভাঙ্গি হওয়ার ভান করতো। এই মিথ্যার কারণে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়তে হয়েছিল। মিলিটারির দল এসে রাজভরকে লাশ ঠিক করার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁকে বলা হয় যে, লাশগুলো ঠিক জায়গায় রাখলে তাঁকে মৃত্যু থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এরকম আরো কয়কজনকেও আনা হয়েছিল। তাঁরা সবাই মৃতদেহগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করে নিয়ে যেত এবং স্তূপাকারে রাখতো। লাশ ঠিক করা হয়ে গেলে তাঁদের সবাইকে সারিবদ্ধভাবে গুলি করা হয়। এ দৃশ্য রাজভরের মেয়ে উমা এবং আরো অন্যান্য মেয়েরা দূর থেকে দেখছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী চলে গেলে তাঁরা সবাই দৌড়ে সামনে যায়। গিয়ে দেখে উমার বাবার (রাজভর) কানে গুলি লেগেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যান। সবাই সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁদের এই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে একজন এসে জানালেন যে, অবিলম্বে তাঁদের এই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। সেখানে তাঁরা নিরাপদ নন। এমতাবস্থায় তাঁদের

স্বজনদের মৃতদেহ হলমাঠে রেখেই চলে যেতে হয়েছিল এবং কারফিউ থাকার কারণে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। উমার পরিবার এবং তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী জগন্নাথ হল থেকে বেরিয়ে হোসেনী দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন (Ahmed, 2009)।

ঐ রাতটি কীভাবে রাজকুমারী দেবীর কেটেছিল তিনি বলতে পারবেন না। ভোরে লাশ টানার সময় রাজকুমারী দেবীর সাথে তাঁর স্বামীর আবার দেখা হয়েছিল। কয়েকজন মিলিটারির সাথে চান্দু ও শ্যামলাল সকালে লাশ টানছিল। রাজকুমারী দেবী তাঁর স্বামীকে দেখার জন্য পায়খানা-ঘরের কাছে অপেক্ষা করছিলেন। লাশগুলো যখন বাইরে থেকে আনছিল, তখন তাঁকে সেই ঘরের পেছন দিক থেকে পকিস্তানি সেনারা হঠাৎ করে ধরে ফেলল। ধরার সাথে সাথে যাদেরকে আগে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁদের সাথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। তখনই তাঁর মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়েছিল। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, "এই তুম লোক চলো। হামকো ছোড় দেগা?" ওরা বলল, "হুম, কাম করেগা তো তুম লোককো হাম ছোড়ে গা।" তারপর তিনি দেখতে পেলেন যে, প্রিয়নাথের লাশ ব্যাংকের কাছে পড়ে আছে। প্রিয়নাথ ছিলেন এই হলের দারোয়ান। সেখানে অনেক লাশের স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো দেখতে পান যে, মধুদাকে যখন এখানে আগে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন মধুদা কিছু বলতে চেয়েছিলেন। তিনি (রাজকুমারী) তাঁর স্বামীর জন্য ভাবছিলেন যে, যদি তাঁর স্বামী ছাড়া পেত তাহলে তিনি মুক্তি পেতেন। হঠাৎ করে তিনি খেয়াল করেন যে, তাঁর স্বামী লাশ টানার কাজে নেই। তখন তিনি তাঁর স্বামীর ব্যাপারে চান্দুকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন চান্দু বললেন, "আছে হয়তো কোথাও। তুমি দেখছ না। কিন্তু সে তোমাকে ঠিকই দেখছে। লাশ টানছে।" রাজককুমারী দেবী এ সময় দেখলেন যে, শিববাড়ির থেকে দুজন ব্যক্তি এক সাধুকে নিয়ে এসেছে। মনীন্দ্র আর মাধব নামে দুজন ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। পাকবাহিনী লাশ টানার কাজের জন্য খগেন ও তাঁর ছেলেকে নিযুক্ত করলেন। আর্টস বিল্ডিংয়ের দর্শন বিভাগের পিয়ন ছিলেন খগেন। তাঁর মাথায় কোনো চুল ছিল না এবং সেই সময় তিনি সুস্থ ছিলেন। তিনি কোনো লাশ টানার কাজে সরাসরি নিয়োজিত ছিলেন না। তবে যাঁরা লাশ টানার কাজ করছিলেন, তাঁদের সাথে সাথে তিনি ছিলেন। তিনি দেখলেন, যাঁরা লাশ টানার কাজ করেছিল তাঁদেরও তিন লাইন করে দাঁড় করানো হয়। যাঁদেরকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তাঁরা হাতজোড় করে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি (খগেন)

লাশের কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। তাঁর থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ছিল বর্তমান জগন্নাথ হলমাঠ এবং জগন্নাথ হলের বিল্ডিং পর্যন্ত। তখন দক্ষিণ বাড়ির গেটের মধ্য দিয়ে পাকবাহিনী ঢুকছিল। তিনি আবার সৈন্য-ভর্তি গাড়িটার দিকে গেলেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তখনই তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন চান্দুর বড়ো বৌদি। মিলিটারি ত্রিকোণে দাঁড়িয়ে মানুষ মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন এসব দৃশ্য দেখতে পারতো না বলে রাজকুমারী দেবী আবার মেথরদের বাড়ির দিকে এসে পড়লেন। তিনি যখন মেথর-বাড়ির দিকে আসলেন, এর দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে বড়ো রকমের শব্দ হলো। ঠিক তখনও তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। সেখানে একজন লোক ছিলেন যাঁর নাম রাধে। তিনি হঠাৎ করে বলে উঠলেন, "আহা! বিন্দুকা বাপ, বাপকো সব খতম কর দেয়া" যখনই তিনি বলেন যে, সব খতম কর দেয়া; রাজককুমারী দেবী সাথে সাথে দৌড় দিয়ে মাঠের কাছে এসে দেখলেন পুতুলের মতো করে যে লাইনগুলো দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই লাইনের সমস্ত মানুষগুলো মাটিতে পড়ে আছে। এ লাইনের মধ্যে খগেন ছিলেন, যিনি গুলি খেয়ে একবার উঠেন আর একবার পড়েন। এভাবে উঠার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করছিলেন। মিলিটারি আবার পিছনে ফিরে তিন দিক দিয়ে গোলাগুলি শুরু করলেন। দ্বিতীয়বার গুলি করার সময় তিনি লাশগুলো থেকে মাত্র ২০ থেকে ২৫ হাত দূরত্ব থেকে দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন খগেনদা'র হাত তখনও নড়ছে। খগেনদা কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন। এদিকে আবার তাঁর স্বামীর কোনো খোঁজখবর নেই। তিনি ভাবলেন তাঁকেও নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে।

এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এগুলো তিনি বর্তমান জগন্নাথ হলের মাঠে যে শহিদ মিনার আছে তার ১২ থেকে ১৪ গজের মধ্যে থেকে সব দেখছিলেন। কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছিল না। মিলিটারি যখন গুলি করে চলে গেল, তখন সবাই লাশের দিকে ছুটে এসেছেন। এ সময় ইদু নামের একজন ব্যক্তি; তিনি বকশিবাজারে মোড়ের মসজিদের দিকে থাকতেন। তিনি এসে বলেন, "এই তোমরা কী করছ? এখনই সরে যাও, যদি বাঁচতে চাও।" তখন তিনি (রাজকুমারী দেবী) কোনো কিছু না চিন্তা করে লাশের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলেন। ঐখানে এক বুড়া কাকা তাঁর স্বামীর বিষয়ে বললেন, "চলো দেখে আসি ও বেঁচে আছে কি না।" ঐ বৃদ্ধ লোক যখন লাশের কাছে গেলেন, তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসছে আর দেখছে তাঁদের চেনা-জানা লোকগুলোর মধ্যে কেউ বেঁচে আছে কি না। ঐ লাশগুলোর মধ্যে রাজকুমারী দেবী তাঁর স্বামীকে পেলেন এবং তাঁর স্বামীর পা ধরে

টেনে বের করলেন। এরপর তিনি তাঁর স্বামীকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলেন। আবার পাশেই দেখেলেন চান্দুর বড়ো ভাই গোঙাচ্ছেন। চান্দুর বড়ো ভাইয়ের পেটের মধ্যে গুলি লেগেছিল এবং পেট থেকে তাঁর সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছিল। তাঁকে পানি খাওয়ানোর জন্য তাঁর বউ ছুটে আসছিলেন। ঐ মুহূর্তে তিনি তাঁর বউকে বারণ করেছিলেন "আসিস না, আসিস না। তোরা সব ফিরে যা।" এসব বলে চান্দুর বড়ো ভাই রোকেয়া হলের পাশে যে দেওয়াল ছিল তা টপকে বাইরে চলে গেলেন। চান্দুর ছোটো ভাই মুন্নিলাল, তিনিও উঠার জন্য বারবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু একবার উঠলেও আরেকবার পড়ে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। বর্তমান জগন্নাথ হলে ছাত্ররা যেখানে রিং ঝুলে, সেখানে লাশগুলো পড়েছিল। রাজকুমারী দেবী আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তাঁর স্বামীকে বাসায় আনার ব্যবস্থা করলেন। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর স্বামীর কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর স্বামী হয়তো দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু বাসায় নিয়ে এসে দেখেন যে, তার স্বামীর শরীরটা বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থা দেখে তিনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আবার অনেকে আশঙ্কা বলেছে, "এই লাশের জন্য যেন আবার এখানে আক্রমণ না করে।" তাঁর স্বামী তাঁকে বললেন, "আমার যেন কেমন লাগছে, আমি আর বাঁচব না, আমি মরে গেলাম।" এই কথা শোনার পরে তাঁর স্বামীকে রাজকুমারীর দেবী বলেন, "তোমাকে আমি মরতে দেবো না। মিলিটারি একটু সরে গেলেই তোমাকে আমি মেডিক্যালে নিয়ে যাব।" তখন মনভরণ রাজকুমারী দেবীকে বলেন, "দেখ, আমার পা দুটো নেই। আমার পিঠটা খুলে দেখ।" রাজকুমারী দেবী তাঁর শাশুড়িকে দেখতে বলেন। তাঁর শাশুড়ি দেখে বলেন, "এখান থেকে সমস্ত রক্ত ঝরে যাচ্ছে। সমস্ত রক্ত বের হয়ে যাবে।" মনভরণ তখন তাঁর বড়ো ভাইকে ডাকলেন এবং বললেন "আমার বাচ্চা-কাচ্চা সব রেখে গেলাম, তুই দেখিস।" এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তিনি যেন হলে না থাকেন। নারায়ণগঞ্জে তিনি তাঁর বোন-জামাইয়ের কাছে যাওয়ার জন্য বলেন। মনভরণের মা মনভরণকে বলেন, "একি হলো, তুই চলে গেলি? আমার কি হবে? তোর বাচ্চা-কাচ্চার কী হবে?" তিনি তাঁর মাকে বললেন, "আমার বড়ো ভাই আছে, সে দেখবে। মা আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।" এই বলে তিনি চোখ বন্ধ করে ফেলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন যে, স্বামীর ক্ষতস্থান বেঁধে তাঁকে মেডিক্যালে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এসে দেখলেন যে, তাঁর স্বামী আর কোনো কথা বলছেন না। তিনি প্রায় দিশেহারা হয়ে গেলেন এবং চিৎকার করতে লাগলেন। তার চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন আসতে শুরু করলেন। সবাই

তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় মনভরণের বড়ো ভাই তাঁর লাশ মাঠের মধ্যে রেখে আসলেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই হল ছাড়তে খুব ব্যস্ত হয়ে গেল। রাজকুমারী দেবী মাখনকে বললেন, "সবাই তো চলে যাচ্ছে। আমি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? চলো না একবার ওদের বাবাকে দেখে আসি।" তখন তিনি আবার লাশের কাছে গেলেন এবং লাশটাকে নমস্কার দিয়ে চলে আসলেন। রাজকুমারীর ভাষ্যমতে ঐ সময়ের অবস্থাটি এমন ছিল যে, কিছু মানুষ তাঁদের এই পৈতৃক বাসস্থান ছাড়তে রাজি ছিল না। আবার কিছু মানুষ তাঁদের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য অধীর ছিল। কিছু লোক ইতোমধ্যে চলেও গিয়েছিল আর বাকিরা তাঁদের অনুসরণ করছিল। হল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গেটের সামনে মৃতদের স্তূপ দেখে তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জীবন বাঁচানোর তাগিদে মৃতের স্তূপ ডিঙিয়ে মেডিকেলের গেট পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তখন দুজন লোক তাঁদেরকে হোসেনী দালানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তাঁদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে দালানের কেয়ারটেকার পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর আক্রমণের ভয় নিয়েও তাঁদেরকে নিজের ধর্মীয় পরিচয় ভুলে গিয়ে ভেতরে আশ্রয় নিতে বললেন। তাঁর বাচ্চাদের শান্ত করেন এবং মাঝরাতের দিকে তাঁর অগ্নিদগ্ধ শরীরের যন্ত্রণা অনুভব করলেন। কেয়ারটেকারের কাছে অনুমতি নিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গোসল সারলেন যেন কিছুটা যন্ত্রণা লাঘব হয়। পরদিন সকালে কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলে আবার বেরিয়ে পড়েন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। শুরু হয় টিকে থাকার আরেক নতুন সংগ্রাম (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

বাবা মনভরণ রায়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করছিলেন তাঁর ছেলে বিমল রায়ও। ২৬শে মার্চ সকালে পাকবাহিনীর নির্দেশে তাঁর বাবা লাশ টানার কাজ শেষ করলে তাঁকে পাকবাহিনী গুলি করেছিল। তাঁর বাবার বুকে চারটি এবং পেটে আরো দুইটি গুলি লেগেছিল। তাঁর বাবা ঐ অবস্থাতে থেকেও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন। মনোভরণ রায় তাঁর স্ত্রী রাজকুমারী দেবীকে বলেছিলেন, "আমি বাঁচব না। তুমি আমার সন্তানদের নিয়ে লক্ষ্মীবাবুর কাছে চলে যাও। তিনি অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবেন।" এর কিছুক্ষণ পরেই বিমল রায়ের বাবা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বিমলের মা রাজকুমারী দেবী স্বামীর শোকে পাগলের মতো কান্নাকাটি করতে শুরু করেন। এমন সময় তাঁদের প্রতিবেশীরা এসে তাঁদেরকে হল ত্যাগ করার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করে। সেই সময় তাঁদের সকলকে হল থেকে নিয়ে বের হয়ে হোসেনী দালানের দিকে রওনা হন (বিমল রায় রচিত 'আমার বাবা শহিদ

মনভরণ রায়’, *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ.৪৪-৫ এ বিস্তারিত দেখুন)

২৫শে মার্চ রাতের বিভীষিকাময় সময় পার করে যখন ভোরের আলোর মধ্যেই রেনু বালা দে দেখতে পেলেন কীভাবে তাঁর স্বামী শহিদ খগেন দে ও তাঁদের সন্তান মতিলাল দে লাশ নিয়ে আসছে মাঠের মধ্যে। পরক্ষণে আবার তাঁদেরই লাইনে দাঁড়াতে বলল এবং তাঁদেরকেও গুলি করল। সেখানে তাঁর স্বামী ও বড়ো সন্তান মতিলালের সাথে বিন্দুর বাবা মনভরণ রায় ও আরো অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। বিন্দুর মা যখন মনভরণ রায়কে গিয়ে ঐ মাঠ থেকে নিয়ে আসে, তখন তিনি (মনভরণ) পানি খেতে চাচ্ছিলেন এবং রেনু বালা দে তাঁকে পানি খাওয়ানোর সাথে সাথেই মারা যান। তখন রেনু বালা দে তাঁর মেয়ে বাসনা দে’র কাছে ছয় মাসের শিশু সন্তানকে রেখে তাঁর স্বামীকে মাঠ থেকে ঘরে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর অবস্থা তখন খুব একটা ভালো ছিল না। তখন তাঁর স্বামী তাঁর কাছে পানি চাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে হঠাৎ সেনাবাহিনীর একটা জিপ হলের গেট দিয়ে ঢুকল। তখন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে সরে গিয়ে বড়ো ছেলের কাছে গেলেন এবং তাঁকেও মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন। তাঁর ছেলেকে নিতে চাইলেন তিনি বলেছিলেন, “মা, নেওয়ার তো কিছুই নেই। তুমি মনে কোনো কষ্ট নিয়ো না। আমি তোমার এক ছেলে মরে গেলেই কি? তোমার তো লক্ষ লক্ষ ছেলে রইল।” তখন তাঁর মেয়ে বাসনা তাঁর বাবাকে ও ভাইকে পানি খাওয়ালেন। তিনি মেয়েকে আবার পাঠালেন ওদেরকে নিয়ে আসতে। বাসনা দে’র বড়ো ভাই তখন যেতে চাইছিলেন না তাঁর সাথে। যে-কোনো সময় পাকবাহিনী আসতে পারে ভেবে চলে বাসনাকে চলে যেতে বললেন। পরক্ষণেই পাকবাহিনী সর্বত্র টহল শুরু হয়ে যায়। ফলে তাঁদেরকে সাথে করে আর আনা যায়নি। এর কিছুক্ষণ পর হোসেনী দালানের থেকে একটা ছেলে এসে তাঁদের সবাইকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পর ছেলেটির কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলেন মিলিটারি আবার হলে ঢুকেছে বিধায় লাশগুলোকে সে মেডিকেলে রেখে আসতে পারেনি। একরকম অসহায় অবস্থায় ২৬ তারিখের রাতটাও কাটালেন তাঁরা। পরের দিন কিছু সময়ের জন্য শিববাড়িতে গেলে বুঝতে পারেন যে, শিববাড়ির মন্দিরের ধর্মগুরু জানেন না সেখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া পাঁচ-ছয় জন কী অবস্থায় আছেন। রেনু বালা দে তখন তাঁদের বলেন, “আমি তো দেখেছি আমার সামনে তাঁদেরকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।” তখন শিববাড়ির

ধর্মগুরু এসব শুনে খুব অবাক হলেন। শিববাড়িতে ২৭ তারিখ রাত্রিযাপন করে পরদিন ঢাকা থেকে গ্রামের দিকে রওনা হন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় রাত কেটে যাওয়ার পরও নতুন নতুন অভিজ্ঞতাসমূহ যুক্ত হচ্ছিল সেদিনের সেই অল্পবয়সী মেয়ে বাসনা দে'র স্মৃতিতে। জগন্নাথ হলের পূর্ব-পাশের প্রাচীর ভেঙে যখন মিলিটারি ঢুকে পড়ল মাঠে, তাঁদের সেই বন্দুক, জালিটুপি দেখেও নিজের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারছিলেন না। তাঁর পাশে তাঁর মা কান্না করছিলেন এবং অন্যান্য মহিলারা তাঁকে সামলাচ্ছিলেন। বাসনা দে হঠাৎ লক্ষ করলেন, মাঠের মধ্যে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু পড়ে আছে। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক ড. জি.সি দেব। তাঁর বাবা ও ভাইয়ের সাথে পাড়ার যাঁদেরকে সেদিন রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের সবাই ধরাধরি করে কিছু নিয়ে মাঠে আসছিল। পরে বুঝতে পারেন সেগুলো মৃতদেহ। ভোরের আলোয় যখন সব স্পষ্ট হয়েছে তখন সবাই তাঁদের বাড়ি থেকে ধরে আনা পুরুষ লোকদের খুঁজছিলেন। তবে মিলিটারি একত্রিত হতে থাকে। হলের পশ্চিম দিকে তাঁর বাবা, ভাই ও অন্যান্যদের দিয়ে লাইন করায় এবং হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ করে পাকবাহিনী। গুলির আওয়াজ সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল। সবাই যখন মাটিতে ঢলে পড়লেন, তখন মহিলারা কান্নায় ভার করে তুলল চারপাশ। পাকবাহিনীর কয়েকজন তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে বলে "রো মাত, উধার চালো...।" বাসনা দে'র মা তখন ছোটো ভাইকে তাঁর কোলে দিয়ে তাঁর স্বামী ও ছেলের কাছে যান। আর এদিকে ভাই দুটিকে জড়িয়ে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। একটু বেলা হলে মিলিটারি যখন ট্রাকে করে বেরিয়ে যায়, তখন বাসনা দে'র মা বাইরের যেসব দ্রব্যাদি বের করে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের মগ পেলেন। গুলিবিদ্ধ দেহগুলোর মধ্যে একটা কণ্ঠস্বর তাঁকে 'বুনু' বলে ডেকে উঠলেন। তিনি তখন পানি খাওয়ালেন। কয়েকজনের দেহের পর তাঁর বাবাকে দেখতে পেলেন যিনি কথা বলতে পারছিল না এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছিল। মগের বাকি পানিটুকু তাঁকে খাওয়ালেন। তাঁর বাবাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর বাবার একটা হাতের কবজি থেকে বাকি অংশটুকু নেই, দুটো পা কোনোরকমে ঝুলে আছে এবং সারা শরীর রক্তাক্ত। তিনি মেয়েকে শুধু বললেন, "মায়ের সাথে থেকো। এখান থেকে পালাও।" এদিকে আবার শুনতে পেলেন তাঁর ভাই 'বোন, বোন' বলে ডাকছে এবং তাঁকে ধরে উঠিয়ে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে বলছিলেন। কিন্তু তাঁর

ছোট্ট কাঁধ সেদিন চেষ্টা করেও তাঁর ভাইকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। এর মধ্যে মিলিটারি মাঠের ভেতর পৌঁছে গিয়েছিল টহল দিতে দিতে। মায়ের কাছে এসে যখন তিনি বললেন, তাঁর মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এবং তাঁর মা তখন আবারও পানি নিয়ে তাঁদের কাছে যাওয়ার কথা বললেন। পানি নিয়ে যাওয়ার পর তেমন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর বড়ো ভাই মতিলাল হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে একটু দূরে অসাড় হয়ে পড়েছিল। প্রথমে না দেখতে পেলেও আওয়াজ শুনে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন বাসনা দে। তাঁর ভাইকে পানি খাইয়ে আবার তাঁর বাবাকে খুঁজতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁকে অসাড় ও নিস্পৃহ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তাঁর বাবা কোনো সাড়া দিচ্ছিলেন না। তাঁর ভাই তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তাঁদের কাছে যেতে। তখন কোথা থেকে একজন এসে বলেছিলেন, "তুই নিজেও মরবি আর আমরাও মরবো। শীঘ্রি আয়, আড়ালে আয়।" সেই মুহূর্তে বাসনা দে'র হুঁশ ফিরে এলো এবং তিনি কাঁদতে শুরু করেছিলেন ছোটো দুই ভাইকে জড়িয়ে ধরে। তাঁর মনে পড়ে সে মুহূর্তে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এটাই ছিল বাসনা দে'র সাথে তাঁর অতি প্রিয় বাবা ও দাদার শেষ দেখা (বাসনা দে রচিত '২৬ মার্চ' ৭১: যা ঘটেছিল, যা দেখেছিলাম', *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ.৩২-৬ এ বিস্তারিত দেখুন)।

সাউথ হাউজের ডাইনিং-এ অন্য কয়েকজন ছাত্রের সাথে চেয়ারের নিচে লুকিয়ে থাকা মাখনলাল ২৬শে মার্চ ভোর পাঁচটার দিকে আর্মিদের আরো গাড়ি জগন্নাথ হলে প্রবেশ করছে দেখে আর বেঁচে থাকা সম্ভব না ধরে নিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, রাতেরবেলা অন্ধকারে তাঁদেরকে আর্মি খুঁজে না পেলেও দিনের আলোয় তাঁদেরকে স্পষ্ট দেখতে পারবে এবং আর পালানোর জায়গা না থাকায় তাঁদেরকেও হত্যাকাণ্ডের বলি হতে হবে। কিন্তু আর্মি ঐ ভবনের তিনতলা পর্যন্ত উঠে আবার নেমে যাওয়ায় সে যাত্রায় তাঁরা রক্ষা পান। দুপুর বারোটা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যে চলে গিয়েছিলেন। মাখনলালের কথায় ২৬শে মার্চে মিলিটারিদের নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে,

> ...দক্ষিণ বাড়ির মধ্যে লন্ড্রির কাছ থেকে মাঠের মধ্যে আমি সব দেখেছি। বেলা যখন প্রায় তিনটা (আনুমানিক) যখন আবারো ট্রাক্টর নিয়ে আসে। একটা ট্রাক্টর এসে গর্ত করে বর্তমান শহীদ মিনারে এবং পরে ওই গর্তের মধ্যে সমস্ত লাশ ফেলে। কারও হয়তো হাতে

> গুলি লাগায় না মরে বেঁচে ছিল, তাঁকেও জোর করে মাটিচাপা দেওয়া হলো। আহত লোকগুলো হাত দিয়ে বারণ করে, কিন্তু তারা শোনেনি, ঠেলে মাটি দিয়ে দিলো। এমনভাবে গর্তের মধ্যে ফেলল যে কারো হাত, মাথা, কাপড়, লুঙ্গি বেরিয়ে আছে। এইভাবে মাটি দিয়ে চলে গেল।... (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ১১৫-৬)।

২৫শে মার্চ সারারাত ঘরবন্দি থেকে ২৬শে মার্চ দিনটিও গীতা রানীর পরিবারও একইভাবে কাটান। সারাদিনে তাঁরা শুধু দই, গুড় দিয়ে পান্তাভাত আর চা খেয়েছিলেন। ২৬শে মার্চ রাত বারোটার দিকে তাঁরা জানতে পারলেন যে, পরদিন থেকে কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হবে। পরের দিন, অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ধীরেন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পান ছিন্ন ভিন্ন লাশ। টেবিল এবং বই সবকিছু আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে সৈন্যরা গুলি করেছে এবং তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তখনই তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর ভাগ্নে সুনীল চন্দ্র নিখোঁজ হয়েছে। সুনীলের এই নিখোঁজের সংবাদ শোনার পর ধীরেনচন্দ্র তাঁকে খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করেও কোনো খোঁজ পাননি। সাড়ে তিনটার দিকে ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে তাঁরা বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। অল্প কিছু জামা-কাপড়, পাঁচকেজি চাল, মশারি, তেলভর্তি হারিকেন, দিয়াশলাই ও হাতপাখা সাথে নিয়ে ঢাকা থেকে ২৭ মাইল দূরে ভাঙ্গুরায় এক চাচার বাসায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে আরো ১৭জন যোগ দেন। গীতা রানী পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলেন যে, ২৫শে মার্চ রাতে তাঁরা তাঁদের ঘর থেকে যে ১৪জনকে সারিবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছিলেন, সেখানে তাঁদের ভাগ্নে সুনীলও ছিলেন। ঐদিন ছাত্ররা অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁরা জীবন রক্ষার জন্য হলের এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছিলেন। জগন্নাথ হলে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা ছিল। তাঁকে যখন সৈন্যরা উর্দুতে জিজ্ঞেস করল যে, ঘরের ভেতরে কোনো পুরুষ আছে কি না? ঐ মহিলা মাড়োয়ারি, হিন্দি জানতেন। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রশ্নের উত্তরে ঐ মহিলা তাঁদেরকে ঝাঁটাপেটা করতে উদ্যত হলে মিলিটারি তৎক্ষণাৎ তাঁকে গুলি করে (Ahmed, 2009)।

পাকবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে জগন্নাথ হলে আক্রমণ করার পর দিন, অর্থাৎ ২৬শে মার্চেও তা অব্যাহত ছিল। তিনি (ধীরেনচন্দ্র দে) দেখলেন যে, মিলিটারি যাকে যেখানে পাচ্ছে, সেখান থেকেই টেনে টেনে আনছে এবং তাঁদের পূর্বদিকে মুখ

করিয়ে লাইন করাচ্ছে। আর এই লাইনটা করাচ্ছিল ছাদের একদম কিনারের দিকে, যাতে ঐখান থেকে সবাই নিচে পড়ে যায়। সেখান থেকে রণদা নামে একটি ছেলে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যায় এবং পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁকেও গুলি করা হয়। বাকিদের তিনজন করে লাইন করে হাত উঁচু করিয়ে গুলি করা হয়। এদের মধ্যে সুরেস দাস নামে এক ছাত্র ছিল। তিনি গুলিবিদ্ধ হলেও শুধু অজ্ঞান হয়েছিলেন, মারা যাননি। তিনি আহত অবস্থায় ধীরেনচন্দ্র দে'র ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ রাতে তাঁদের ঘরে যাঁরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে চা বিস্কুট খাওয়ানো হয়েছিল। ২৭ তারিখে যখন কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলো, তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে উত্তর-বাড়ির দিকে গেলেন। সেখানে তিনি দুঃখী রামের ছিন্ন ভিন্ন লাশ দেখতে পান। বাসার একতলা থেকে তিন তলা পর্যন্ত ফোঁটাফোটা রক্ত ছিল। এমনকি ঘরের সামনে ঘাসের উপর এক ইঞ্চি পর্যন্ত রক্তে মাখা ছিল। পুকুরের কাছে যেখানে গর্ত ছিল, সেখানেও রক্তমাখা ছিল। তারপরও তিনি বাসা থেকে সাইকেল নিয়ে বের হলেন। তিনি বিভিন্ন 'স্যারের' (শিক্ষকের) বাসায় গিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নিলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, যতীন বাবুর মেয়ের গুলি লেগেছে। তিনি সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য বাবুর বাড়ির দিকে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, তিনি গোসল করে মাত্র বের বেরিয়েছেন। সন্তোষ বাবুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর ভাগ্নে সুশীলের কথা জানতে চাইলেন। তিনি তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। তাঁর খোঁজে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলেন। সেখানেও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ফিরে আসলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড়ো গুদাম আছে, সেখান থেকে মানুষ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। তারপর বাসায় গিয়ে দেখলেন তাঁকে নেওয়ার জন্য ডিজি অফিস থেকে দুইজন লোক আসলেন। তিনি তাঁদের সাথে ডিজি অফিসে চলে গেলেন। ২৭ তারিখ তিনি যখন মাঠে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, মৃত সবাইকে একটি গর্তে পুঁতে রেখেছে। তিনি তাঁর ভাগ্নেকে খুঁজে পাননি যে জগন্নাথ হলের মাঠে শহিদ হয়েছিলেন। তিনি জানতে পারেন যে, সুনীল লাশ টানার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাঁকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়। বাসার সামনে স্টাফ কোয়ার্টারের সবাই ওইদিনের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অধ্যাপক জিসি দেবকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সেই বাসায় একটি মুসলমান পরিরার ছিল। জিসি দেবের পালিত কন্যা রোকেয়ার পরিবার। রোকেয়ার স্বামী বলেছিলেন, "আমরা মুসলমান আমাদেরকে হত্যা করা হবে না।" কিন্তু যখনই তাঁর স্বামী দরজা খুলল, তাঁকে মিলিটারি গুলি

করে হত্যা করল। তারপর ধীরেন ২৭ তারিখ ৯টার দিকে জিসি দেবের বাসায় গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন ঘরের দরজা খোলা। লুট হওয়ার আশঙ্কায় ধীরেন দরজা বন্ধ করেছিলেন। যদিও জিসি দেবের বাসা আগেই লুট হয়েছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

পাকবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা চালানোর পর ২৬শে মার্চ ভোরে সেই লাশগুলো টেনে এনে গর্তে ফেলার জন্য মাঠে জড়ো করেছিল। এই কাজে তারা হলের কর্মচারীদের অনেককে ব্যবহার করেছিল। লাশ টেনে আনার কাজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমনদের মধ্যে একজন হলেন চিৎবল্লী। তিনি লাশ টানা বা ধোলাই করাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নেকের কাজ উল্লেখ করে অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে এই কাজে যুক্ত হওয়ার কথা তাঁর স্ত্রীকে জানান। তাঁর স্ত্রী তাতে আপত্তি জানালেও চিৎবল্লী তা আমলে নিচ্ছিলেন না। ঘর থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে দরজায় বাধা পাওয়ায় তিনি লাশ টানার কাজে নিজেকে যুক্ত করা থেকে নিবৃত করেন। পরে তিনি মাঠে বসে অন্যদের লাশ টানার কাজ প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন সময় তিন থেকে চারজন আর্মি তাঁকেসহ আরো তিনজনকে ডেকে নিয়ে একটু দূর থেকে উর্দুতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁরা বাঙালি কি না। এখানে কী উদ্দেশ্যে থাকে, ‘বাঙালি’ মারতে পারবে কি না ইত্যাদি। চিৎবল্লী উত্তরে জানিয়ছিলেন যে, তিনি বাঙালি নন, পশ্চিমা। এখানে থাকছেন চাকরির জন্য এবং তাঁরা ‘বাঙালি’ মারতে পারবেন বলে জানিয়ে ছিলেন। চিৎবল্লী তাঁর সাথে থাকা অন্যদেরকে এ যাত্রায় বেঁচে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করার তাগিদ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাড়িতে ফেরত আসেন। অন্যরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তিনি তাঁর ঘরের উত্তর পাশের জানলা দিয়ে দেখছিলেন লাশ টেনে আনা এবং রাখার কাজগুলো। তিনি সেখানে জানলা দিয়ে মধুসূদন দে’কে দেখতে পেয়েছিলেন, যাঁকে অন্য দুজন কাঁধে করে শিববাড়ি এলাকা থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছিলেন। পরে আর্মির মেজরের নির্দেশে লাশ টানার কাজ করা সকলকে লাইনে দাঁড়াতে বলেছিলেন। সেই লাইনের শেষে থাকা মিস্ত্রী মিলিটারিকে অনুরোধের সঙ্গে কিছু একটা বলার পরে তাঁকেই প্রথমে গুলি করা হয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে সকলকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর চারজন সৈন্য হাসতে হাসতে চিৎবল্লীর বাসার দিকে আসতে শুরু করেছিল। তিনি ধারণা করছিলেন যে, এরপর বোধহয় তাঁরা যে কয়জন আছেন তাঁদেরকেই ডাকা হবে মৃতদের কবর দেওয়ার জন্য। তিনি আর কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজেও এসেম্বলি গেট থেকে বের হয়ে যাবেন ভাবলেও মিলিটারি বন্দুক নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ

করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি আবার পেছনে ফিরে যান। মিলিটারি দেখে ফেললে তাঁর অবস্থা কীরূপ হবে সেই ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় চিৎবল্লী কোন দিকে যাবেন বুঝতে না পেরে শেষমেষ প্রবেশ করেছিলেন মিলিটারির পুড়িয়ে দেওয়া ঘরগুলোতে। পুড়তে থাকা ঘরগুলোতে আগুনের তাপে কোথাও জায়গা না পেয়ে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাথরুমের ইটজোড়ার ওপর। হঠাৎ জল-তৃষ্ণায় কাতর চিৎবল্লী বাথরুম বা অন্যান্য জায়গায় পানির সন্ধান না পেয়ে নাজুক অবস্থায় যাত্রা করেছিলেন নিজ বাড়ির দিকে। নিজের অবস্থানগত ব্যাপারে তাঁর তখন কোনো জ্ঞান ছিল না। বাসায় ফিরলে তাঁর শরীরের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বাড়ির সদস্যরা ভেবেছিলেন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ সময় তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন,

> ...তারপর না কি আমি মাঠে গিয়ে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করেছি। কারণ আমি হয় গুলি খেয়েছি, না হয় আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। পরে আমার মনে পড়েছে আমার শরীরে যে রক্ত তা হলো আমি পাগলের মতো এদিক-ওদিক করে যখন ক্যান্টিনে ঢুকতে চেয়েছি, তখন কেনো দরজা না পেয়ে জানালার কাঁচ মাথা দিয়ে ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার সময়ই মাথা কেটে গিয়েছিল। আমি তখন মাঠে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছি, তখন আমার বড়ো ভাই আমাকে ধরতে গেল, কেউ যায় না দেখে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে আমার কোমর ধরে আমাকে অন্য ঘরে ঢুকিয়ে মাথায় জল দিতে লাগল এবং একপর্যায়ে আমি দেখলাম আমার সমস্ত শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।... (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ১১২-১১৩)।

এই বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় পাক মিলিটারির সেই রাতের কার্যক্রম কীভাবে লোকজনের মধ্যে মানসিক ট্রমা সৃষ্টি করেছিল। এরপর তিনজন লোক তাঁদের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, রাস্তায় তখন মিলিটারি নেই। বাঁচতে চাইলে এটিই তাঁদের সুযোগ্য সময়। তারপর ওদের কথামতো চিৎবল্লীরা হল ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন হোসেনী দালানে। সেখানে তিনদিন থাকার পরে তাঁরা ভিন্ন জায়গায় চলে গিয়ছিলেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ১১০-১১৩)।

আহত জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা নিজ রুমে অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে ২৫শে মার্চের রাত পার করলেন। গোপাল চন্দ্র দে প্রাধ্যক্ষের স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতাকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন। ২৬শে মার্চ সকাল সাতটা থেকে আটটার সময়ও উনার জ্ঞান ছিল এবং তাঁর স্ত্রী গোপাল চন্দ্র দে'কে ডাক্তার ডাকতে বললেন। তবে সে সময় প্রবলভাবে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল বিধায় তা আর সম্ভব হয়নি।

তখন গৃহকর্মী এসে খবর দিলেন আবার মিলিটারি আসছে। তখন তিনি বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে বুঝতে পারলেন, পাঁচ থেকে ছয় জন মিলিটারি জগন্নাথ হলের কয়কজনকে নিয়ে এসেছে লাশ টানার জন্য। তখন কোনোরকমে বাথরুম থেকে বের হয়ে হলের পুকুরপাড়ের আমগাছের তলায় বসেছিলেন গোপাল চন্দ্র দে। চারদিক তখন ঘেরাও করা ছিল বলে আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। গোপাল চন্দ্র দে সেখান থেকে দেখছিলেন। সকাল প্রায় বারোটার দিকে শহিদ মিনারে ডিনামাইট ফিট করেছিল সেটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শহিদ মিনারের পাশে কাঁচের ঘরগুলোর কয়েকজনকে মেরেও ফেলেছিল। মিলিটারি যখন ঘরগুলোতে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করল, তখন সেখান থেকে একজন কোনোরকমে পালিয়ে এসে আমগাছ তলায়ই আশ্রয় নিলেন। বিকট আওয়াজে শহিদ মিনার ভেঙে গেল এবং পাশে মেশিনগান ও গুলির বাক্স হাতে মিলিটারি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন তাঁদের চোখ এড়িয়ে গোপাল চন্দ্র দে, দারোয়ান ও সেই পালিয়ে আসা লোক, এ তিনজন পানি না থাকায় সেই পুকুরে মরার মতো শুয়েছিলেন। মিলিটারির চোখে তাঁরা পড়েনি। এভাবে ২৬শে মার্চের রাতটি খাবার ও জলহীন অবস্থায় কাটালেন। এরপর ২৬শে মার্চ সকাল আটটা-নয়টার দিকে কারফিউ কিছুটা স্থগিত হলে তিনি বাসায় গেলেন। তখন সেখানে কিছু মানুষও এসেছিলেন এবং প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে মেডিক্যালে নিয়ে গেলেন। মেডিক্যালের ডাক্তাররা এসে তখন বলেন, তাঁরা খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন না। তাই তাঁরা বাসা থেকে খাবার নেন। সেখানে গিয়ে গোপাল চন্দ্র দে দেখেন একে একে অসংখ্য বীভৎস ডেডবডি আসতে লাগল। যাঁদের চোখ নেই, কান নেই বা শরীরের কোনো অংশ নেই। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার তখন জ্ঞান ছিল এবং গোপাল চন্দ্র দে'কে থাকতে বলেন। কিন্তু তিনি এতটাই দিশেহারা ছিলেন যে, থাকতে পারছিলেন না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেন্ডারিয়া গেলেন এবং সেখানে স্কুলে থাকতে চাইলে দারোয়ান তাঁকে বললেন যে, এখানে বোম্বিং হতে পারে। তাই আরেকটা বাড়িতে গেলেন। সেখানে ট্রেনিং নেওয়া ১০ থেকে ১২ জনের দল আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এখানে কোনোরকমে রাত কাটালেন। পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ তারিখ বিকালবেলা প্রাধ্যক্ষের স্ত্রীর বাবার বাড়ি ফতুল্লাতে রওনা হন। রাস্তায় দেখতে পান সব ইপিআর ও রাজারবাগের পুলিশ অস্ত্রহীন অবস্থায় ছুটছে। তাঁরা বললেন যে, তাঁরাও পালিয়ে এসেছেন এবং গণ্ডগোল হবে অনেক তাই সবাই যেন শহর ছেড়ে চলে যায়। রাতে ফতুল্লাতে থাকেন। পরেরদিন সকালবেলা সেখানে গেন্ডারিয়া স্কুলের একজন গোপাল চন্দ্র দে'কে তাঁর

নাম পরিবর্তন করে মুসলমান নাম রাখতে বলেন। সেখান থেকে মেডিক্যালে গিয়ে জানতে পারেন প্রাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার শরীরের অবস্থা তেমন ভালো না। সেদিন হাসপাতালে রাতে থাকার সময় জানতে পারেন ইপিআর ও পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাগুলি হয়েছে। রাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওখানেই থাকেন। প্রাধ্যক্ষের শরীর খারাপ হচ্ছিল এবং অনেকের সামনে থেকে হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রাধ্যক্ষের স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা একটা ডেথ সার্টিফিকেট চাইলেন ডাক্তারদের কাছে কিন্তু ডাক্তাররা তা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখনই পূর্ব-রাতের আহত ইপিআররা মেডিকেল আছে কি না খুঁজতে মিলিটারি হাসপাতালে চলে এলো। সেখানে একজন পরিচিত ডাক্তার এম্বুলেন্সে করে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে গেলেও ডেডবডি দিতে রাজি হয়নি। পরদিন বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা আবার গোপাল চন্দ্র দে'কে হাসপাতালে পাঠান ডেডবডির অবস্থা জানতে। সেখানে তিনদিন চেষ্টার পরও ডেডবডি পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার পর তাঁরা সেই ডেড সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। জগন্নাথ হলের কর্মচারী চিৎবল্লীসহ অনেকের থেকে জানা যায় জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার লাশ পোস্টমর্টেম ঘরের পাশে গর্ত করে রাখা হয়েছিল। উনার স্ত্রী তখন বলেন "আর কিছুই তো করার নেই। সে ভালোবাসত ফুল। তাই কয়েকটি ফুল দিয়ে দাও সাথে করে।" তখন কিছু ফুল সেখানে রাখা হয়েছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ.১৩৬-১৪০)।

মধুদা'র পরিবারের সদস্য রানু রায়, অরুণ দে, অধীর দে, ছোটো মেয়ে রানু ও ছোটো ছেলে অরুণের স্মৃতিতে ২৬শে মার্চ ভয়াল রাতের প্রত্যক্ষদর্শীর ঘটনাচিত্র পাওয়া যায়। পাকবাহিনী ২৫শে মার্চ আক্রমণ করার পরও ২৬শে মার্চ তার ভয়াবহতা অব্যাহত ছিল। ২৫শে মার্চের পরদিন, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ পাকবাহিনী মধুদা'র ঘরে আক্রমণ করে। মধুসূদন যখন প্রার্থনারত ছিলেন, ঠিক তখনই আক্রমণ করে। কতগুলো সৈন্য তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে। তারা তাঁর নববিবাহিত ভাই বৌদিকে হত্যা করে। তাঁর মা ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। প্রথমে তাঁর মাকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করেনি। মিলিটারি যখন তাঁর বাবার কাছে যায়, তখন তাঁরা (রানু ও অরুণ) মিলিটারিকে বলেন যে, "আমাদের মারবেন না, বাবাকে মারবেন না"। এরপরে তাঁদের মা যখন এসে তাঁদের বাবাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, তিনি মিলিটারিকে অনুরোধ করে বলেন, "আপনারা আমাকে ধ্বংস করে ফেলেছেন। আপনারা আমার ছেলেকে, ছেলের বউকে মেরেছেন।.......।" মিলিটারি তাঁদের মাকে সরিয়ে নেয়, তারপর বেয়নেট দিয়ে তাঁর হাত দুটো কেটে ফেলে। মিলিটারি

তাঁর মাকে গুলি করে। সাথে সাথে তাঁর বাবাকেও গুলি করে। কিন্তু তাঁর বাবা মারা যাননি। তাঁর বাবা তাঁর মাকে ধরে কান্নাকাটি করছিলেন। আহত অবস্থায় তাঁর বাবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর বাবা তাঁর মৃত দাদা বৌদিকে ধরে কান্না করছিল। রানু রায়েরও গুলি লেগেছিল। তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল। গুলি শরীরের একপাশ থেকে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। তাঁর শরীর থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাঁর বাবা তাঁকে বললেন, তুই বসে থাক মা। তখন বাবা, তাঁর মা, দাদা, বৌদির নাম ধরে কাঁদছিল। ল্যাংড়ার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিলেন। হাঁটতে পারছিল না। তাঁর বাবার পিঠে একটা গুলি লেগেছিল। এটা রানু বের করেছিলেন। তাঁর বাবা তখন পর্যন্ত মারা যাননি। বিশ্ববিদ্যালয়র একজন ড্রাইভারের (তোতা মিয়া) প্রদানকৃত তথ্য থেকে জানতে পারেন যে, তাঁর বাবা তখনও জীবিত আছেন (Ahmed, 2009)।

অধীর চন্দ্রের ভাষ্যে এর আধঘণ্টা পরে দুজন বাঙালি লোককে সাথে নিয়ে মিলিটারি তাঁর বাবাকে নিয়ে যায় এই বলে যে, তাঁর বাবাকে তারা ভালো করে দিবে। তাঁর বাবা বলেছিলেন তাঁর মেয়েকেও সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মেয়েও গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। রানু রায় জিগ্যেস করলেন তাঁর বাবাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন তাঁরা বললেন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভালো করে আবার পাঠিয়ে দিবে। এই বলে তাঁর বাবাকে (মধুসূদন) জগন্নাথ হল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আর তাঁর বাবাকে তিনি দেখতে পাননি। তখন তাঁরা তিনজনের লাশ নিয়ে ঘরেই বসেছিলেন। তাঁর কথা বলার মতো শক্তি ছিল না। ওপর তলার একজন এসে তাঁদের নিয়ে যেতে চাইলে তাঁরা যায়নি। তাঁর ছোটো ভাই-বোনরা কাঁদছিল। রানু রায় বলেন, "ওরা তো বলে গেছে যে বাবাকে দিয়ে যাবে। ওরা তো আর এসে বাবাকে দিয়ে গেল না।" ওই তখন থেকেই তাঁর বাবাকে পাওয়ার একটা আশা তাঁদের মনে জাগ্রত ছিল। যখন কোনো গাড়ি আসে, তখনই তাঁরা মনে করেন এই বুঝি বাবা এলো। রানুর গালে গুলি লাগায় তার মুখটা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। পরেরদিন কিছু আত্মীয় এসে রানুকে মেডিক্যালে নিয়ে যান। তাঁর মা, দাদা, বৌদির লাশ ১০ থেকে ১২ দিন ঘরেই থেকে পঁচে গিয়েছিল। তারপর পাড়ার লোকদের খবরে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে তিনজনের লাশ নিয়ে যায়। এই খবর তিনি পরে পাড়ার লোকদের কাছ থেকে শুনেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

রানু রায়ের শারীরিক অবস্থা এবং পরবর্তী সময়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতির বিষয় জানতে পারা যায় তাঁর ভাই অধীর চন্দ্র দে'র প্রদানকৃত সাক্ষাৎকার থেকে। তিনি বলেন, তাঁর বোন রানুর শরীর থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ২৭শে মার্চ কয়েকজন যুবক এসে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে তিনি শুনতে পান যে হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন, তাঁদেরকে হত্যা করা হবে। এই গুজবে অনেকেই হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু রানু তখনও হাসপাতালে অবস্থান করছিল। ডাক্তাররা যখন জানতে পারল রানু মধুসূদন দে'র মেয়ে, তখন তাঁরা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা করেন। অধীর চন্দ্র ক্যান্টিন-বয় বাচ্চুর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, রানুর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়ছে (Ahmed, 2009)।

পকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক লাশ টানার কাজে নিয়াজিত ব্যক্তিদের মাঝে একজন ছিলেন মালি চান্দ দেব। তিনি ২৫শে মার্চ রাতে কোনোক্রমে লুকিয়ে বাঁচাতে পারলেও ২৬শে মার্চ সকালের আলো ফুটতেই হানাদার বাহিনীর নজরে পড়েন। তাঁর সাথে একইসময়ে আরো কয়েকজনকে এনে জড়ো করা হয় এবং পাকিস্তানি সেনারা বলতে থাকে, "বোল শালা, জয় বাংলা বোল। শালে, তোম লোককো জয় বাংলা বোল। তুমহারা মুজিব বাপকো বোলাও উ বাঁচায়গা। তুম লোককো সব শালাকো খতম কর দিয়া।" এসব গালাগালির পর পাকসেনারা তাঁদেরকে বলে, "কাম কারেগা, তুমলোগ কো ছোড় দেগা।" উপস্থিত লোকদেরকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। তাঁদের কাজ ছিল সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা লাশগুলোকে একত্রিত করা। হলের বাইরের লাশগুলোও চান্দ দেব'রা এনে হলের বর্তমান শহিদ মিনার চত্বরে রাখছিলেন। এরপর তাঁদেরকে শিববাড়ির দিকের লাশগুলোর ব্যবস্থা করার জন্য নিয়ে আসা হয়। চান্দ দেব মধুসূদন দে'র বাসায় গিয়ে দেখে তাঁর স্ত্রী, মেয়েসহ মধুদা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। পাকবাহিনী তাঁদেরকে নির্দেশ দিলে চান্দ দেব এবং শ্যামলাল মধুদাকে দুহাতে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছিল জগন্নাথ হলের দিকে। সেই মুহূর্তে মধুদা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "কোথায় নেবে?" চান্দ দেব কোনো উত্তর করতে পারেনি। রাস্তায় আসার সময় তাঁরা প্রত্যক্ষ করে পকিস্তানি বাহিনীর মাঝে কেউ কেউ চা খাচ্ছে আবার কেউবা মদ খাচ্ছে। হলে এনে তাঁরা মধুদাকে লাশের স্তূপের মাঝে রাখে এবং বলে "আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন।" তখন মধুদা বলেন "ওরা কারা, এগুলো কি সবাই মৃত?" তখন চান্দ দেব মধুদাকে বলেন, "এগুলো কারা আপনি জানেন না? এরা সবাই মৃত আর কিছুক্ষণ পর

আমাদেরও ওই একই অবস্থা হবে।" এর কিছুক্ষণ পর রক্ত ঝরতে ঝরতে মধুদা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় চান্দ দেব এবং তাঁর সহকর্মীরা অন্যান্য লাশ টানার কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। তিনি জিসি দেব'র লাশও দেখেছিলেন। তাঁকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল। বুলেটের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর শরীর ফুলে গিয়েছিল। সব লাশের মাঝে তিনি খেয়াল করলেন কোনো মেয়ের লাশ নেই। পাশাপাশি তিনি আরও লক্ষ্য করলেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এখানে সব ধরনের মানুষের লাশ আছে। তাঁদের লাশ টানার কাজ শেষ হওয়া মাত্রই তাঁদেরকে এক লাইন হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ শোনামাত্রই তাঁদের মাঝে ভীতি সঞ্চার হলো। তাঁদের মাঝে কেউ নিজেদের প্রাণভিক্ষা চাচ্ছিল। মিলিটারি বাহিনী একে একে গুলি করা শুরু করে। চান্দ দেব'র ডান উরুতে গুলি লাগে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মাটিতে মৃতদেহের পাশে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর বড়দাও তাঁর পাশাপাশি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। রক্ত ঝরার শব্দ, যা সাধারণত কোনোদিন শোনা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাও তিনি সেদিন শুনেছিলেন। লাশের স্তূপের মাঝে যারা তখনও জীবিত ছিল এবং নড়াচড়া করছিল, তাঁদেরকে পুনরায় মেশিনগান ঘুরিয়ে গুলি করা শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে চান্দ দেব অনেক শঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, তাঁকেও বোধহয় আবার গুলি করা হবে। কিন্তু তিনি সতর্কতার সহিত নড়াচড়া বন্ধ রাখেন বিধায় প্রাণে বেঁচে যান।

পাকবাহিনী ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আহতদের জন্য পানি নিয়ে আসেন এবং সবাই স্বীয় স্বজনদের পানি পান করান এবং গৃহে নিয়ে যান। চান্দদেব চারিদিকে মৃত্যুর মিছিল এবং তাঁর পায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দেখে তিনি তাঁর প্রাণের আশা ছেড়ে দেন। ওই মুহূর্তে পরিবারের সদস্যদেকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়ার জন্য তাগিদ দেন। শুধু এক জগ পানি তাঁর নিকট রেখে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রথম দিকে চলে যেতে রাজি ছিলেন না। তথাপি পরবর্তীতে তাঁর পীড়াপীড়িতে চলে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাঁর মা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং সবাই মিলে একসঙ্গে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

চান্দ দেব'র সাথে মধুদা'র লাশ বহনকরী আরেকজন হলেন মালী শ্যামলাল। মধুদাকে নিয়ে হলে আসা মাত্রই তিনি শ্যামলালকে প্রশ্ন করলেন "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমি এখান থেকে কোথাও যাব না।" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলাল বলেন, "আপনার শক্তি থাকলে আপনি অন্য কোথাও চলে যান। না হলে এই লাশের সাথে ঘুমিয়ে থাকুন।" মধুদাকে তাঁরা অন্যান্য লাশের সাথে শুইয়ে দিলেন। পাকসেনারা সেই লাশের উপর আবার গুলি করেছিল। লাশ টানার কাজ শেষ হলে পাকবাহিনী শ্যামলালসহ তাঁদের ৬০ জনকে লাইনে দাঁড়াতে বলেন। তাঁরা লাইনে দাঁড়ালে সবাইকে যখন ফায়ার করতে শুরু করলেন, তখন শ্যামলাল বুদ্ধিবলে মৃতদেহের সাথে মাটিতে পড়ে শুয়ে থাকে। অপারেশন শেষ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা হল ত্যাগ করে শিব বাড়িতে তাদের অন্য একটি দলের সাথে মিলিত হয়ে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে উঠে (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ৯০-৯)।

লাশ টানার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পাকবাহিনী দুটি গ্রুপে ভাগ করে। একটি বাংলাভাষী এবং অপরটি উর্দুভাষী। এদের মাঝে একজন ছিলেন মালী মোহন। তিনি জিসি দেবের লাশ টেনে আনেন। তাঁর শরীর পুরোটাই গুলিবিদ্ধ ছিল। জিসি দেবের লাশ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, জানালা খোলা। এই দৃশ্য দেখে তাঁর অনুমান হলো জিসি দেবকে সম্ভবত জানালা দিয়ে গুলি করে করে হত্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা আরো অনেক লাশ প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু তাঁদেরকে কীভাবে হত্যা করা হয় সে সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ তাঁদের পেটের ভেতর থেকে সমস্ত কিছু তুলে নেওয়া হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে যাঁরা তখনো জীবিত ছিল, তাঁদের মাঝে অনেকেই বলছিলেন "আমাদের এখানে রেখো না। অন্য জায়গায় নিয়ে চলো। আমাদের অন্য ব্যবস্থা করো।" পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মোহনের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। এমন অবস্থায় লাশ টানার কাজ শেষ হলে তাঁদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বলে। তিনি সারির প্রথমেই ছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তিনি গুলিবিদ্ধ হননি। এমন অবস্থায় তিনি তাঁর সামনে একজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পেট থেকে সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসার দৃশ্য দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, তাঁর পরিস্থিতিও এমন হবে। তিনি লাশের স্তূপের উপর গিয়ে লুকিয়ে পড়েন এবং অজ্ঞান হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে তিনি অনুভব করেন তাঁর একটাও গুলি লাগেনি। ঐ মুহূর্তে তাঁর পা একটু নড়াচড়া করা মাত্রই পাকবাহিনী তাঁর দুই পায়ে দুইটি গুলি করেন এবং তিনি আবার জ্ঞান হারান। কিছুক্ষণ পর তাঁর আবার জ্ঞান

আসে। তিনি তাঁর চারিপাশে পানি পানি শব্দ শুনতে পান। ঐ মুহূর্তে তাঁর দুলাভাইকে দেখতে পেয়ে ডাকেন এবং দুলাভাইয়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসা নাড়ি-ভুঁড়িকে চেপে ধরার চেষ্টা করেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর দুলাভাইসহ শিক্ষক কলোনির ভেতর প্রবেশ করে একজন শিক্ষককে বলেন, "স্যার আমি আপনার বিভাগের একজন মালী, আমার পায়ে গুলি লেগেছে। আপনার বাসায় আমি আসব। একটু পায়ে কাপড় বেঁধে আবার চলে যাব।" কিন্তু তিনি (স্যার) এক্ষেত্রে কোনো সহযোগিতাই করেননি। এরপর তিনি (মোহন রায়) সেখান থেকে দেওয়াল টপকে ভিসির বাড়িতে তাঁর মাসির সাথে দেখা করতে গেলেন। ২৭শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়ার পর তাঁকে মেডিক্যালে নেওয়া হয়। দেড় মাস চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি হলে ফিরে আসেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯)।

২৫শে মার্চ রাতের গণহত্যা চলাকালীন উপস্থিত না থেকেও পরবর্তী সময় জগন্নাথ হলের বিভীষিকাময় অবস্থা অবলোকনকারীদের মধ্যে একজন হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের অফিস সহকারী আব্দুল বারী। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি গ্রাম্য প্রতিবেশী জগন্নাথ হলের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র হরিধন দাসের খোঁজ করতে এসেছিলেন। আব্দুল বারী হরিধনের রুমে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ২৫শে মার্চের আগে অবস্থা বেগতিক অনুমান করতে পেরে তিনি নিজে বাড়িতে ফেরার সময় হরিধনকেও তাঁর সাথে বাড়িতে ফেরার কথা বলেছিলেন। কিন্তু হরিধন তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। ২৬ তারিখ গ্রাম থেকে আব্দুল বারী শুনতে পেরেছিলেন আগের রাতের গণহত্যার কথা। তখন হরিধনের পিতা-মাতা তাঁকে হলে গিয়ে তাঁদের পুত্রের খোঁজ নেওয়ার অনুরোধ জানায়। ২৩ টাকা হাতে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া আব্দুল বারী জগন্নাথ হলে প্রবেশের পরে চারিদিকে মৃত মানুষ, গরু, কুকুর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, যাঁকে খুঁজতে এসেছিলেন তাঁর অবস্থা কি না হয়েছে! আব্দুল বারী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার বাসায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যে লুঙ্গি পরতেন, তা ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকশূন্য সে বাসায় জানালা-কপাট ছিল খোলা অবস্থায়। তারপর উত্তর-বাড়ির পুকুরের কোনার দিকে হরিধনের রুমে জানালার নিচ থেকে দেখেন রক্ত পেছন দিয়ে নিচের দিকে পড়েছে। পরে ভেতরে গিয়ে দেখেন পড়ে আছে পুড়ে যাওয়া এক দেহ, যা শনাক্তকরণের উপায় ছিল না। হরিধনের রুমের ভেতরে এসে দেখেন চারদিকে রক্ত

ছড়িয়ে আছে। এ সময় হলের ভেতরের চিত্র আব্দুল বারীর কথায় ফুটে উঠেছে এভাবে যে,

...পুকুরের ঘাটের কাছে একটা লোককে মরা অবস্থায় দেখলাম। কাছে গিয়ে চিনতে পারলাম, সে ছিল এখানকার দারোয়ান। তারপর যে দৃশ্য দেখলাম তা বর্ণনা করা কঠিন। মাঠের মধ্যে দেখলাম গণকবর। এ গণকবরের মধ্যে দেখলাম পাগুলো উপরে এবং মাথা নিচে রয়ছে। কোনো কোনো লোকের হাত দেখা যায়। বিশৃঙ্খল অবস্থায় বহু কিছু দেখলাম। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম সেখান থেকে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। আমি যখন হলের ভেতর আসি তখন একটা বিশ্রী গন্ধ পেয়েছিলাম। তখনও দেখি হলের মধ্যে চারিদিকে লেপ, তোশক সব পুড়ছে। এই বিশ্রী গন্ধের কারণে আমি বাড়িতে গিয়ে বমি করলাম।... (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ১৩০)।

জগন্নাথ হল থেকে বেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন এসএম হলে। কিন্তু এসএম (সলিমুল্লাহ মুসলিম) হল সেদিন ছিল জনশূন্য। পরে শহিদ মিনারের সামনে রেডিওতে গীতা পাঠকারী এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে আব্দুল বারী জানতে পারেন যে কয়েকজন মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছেন। সেই সূত্র ধরে মেডিক্যালের একটি ওয়ার্ডে তিনি হরিধনকে দেখতে পেয়েছিলেন। হরিধন তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা তাঁর বাড়িতে না বলতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় আব্দুল বারী নিজেই অবশ্য মাঝে মধ্যে এসে হরিধনকে দেখে যেতেন (চক্রবর্ত্তী, ২০১৯, পৃ. ১২৯-১৩১)।

রোকেয়া হলের মুখ্য সহকারী হাসিনা হাফিজ ২৫শে মার্চ রাত কাটানোর পর ২৬শে মার্চের আরো অনেক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। পূর্বরাতে আহত হওয়ার কারণে তাঁর পেট থেকে প্রচুর রক্তকরণ হচ্ছিল। তিনি তাঁর মায়ের শাড়ির কিছু অংশ ছিঁড়ে ও স্কার্ফ দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। হাসিনা হাফিজের ছোটো বোন যে কি না ১২টি গুলিতে বিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হাসিনা বা তাঁর বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁরাও গুলিবিদ্ধ ছিলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে এক গ্লাস পানি পান করিয়ে ঘরে রেখে বাইরে চলে যান। রোকেয়া হলের ডাইনিং-এ গিয়ে তাঁরা কিছু অফিসারকে তখনও জীবন্ত দেখতে পায়। পূর্বের রাতে গোলাগুলিতে ডিউটিরত অফিসারদের মধ্যে এই কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই মারা যান। পরদিন, অর্থাৎ ২৭শে মার্চ কারফিউ উঠিয়ে নেওয়া হলে কয়েকজন পুরুষ তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, একটা ঘর লাশে পরিপূর্ণ ছিল। হাসপাতালে তাঁর বোনকে দেখতে পেয়ে তিনি চমকে গেলেন। তিনি জানতে পারেন তাঁর বোনকে কয়েকজন যুবক

হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। ঐ মুহূর্তে হাসপাতালে তাঁদের বাবা নেওয়াজ আলী, তাঁর বোন রওশন আরা ও হাসিনা হাফিজ একে অপরকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরবর্তীতে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসা নেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন (Ahmed, 2009)।

১৩টি গুলি লেগেছিল রোকেয়া হলের তৎকালীন পিয়ন নেওয়াজ আলীর ছোটো মেয়ে রওশন আরার গায়ে। অজ্ঞান হয়ে যান তৎক্ষণাৎই। ২৬শে মার্চ তাঁর জ্ঞান ফিরে পানির পিপাসা নিয়ে। চোখ খুলেই বলতে থাকেন, "মা পানি দাও, মা পানি দাও।" কিন্তু মায়ের কাছ থেকে পানি না পেয়ে চারপাশ ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন তাঁর মা ও দুই ভাই ইতোমধ্যেই মারা গিয়েছেন। সারাদিন এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে ছটফট করতে করতে কাটিয়েছিলেন রওশন আরা। এরমাঝে কেউ একজন এসে তাঁকে পানি পান করিয়েছিলেন। কিন্তু যন্ত্রণায় কাতর রওশন আরার সেই মুহূর্তের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি সেই ব্যক্তিটিকে এখন আর মনে করতে পারেন না। ২৭শে মার্চ তারিখে যখন কিছু সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়, তখন কিছু স্বেচ্ছাসেবী লোক এসে রওশন আরা ও তাঁর বড়ো বোন হাসিনাকে বাঁশের মাচায় করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

ভিন্ন চিত্র ছিল মোশারফের ক্ষেত্রে। ২৬শে মার্চ মোশারফদের বাড়িতে (মুন্সিগঞ্জ) তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে আসেন আব্দুল খালেক, তিনি মোশারফের পিতার সাথে কাজ করতেন। তিনি (আব্দুল খালেক) বলেন তিনি মোশারফের মৃতদেহ দেখতে পাননি। তাই মোশারফদের পরিবার আশা করছিল যে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন। এজন্য ঐদিন তাঁরা রোকেয়া হলে ছুটে যান। প্রথমে গিয়েই গেটে তাঁর বাবার পরিচিত একজনের মৃতদেহ দেখতে পান। এছাড়াও তাঁর বাবার লাশ খুঁজতে গিয়ে দেখেছিলেন অসংখ্য মৃতদেহ চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এবং কিছু লাশ মাটিতে এমনভাবে পুঁতে রাখা হয়েছিল যে সেগুলোর হাত পা মাটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এইসব দেখে তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে থেকে তাঁর বাবার লাশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু তিনি পাগলের মতো মৃতদেহ খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মোশারফ। মোশারফের চাচা তাঁর মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফেরান। তিনি বলেন, "আমি কাক এবং শকুনকে লাশ ঠুকরাতে দেখেছি।" যুদ্ধের এত বছর কেটে গেলেও সেদিনের ভয়, উৎকণ্ঠা ও কষ্ট

তিনি আজও ভুলতে পারেন না। ২৫শে মার্চের বহু মানুষের মতো তাঁর বাবাকেও আর কখনো পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার পর কঙ্কালগুলোকে বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থিত করা হয়। মোশারফ এখনো প্রত্যেক শুক্রবার জুম্মার নামাজে তাঁর বাবার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, "অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় আমার বাবাকে কবর না দিতে পারাটা আমাকে কষ্ট দেয়। এটা আমার অসহনীয় লাগে" (Ahmed, 2009)।

অন্যদিকে রোকেয়া হলে ২৫শে মার্চ সারারাত তাণ্ডবের পর ২৬শে মার্চ সকালবেলা ফুলবানু বেগম তাঁর চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তাঁর পরিবারের সকলকে মৃত আবিষ্কার করেন। অস্বাভাবিক তৃষ্ণায় তিনি পানির জন্য চিৎকার করছিলেন। সেই চিৎকারের শব্দ শুনেই দুজন সৈনিক তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছে দেখে ফুলবানু বেগম কুরআনের আয়াত পড়তে শুরু করলেন এবং তাঁর সন্তানের প্রাণ রক্ষার আকুতি জানাতে লাগলেন। একজন পাক সৈন্য তাঁকে পানি এগিয়ে দিলো পান করার জন্য। তিনি আবার পানি চাইলে অপর আরেক সৈন্য রাগে পানির পাত্রটাই ভেঙে দেন। ফুলবানু আবার তাঁর নিজের এবং সন্তানের প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। তাঁর দুই বছরের শিশু সন্তান বাবার মৃতদেহের পাশে গিয়ে 'আব্বু, আব্বু' বলে ডাকছিল। সৈন্যরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আবার জ্ঞান হারালেন। বিকেলে যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো, পুনরায় তিনি তৃষ্ণায় কাঁদছেন আর তাঁর সন্তান ক্ষুধায় কান্না করছিল। এরমধ্যেই তাঁর পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁকে পানি আনার জন্য অনুরোধ করলেন। ঐ ব্যক্তি যখন তাঁকে পানি এনে দেন, তখন ফুলবানু লক্ষ্য করলেন যে, সেই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর নাড়িভুঁড়ি পেট থেকে বেরিয়ে আসছে প্রায়। ২৬শে মার্চ কারফিউ থাকায় ফুলবানু বেগমকে সারাদিন ঐ ঘরে আহত, রক্তাক্ত অবস্থায়ই পড়ে থাকতে হয়েছিল। ২৭শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়ার পর কয়েকজন কর্মকর্তা এসে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁদেরকে বাধা দেয় এবং ফুলবানুকে গণকবরে ফেলে দিতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে সেদিনের কোনো এক সময়ে কিছু স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে সেখান থেকে তুলে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে যান। কিন্তু ১৫ দিন পর্যন্ত ফুলবানু সেখানে কোনো ডাক্তার দেখান নাই এবং ততদিন পর্যন্ত বুলেট তার শরীরেই ছিল। এরমধ্যে তাঁর বাবা এসে হাসপাতালে তাঁকে খুঁজে পেয়ে তিনি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পেরেছিলেন হাসপাতালে যাওয়ার আগে ঘরবন্দি অবস্থায় যেই দুইদিন ছিলেন,

দু'দিন তাঁর সন্তান মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। স্বামী ও স্বজন হারানোর ব্যথায় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আনন্দও করতে পারেনি তিনি। ফুলবানু বেগম বলেন, "আমি আর্তনাদ করতাম এবং বলতাম আমি স্বাধীনতা চাই না। আমি কষ্ট চাই। আরো কষ্ট" (Ahmed, 2009, p.92-4)।

রোকেয়া হলের মালী চুন্নু মিয়ার ৭বছর বয়সী সন্তান মোহাম্মদ শাহজালাল খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনীর হাত থেকে। তিনি স্মরণ করেন, পাক-বাহিনীর সেই হত্যাযজ্ঞের পর স্বজনদের আহাজারিতে হলের পরিবেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কর্মচারী-কোয়ার্টারের প্রত্যেকটি ঘরে মৃতদেহ ছিল। ২৭ তারিখ ২ঘণ্টার জন্য কারফিউ ছাড়া হলে শাহজালাল ক্যাম্পাসে নিজেকে নিরাপদ অনুভব না করায় তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম রুট দিয়ে মাতুয়াইল হয়ে কুমিল্লায় তাঁদের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। গিয়ে তাঁর মাকে তাঁর বাবার মৃত্যুসংবাদ দিলে তাঁর মা সাথে সাথেই জ্ঞান হারান। দিশেহারা এক অবস্থায় পড়তে হয়েছিল শাহজালাল ও তাঁর পরিবারকে (মো. শাহজালাল রচিত 'সেই দুঃস্বপ্নের রাত আজও আতঙ্কিত করে', *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ. ৪৬-৪৭-এ বিস্তারিত দেখুন)।

স্বজন হারিয়ে ভয় ও উদ্‌বেগশূন্য হয়ে ২৬শে মার্চ দিন পার করছিলেন ১৪ বছর বয়সী কিশোর মোহসীন (তাঁর পিতা রোকেয়া হলের প্রধান নিরাপত্তারক্ষী মনির উদ্দিন ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ হন)। ভোরে চাচার বাসা থেকে নিজ বাসায় ফিরে দেখেছিলেন, তাঁর মা, বোন, ভাবি সকলেই মৃত এবং ছোটো একটি ভাই গুলিবিদ্ধ। তাঁর দুই ছোটোভাই এবং বোনের ছেলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছিলেন। তিনি পানির সাথে চিনি মিশিয়ে তাঁদের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে মিলিটারি তাঁদের ঘরে পুনরায় হানা দিয়েছিল। মিলিটারি তাঁদের দিকে গুলি তাক করেছে। এমন মুহূর্তে অন্য আরেক সেনা সদস্যের থেকে অজানা এক বার্তা পেয়ে কাজে বিরতি দিয়ে অন্যদিকে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার ইশারা দিয়েছিল। মোহসীন তাদের এই ব্যবহারের মাঝে মানবতার এক দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু যন্ত্রণায় ও ক্ষুধার তাড়নায় তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। বিকেলের দিকে তাঁর গুলিবিদ্ধ ভাইটি মা ও বড়ো বোনের মৃতদেহের মধ্যেখানে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃতদেহের পাশে মোহসীন বাকি দুইটি শিশুকে নিয়ে ২৬শে মার্চের দুঃসহ রাত কাটান। ২৭শে মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়ার পর অবস্থা কিছুটা ঠিক হলে রোকেয়া হলের আরেকজন গার্ড আবুল মিয়া দরজায় নক করেন। মোহসীন পরিচয় নিশ্চিত হলে দরজা খুলেন। তিনি তাঁদের কার্জন হলে নিয়ে যান। এরপর তাঁরা সকলে মাতুয়াইলে তাঁর নানা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পায়ে হেঁটে পুরো পথ আসার সময় বহু মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন (Ahmed, 2009)।

মোহসীন ২৫ তারিখ রাতে যে আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুমাতে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন গিয়াসউদ্দিন দেওয়ান। পাকবাহিনীর স্টেনগানের সামনে থেকে কৌশলে ড্রামের ভেতর লুকিয়ে পড়ে ২৫শে মার্চ রাতে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন রোকেয়া হলের লিফটম্যান গিয়াস উদ্দিন দেওয়ান। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে কাটাতে হয়েছিল দুই রাত ও এক দিন। ২৬শে মার্চ রাতেরবেলা ড্রামের ভেতর থেকে মাথা একটু বের করে উঁকি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, হল এলাকায় মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি হচ্ছে। ২৭শে মার্চ সকাল আটটার দিকে যখন কারফিউ শিথিলের ঘোষণা শুনতে পান, তখন তিনি ড্রাম থেকে বের হয়ে আসেন এবং কোয়ার্টারের অন্যান্য রুমগুলোতে গিয়ে দেখতে পান নমী রায়-এর পরিবারের সকলে মারা গিয়েছেন। লিফটম্যান আহাম্মদ আলী ফরাজির লাশও তিনি দেখেছিলেন। গিয়াসউদ্দিনের আপন ভাই নাসিরউদ্দিনও ২৫শে মার্চ নিজ চায়ের দোকানেই অবস্থান করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তাঁর মৃতদেহও দেখেছিলেন সেখানে। এরপর তাঁর এক আত্মীয় এসে তাঁকে হল প্রাঙ্গণ থেকে নিয়ে বের হয়ে যান তাঁদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের দিকে (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

২৫শে মার্চ পাকিস্তানিদের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারানোর শঙ্কায় রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষিকাদের বাসভবনের খোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন নৈশপ্রহরী হাবুল মিয়া। ২৭শে মার্চ সকালে কারফিউ তুলে নেওয়ার ঘোষণা শোনার আগ পর্যন্ত তিনি সেই খোপেই ছিলেন। কারফিউ শিথিলের কথা শুনে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং হলের তৎকালীন প্রভোস্ট আখতার ইমাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁরা যেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেন। হল থেকে একেবারে বের হওয়ার পূর্বে তিনি একবার রোকেয়া হল স্টাফ-কোয়ার্টারে যান। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর চাচা চুন্নু মিয়াকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন।

কোয়ার্টারের দরজা-জানালাগুলো গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘরগুলোর ভেতরে রক্তের দাগ কালো হয়ে লেগেছিল। সেখানে তাঁর সাথে দেখা হয় আলী আক্কাসের। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, "হাবুল রে আমার সব মাইরা ফালাইছে।" স্ত্রী ও চার সন্তানকে হারিয়েছেন আলী আক্কাস। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকা ফুলবানু বেগমকে টেনে তুলে হলগেট পর্যন্ত নিয়ে যান হাবুল মিয়া। এরপর কিছু স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র এসে ফুলবানু বেগমকে সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। হাবুল মিয়া জানান "ঐ রাতে খালি হলের স্টাফ তনু মিয়া ও তাঁর বউ পেছন দিয়ে জানালা ভেঙে পালাতে পারছিল। তাই তনু ও তাঁর বউ বেঁচে গেছে। বাকিরা কেউ বাঁচতে পারে নাই।" নিজের প্রাণ বাঁচানোর দায়ে হাবুল মিয়া অতি দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ২৭ তারিখই তিনি গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে পড়েন। পায়ে হেঁটে পৌঁছান ডেমরা পর্যন্ত। এই যাত্রাপথে আরো হাজার হাজার মানুষকে দেখেছিলেন ঢাকা ত্যাগ করতে। পথিমধ্যে বহু মানুষ তাঁদেরকে গুড়-মুড়ি ও পানি খাইয়েছিলেন। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কখনো নৌকায়, কখনো হেঁটে দাউদকান্দির মোহাম্মদপুরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাতটি কেটে যাওয়ার পর ছাব্বিশ মার্চ ভোরের দিকে রোকেয়া হলের কর্মচারী মান্নানের সাথে দেখা হয় তনু মিয়ার। সেখানে অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং হাউস-টিউটর কোয়ার্টারে দিকে যান। ছাব্বিশ মার্চ হলের চামেলি ভবনের পাশের কমন-রুমের একটি কোনায় অবস্থান করেছিলেন তনু মিয়া ও তাঁর পরিবার। রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ আখতার ইমাম যখন ছাব্বিশ তারিখে কর্মচারীদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন, তখন তনু মিয়া ও তাঁর পরিবারের কথা জানতে পেরে অন্য একজনের মারফতে তিনি তাঁর নিজ অফিসের চাবি পাঠিয়ে দেন। তনু মিয়া এবং তাঁর পরিবারকে অফিসের পেছনে অন্ধকার একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতে বলেন। অফিসের তালা বন্ধ করে চাবি প্রাধ্যক্ষকে দিয়ে দিতে বলেন। তনু মিয়া ছাব্বিশ তারিখে প্রাধ্যক্ষের অফিসেই থাকেন এবং সেখান থেকে বের হতে পারেনি বিধায় পানি ছাড়া কিছুই খেতে পাননি। এই ঘরে উনার সাথে আরো অনেকেই ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম জানা যায় তনু মিয়ার ভাষ্যে। তাঁরা হলেন, হাসিনা হাফিজ, রওশন আরা ও তাঁদের বাবা নেওয়াজ আলী, মালী আব্দুল খালেকের স্ত্রী ফুলবানু ও তাঁর সন্তান হারুন এবং আলী আক্কাস প্রমুখ। সাতাশ তারিখ কারফিউ উঠিয়ে নেওয়ার খবর

পেলে তাঁরা দ্রুত রোকেয়া হল থেকে বের হয়ে জগন্নাথ হল দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসেন। বেরোবার পথে তনু মিয়া রোকেয়া হল ক্যান্টিনের রান্নাঘরের কাছে একজন কর্মচারীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। এই মৃত ব্যক্তিই সে, যাকে তিনি এই ঘটনার আগের দিন জল পান করিয়েছিলেন। জগন্নাথ হল দিয়ে বের হয়ে সোজা সদরঘাট চলে যান তনু মিয়া ও তাঁর পরিবার। নৌকা দিয়ে নদী পার হন। প্রথমে গজারিয়া টার্মিনাল এবং সেখান হতে কিশোরগঞ্জের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য রওনা হন (কামাল, ২০২২)।

২৫শে মার্চ সারারাত কাটাবন খালে ভয়, আতঙ্ক নিয়ে পার করেছিলেন এস্টেট অফিসের পিয়ন মো: আব্দুল হাই। ২৬শে মার্চ সকাল হতেই তিনি আর কাঁটাবন অবস্থান করা নিরাপদ মনে করছিলেন না। তাই তিনি চলে আসেন ইন্টারন্যাশনাল ছাত্রাবাসে। তাঁর ভাষ্যমতে, "যেহেতু ঐ হলে বিদেশি ছেলেরা থাকতো, তাই মিলিটারি বাহিনী সেখানে আক্রমণ করেনি।" আশ্রয়ের জন্য এই হল নিরাপদ জেনেই তাঁরা শুক্রবার, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ দিন-রাত সেখানে অবস্থান করেন। সাতাশে মার্চ সকালবেলা কারফিউ উঠিয়ে নিলে ইন্টারন্যাশনাল হলে ঐ রাতে আশ্রয় নেওয়া অন্যান্যরা সকলে সেখান থেকে বেরিয়ে যে যার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েন। আব্দুল হাই তখন ছুটেন রোকেয়া হলের দিকে আলী আক্কাসের পরিবারের খোঁজ নেওয়ার জন্য। ভেবেছিলেন তাঁদের সকলকে নিয়ে গ্রামের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু এসে দেখেন আলী আক্কাসের দুই মেয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ শুকিয়ে লেগে আছে। একজনের কাছে বাকি সদস্যরা কোথায় জানতে চাইলে তিনি উত্তর করেন, "সব শেষ, মেরে ফেলেছে।" ঐসব লাশগুলোকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল বর্তমান শামসুন্নাহার হলের গেটের সামনে। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ দেখে আব্দুল হাই মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনোক্রমে তিনি সেখান থেকে কাটাবনে নিজ বাসস্থান পর্যন্ত পৌঁছান। স্বজনরা আলী আক্কাস ও তাঁর পরিবারের কথা জানতে চাইলে তিনি "নাই, সব শেষ" এই বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরিবারের লোকজন তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে তাঁকে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। পরে তাঁরাও বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০, পৃ. ৫৩-৫৪)।

যে পরিবারের জন্য মো.আব্দুল হাই ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই পরিবারের একজন ব্যতিরেকে বাকি সবাই শহিদ হয়েছিলেন ২৫শে মার্চের পাকবাহিনী পরিচালিত

হত্যাযজ্ঞে। বেঁচে যাওয়া সদস্যটি হলেন রোকেয়া হলের তৎকালীন দারোয়ান স্বয়ং আলী আক্কাস। আলী আক্কাস তাঁর পরিবারের সবাইকে হারিয়েছিলেন সেই রাতে। আর নিজে ঐসময় অবস্থান করছিলেন মুন্সীগঞ্জের মতলব গ্রামে এবং তাঁর পরিবার ছিল রোকেয়া হল কোয়ার্টারে। ২৫শে মার্চের পরে, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ শুক্রবারে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ২৫শে মার্চ রাতে তাঁর পরিবারের উপর পাকবাহিনী আক্রমণ করে। তাঁর পরিবারে ছিল তিন মেয়ে, দুই ছেলে এবং তাঁর স্ত্রী। ঐ রাতে তাঁর ছেলে তাঁর পাশের রুমে ছিল। তাঁর পরিবারের উপর রাত পৌনে একটার সময় আক্রমণ করা হয় এবং সেই আক্রমণে তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়। কাকতালীয়ভাবে তিনি সেদিন তাঁর গ্রামে গিয়েছিলেন। খবর শুনে তিনি গ্রামের বাড়ি থেকে হলে ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর মেয়ে দু'জন কোলাকুলি করে ঘরের এক কোণে শুয়ে আছে। খাটের উপর মশারি টাঙানো ছিল। তাঁর ছেলে-মেয়েরা প্যান্ট পরা অবস্থায় ছিল। তাঁর বড়ো ছেলের বয়স ছিল সাড়ে তিন বছর এবং ছোটো ছেলের বয়স ছিল দেড় বছর। তাঁর ধারণা পাকবাহিনী দরজায় ঢুকার সাথে সাথে তাঁদের গুলি করেছে। ২৬শে মার্চ সেদিন হারুন নামের একজনের একটি বাচ্চা ছিল। সে বাচ্চাটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বলে, "আমাকে বাঁচান।" তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কথা জানা যায়। তার ভাষ্য মতে, তখন অনেক ঠাণ্ডা ছিল, কোনো সাড়া-শব্দ ছিল না, কোনো কথাবার্তা নাই, কোনো যোগাযোগ নাই। রাস্তায় এখানে সেখানে লাশ পড়েছিল। তিনি দেখেন, অনেক লাশ পুঁতে রাখা অবস্থায় ছিল। তাঁর পরিবারের সবাইকে শামসুন্নাহার হলের গেটের দিকে পুঁতে রাখা হয়েছিল। তারপর যখন বিভিন্ন লাশ গর্ত থেকে উপরে তোলা হচ্ছিল, তখন একজনের শাড়ি, একজনের ঘড়ি পাওয়া যাচ্ছিল। আলী আক্কাসের স্টাফের ভাই ছিল দোকানদার, তাঁর পরনে ঘড়ি ছিল। আবার মইনুদ্দিন নামের একজনের বউয়ের হাতে চুড়ি পরা অবস্থায় ছিল। আলী আক্কাস তখন তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর দুই ছেলে, তিন মেয়ে, তাঁর স্ত্রী এবং পাশের ঘরে একটা ছেলে ছিল; তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা মশারির ভেতরে ছিল আর সেই মশারিটি ছিল নতুন। পুরো মশারিটি ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাঁর ভাষ্যমতে, পাকবাহিনী তাঁর পরিবারকে দরজা থেকে গুলি করে মারছে। ঘরের ভেতরে যেতে হয়নি। তাঁর দুইটা বাচ্চা কোলাকুলি অবস্থায় পাশ্চিম পাশে এক কোণে ছিল। আবার এই আক্রমণে অনেকে অনেকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। যেমন মইনুদ্দিনের ছেলে মোহসীন। পাকবাহিনীকে যখন তিনি বলেছিলেন বাচ্চাটাকে না মারার জন্য, তখন তারা বাচ্চাটাকে আর মারেনি। ২৭

তারিখে তিনি যখন মুন্সিগঞ্জ চলে যান, তখন পথিমধ্যে অনেক ঘটনা দেখতে পান। কত মানুষ কত মানুষকে সাহায্য করেছে। আবার কত মানুষ মারা গিয়েছে। এসব দেখে তিনি অনেকদিন কিছু খেতে পারেননি। মুন্সিগঞ্জে যাওয়ার পথে তিনি দেখেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন (আলী আক্কাস - ১৯৯৭ সালে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

মিলিটারির আক্রমণের অন্যতম আরেকটি লক্ষ্য ছিল রোকেয়া হল। জগন্নাথ হলের কর্মচারী মোহন রায়ের বক্তব্যে রোকেয়া হলের সামনের ২৬শে মার্চের চিত্রের সামান্য প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। মিলিটারি মোহন রায়কে ত্রিপলি দিয়ে ঢেকে রাখার সময় তিনি যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেই অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে পান ২৬শে মার্চ সকাল ৮:৩০-এর দিকে। তখন রোকেয়া হল থেকে একজন সাহায্য প্রত্যাশীর চিৎকার শুনতে পাওয়া যায়। তিনি তখন ত্রিপলি থেকে বের হয়ে ওঠে তাঁর শ্যালক শঙ্করের জীবিত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেন। তখন মিলিটারি জগন্নাথ হলের খেলার মাঠের দিকে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে রোকেয়া হলের দু'জন স্টাফ এসে তাঁদেরকে কাঁধে করে নির্মাণাধীন শামসুন্নাহার হলের বিল্ডিংয়ে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু মোহন রায় সেখানে বেশিক্ষণ না থেকে বেরিয়ে পড়েন রোকেয়া হলে ঢোকার উদ্দেশ্যে। প্রবেশ মুহূর্তে তিনি বোধিরাম, মোহন রাজভরের পানি পিপাসু আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে যান। বোধিরাম বাথরুমের ট্যাংক থেকে নিজের হাতে পানি খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এত সবকিছু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোহন রায় ছিলেন নির্বাক। শারীরিক যন্ত্রণা, স্বজন হারানোর মানসিক আঘাতে তিনি নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। বোধিরামের মৃত্যুর পর মোহন রাজভরকে অনুসরণ করে। তিনি শিক্ষক কলোনির দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় মোহন রায় রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ আখতার ইমামের বাসায় গিয়েছিলেন। প্রাধ্যক্ষ তাঁর রক্তে ভেজা শরীর দেখে নমী রায় জীবিত আছে কি না তা জিজ্ঞেস করছিলেন। নির্বাক মোহন রায় হাতের ইশারায় বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, নমী রায় মৃত। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তিনি ক্যাম্পাসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছিলেন। বিকেল তিনটার দিকে ফুলার রোডের দিকে তিনি শিক্ষকদের বাসার দিকে রওনা হন। তাঁর পরনের শার্টের রক্ত শুকিয়ে গেছে। ততক্ষণে তাঁর পা থেকে গড়িয়ে তখনও রক্ত ঝরছিল এবং চুল শিংয়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁর এই অবস্থা দেখে তিনি যার বাসায় সে সময় গিয়েছিলেন, সেই 'স্যার' (সাক্ষাৎকারদাতার ভাষ্যে) ভয় পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর (স্যারের) কাছ থেকে তাঁর পরিবার সম্বন্ধে

জানলেন এবং মোহনকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তাঁর প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা শুরু করলেন। তৃষ্ণার্ত মোহন পানি পানের আকুতি জানালে 'স্যার' তাঁকে পানি দিতে নিষেধ করেন এই বলে যে, এখন পানি পান করলে মোহন মারা যেতে পারেন। স্যার তাঁকে বালিশ পেতে দেন এবং ঘুমোতে বলেন। ২৭শে মার্চ সকালে স্যার মোহনকে দশ টাকা দেন এবং ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে গিয়ে পা থেকে গুলি সারাতে বলেন। কিন্তু পঁচিশ ও ছাব্বিশ মার্চ হানাদারদের তাণ্ডবের পর ক্যাম্পাসের কোনো কিছুই আর স্বাভাবিক ছিল না বিধায় রাস্তায় রিকশা বা যানবাহন কিছুই দেখতে পাননি মোহন। অতএব দু'জন সাইকেল চালকের সাহায্যে হাসপাতাল পর্যন্ত যান এবং তাঁর চিকিৎসা সম্পন্ন করেন। এক রাতে মোহন তাঁর পুরো পরিবারকে হারিয়েছে – তাঁর স্ত্রী, তাঁর চার সন্তান, তাঁর শ্বশুর এবং শাশুড়ি। কয়েকদিন পর তাঁর শ্যালক শঙ্করও মারা যান (Ahmed, 2009)।

২৫শে মার্চের পাকবাহিনীর গোলাগুলিতে আতঙ্কিত হয়ে সারারাত সিঁড়িঘরে কাটিয়েছিলেন আমির হোসেন ও তাঁর পরিবার। ২৬ তারিখ পাকবাহিনীর তৎপরতা কিছুটা কমে এলে এবং ২৭ তারিখে কারফিউ ছেড়ে দেওয়ায় আমির হোসেন তাঁর বন্ধু সুভাষকে নিয়ে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি জানতে বের হন। প্রথমেই তাঁরা জহুরুল হক হলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, হলের টিভিরুমে দুইজন ছাত্র মৃত অবস্থায় পড়ে আছে আর চারপাশে রক্তের ছড়াছড়ি। জহুরুল হক হল থেকে বেরিয়ে তাঁরা জগন্নাথ হলে যান। আর সেখানে গিয়ে দেখেন হলমাঠে ট্যাংক দিয়ে মাটি উঠিয়ে বহু মানুষকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। সেই মাটির ভেতর থেকে নানান দিক দিয়ে হাত-পা বের হয়েছিল। হঠাৎ একটা হাতের দিকে চোখ পড়তেই আমির হোসেনের মধুদা'র কথা মনে পড়ে যায়। কারণ যেই হাতটি মাটি থেকে বেরিয়ে ছিল, সেই হাতটিতেও মধুদা'র মতো আংটি পরিহিত ছিল। আমির হোসেন ও তাঁর বন্ধু তখনই মধুদা'র খবর জানার জন্য তাঁর (মধুদা) বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মধুদা'র বাসায় পৌঁছে দেখেন তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও ছেলের বউ (গর্ভবতী ছিলেন) সকলে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁরা। দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে রওনা দেন কলাভবনের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখা হয় তাঁর আরেক বন্ধু তোফাজ্জল হোসেনের সাথে। আমির হোসেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "কী করবা তুমি এখন?" তোফাজ্জল হোসেন জানান যে তিনি বাড়ি চলে যাবেন। তখন আমির হোসেন তাঁকে বলেন, "তুমি যে বাড়ি চইলা যাইবা আমরা তো বেতন টেতনও পাই নাই,

কিছু না, আমার কাছে টাকা নাই। তোমার কাছে টাকা থাকলে আমারে কিছু টাকা দাও।” তোফাজ্জল হোসেন তখন তাঁকে বলেন, “আমার কাছে ৬ টাকা আছে। তুমি ৫ টাকা নাও।” তাঁর কাছ থেকে ৫ টাকা নিয়ে আমির হোসেন তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে তৎকালীন ভিসি বাংলোর সামনের একটি গাছে একজন লোককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এর একটু সামনে নীলক্ষেতের দিকে যেতে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস-এর বারান্দায় আরো দু'জন লোকের লাশ দেখতে পান। এ সকল পরিস্থিতি তাঁকে আরও শঙ্কিত করে তুলে। বাসায় পৌঁছেই জানতে পারেন, কোয়ার্টারে অন্যান্য পরিবার জিঞ্জিরায় চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সেই এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার মতো আমির হোসেনের কোনো পরিজন ছিল না। তাই তিনি আরো চিন্তিত হয়ে বলেন যে, “জিঞ্জিরায় তো পরিচিত কেউ নাই, কোথায় যাব, গিয়া কি করব।” তখন বাকিরা বলেছিলেন, “চলো, গেলেই একটা ব্যবস্থা হইবো।” প্রতিবেশীদের এই কথার উপর ভরসা করেই আমির হোসেন তাঁর মা ও তিন বোনকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আজিমপুর স্টাফ-কোয়ার্টার হতে বের হন এক অজানার উদ্দেশ্যে (আমির হোসেন, যোগাযোগ-স্থান: কলাভবন কমনরুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময়- দুপুর ২.৩০টা, তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য ২৫শে মার্চ রাতে নিজের বাসস্থান মধুর ক্যান্টিন ছেড়ে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মনির হোসেন বাচ্চু। বাথরুমের সামনে অল্প একটু জায়গায় কোনোরকম দাঁড়ানোর জায়গাটুকু পেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ রাতের দিকে লোকমুখে শুনতে পান তাঁর প্রিয় মধুদা'র মৃত্যু-সংবাদ। তাই ভোর হওয়ার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়েন মধুদা'র বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তায় তখন মিলিটারির গাড়ি চলাচল করছিল একটু পরপর। মনির হোসেন বলেন, “আমি তখন রমনা রেসকোর্স ময়দান হয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বাংলা একাডেমি দিয়ে উনার বাসায় পৌঁছাই। গিয়ে দেখি সবাইকে মেরে ফেলেছে।” শেষবারের মতো দেখতে পাননি মধুদা'কে। মনির হোসেন মধুদা'র বাসায় পৌঁছানোর আগেই মিলিটারি এসে মধুদা'র লাশ জগন্নাথ হলে নিয়ে গিয়েছিল। মধুদা'র কন্যা রানুকে গুলিবিদ্ধ এবং আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন তিনি। মনির হোসেন শিববাড়ি এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে ধরাধরি করে রানুকে ঢাকা মেডিক্যালের ইমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে ভর্তি করান। রানুর বুকে একটা গুলি একপাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়েছিল। আর আরেকটা গুলি লেগেছিল তাঁর চোয়ালে। রানুকে হাসপাতালে ভর্তি

করিয়ে দিয়ে মনির হোসেন চলে যান শাঁখারীবাজারে মধুদা'র বড়ো মেয়ের বাসায়, তাঁদেরকে হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানাতে। এরপর তাঁদের সকলকে নিয়ে তিনি চুনকুইট্টা নামক স্থানে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসেন ঢাকা মেডিক্যালে। হাসপাতালে তখন রব উঠে যে, হাসপাতালে যত আহত ব্যক্তি ভর্তি আছে, তাঁদেরকে হানাদার বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে যাবে, যাতে করে গণমাধ্যমে কিছু প্রকাশিত না হতে পারে। এই খবর শোনার পর হাসপাতালে অবস্থানকৃত সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মনির হোসেন অতি দ্রুত রানু রায়কে সাথে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে চুনকুইট্টার (যেখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছিল) উদ্দেশ্যে রওনা হন। অন্যদিকে মধুদা'র ছোটো ছেলে-মেয়েদেরকে মধুদা'র আরেক সহকর্মী হীরালাল তাঁর কাছে নিয়ে রেখেছিলেন (মনির হোসেন বাচ্চু, বয়স: ৭৫ যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়- দুপুর ২টা, তারিখ: ১২/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)

২৬শে মার্চ দিনটি ছিল মধুর ক্যান্টিনের গোপাল দাসের জীবনে অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে পার করা একটি দিন। ২৫শে মার্চ রাতটি তিনি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে অবস্থান করে পার করেছিলেন। ২৬শে মার্চ সকাল হলে গোপাল ভেবেছিলেন সারারাত ধরে যেহেতু গুলি চলেছে, তাহলে সকালবেলা আর গোলাগুলি হয়তো পাকিস্তানিরা চালাবে না। ক্ষুধার তাড়নায় সকালে ভালোভাবে হাঁটতেও পারছিলেন না। সেই অবস্থায় তিনি তখন মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে দুইটি ওরিয়েন্ট রুটি নিয়ে খেতে বসেছিলেন। মুহূর্তেই হানাদাররা দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। তখন ক্যান্টিনের ভেতরে যারা ছিল সকলকে উদ্দেশ্য করে তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা শুরু করে। এইসময় গোপাল ক্যান্টিনের পেছনে থাকা একটি ড্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েন। ড্রামটি ছিল মূলত একটি ভুসির ড্রাম (গরুরখাবার)। মিলিটারি বুঝতে পারেনি যে, ড্রামের ভেতরে তিনি লুকিয়ে আছেন। ক্যান্টিন থেকে চলে যাওয়ার আগে তারা ড্রামটিতে জোরে লাথি দিয়েছিল। এটি তখন ঘুরতে থাকে। ভেতরে থাকায় গোপালের ও মাথা ঘুরছিল এবং সেখানে আতঙ্কের মধ্যে তিনি প্রস্রাব করে ফেলেছিলেন। এরপর বেলা বারোটার দিকে ড্রাম থেকে বেরিয়ে গোপাল ছুটে যান প্রিয় মধুদা'র খোঁজ নিতে। যাত্রাপথে মাজারের খাদেমের ছেলে মান্নান সাইকেলে করে ছুটছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মিলিটারি আসার খবর পেয়ে গোপাল মান্নানেরই সাইকেলে চেপে বসেন। মান্নান বাংলা হিন্দি মিলিয়ে কথা

বলতেন। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারতেন না। মিলিটারির গাড়ির সামনে পড়ে যাচ্ছেন দেখে তিনি (মান্নান) দ্রুত সাইকেলের মোড় ঘুরাতে চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁরা সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যান। গোপাল ভান ধরেন আহত হওয়ার, যাতে মিলিটারি তাঁদেরকে গুলি না ছুঁড়ে। যাইহোক, মিলিটারির গাড়ি চলে যাওয়ার পর গোপাল ছুটে যান মধুদা'র বাড়ির দিকে। সেখানে সিঁড়িতে তিনি ছোপ ছোপ রক্তের দাগ প্রত্যক্ষ করেন। কাউকে না পেয়ে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী তোতা মিয়ার কাছে মধুদা'র খোঁজ জানতে চান। তোতা মিয়া তাকে জানান, "এই যে দেখস না সব মালের উপর। মধু কো মারকে গঙ্গা মে ফেক দিয়া, তুম কো ভি মারকে গঙ্গা মে ফেক দেগা।" মধুদা'র বাড়ি থেকে ফেরার পথে গোপাল জগন্নাথ হলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেরেছিলেন কীভাবে মিলিটারি ট্যাংক দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল, আর সেই মাটি দিয়ে কীভাবে লাশভর্তি গর্তগুলো পূরণ করছিল। সেই অবস্থা অবলোকন করে গোপাল তাঁর আবাসস্থলে ফেরত আসেন। হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে অনেকেই তখন গোপালকে ঢাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে। এই সময় তাঁর যাত্রা, যাত্রাপথে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং অন্যান্যদের করা সহযোগিতার ব্যাপারে গোপাল উল্লেখ করে বলেন যে, মাসের শেষ হওয়ায় হাতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। মধুর ক্যান্টিন থেকে এক কৌটা ওভালটিনে চিনি মিশিয়ে সাথে নিয়েছিলাম রাস্তায় খাওয়ার জন্য। ২৭ তারিখ বিকেলবেলা আমরা রওনা হই। রাস্তায় সর্বত্র লাশ আর রক্তের দাগ। বুড়িগঙ্গার তীরে পৌঁছে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বউ-বাচ্চা সবাই অপেক্ষা করছে। সেখানে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট অফিসের পিয়ন ধীরেন দা'কে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা কী অবস্থা শরীরের, সব আত্মীয়-স্বজনের?" তখন উনি ফুপিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আমরা সবাই গিয়ে নৌকায় উঠলাম। নৌকায় বড়ো-ছোটো সকল বয়সী মানুষ, বাচ্চাদের খেলনায় গিজগিজ করছিল। আর্মিও ছিল ওখানের একটু দূরে। ওরা গোলাগুলি করতে করতে আসছিল। নদীর ওপারে আমরা জিঞ্জিরায় গিয়ে উঠলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম বহু ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনদেরকে খাবার দিচ্ছে। চিড়া, গুড় বিতরণ করছিল তাঁরা। "তখন মানুষের যে ভক্তি, মানুষের যে আন্তরিকতা, অন্যরকম ছিল। এখন তো.....(কান্না)।" (গোপাল দাস, যোগাযোগ-স্থানঃ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়- সকাল ১০টা, তারিখঃ ৩০/১০/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী শহিদ আহমদ আলী ফরাজীর ছেলে মোঃ মোশারফ ২৫শে মার্চ সকালবেলায় বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিনি একা একা ঐদিন বাড়ি চলে যান। বাড়ি যেতে যেতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে যায়। তাঁর মা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঢাকার কী অবস্থা? ঢাকায় মিলিটারির আক্রমণের খবর পেয়ে পরের দিন ২৬শে মার্চ বাড়ি থেকে তিনি আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ঢাকায় তিনি তাঁর চাচার সাথে এসেছিলেন। যদিও তাঁর চাচা তাঁকে সাথে আনতে চাচ্ছিলেন না। ২৭শে মার্চ তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসে দেখেন এক ভয়ানক চিত্র। তিনি বলেন, "স্টাফ কোয়ার্টারে এসে দেখি লাশ মাটিচাপা দেওয়া। কারো হাত-পা দেখা যায়, কারো চুল দেখা যায়। শরীরের রক্ত ফ্লোরে ছিল। এই অবস্থা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।" তিনি আরো দেখতে পান যে, নদীর পাড় দিয়ে মানুষ বের হচ্ছে কেরানীগঞ্জের দিকে। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেন, তখন দেখতে পান যে একজন মানুষ ছুটাছুটি করছেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বাবা কোথায়? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে তোমার বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এই কথা শোনার পর আবার তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তিনি তাঁর বাবার দাফন দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশা করছিল। কিন্তু তা আর সুযোগ হয়নি। তিনি ২৭ তারিখ সকালবেলা তাঁর চাচার সাথে গ্রামের বাড়ি চলে যান। তাঁর বাবাসহ রোকেয়া হলে সব কর্মচারীকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাঁর মধ্যে নমী রায়ের পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল। মোশারফ হোসেন আরো উল্লেখ করেন নেছারদ্দিন নামের একজন ব্যক্তির নাম যিনি অনেক লাশের মতো তাঁর বাবার লাশও চিহ্নিত করতে পারেনি। ঐদিনের অভিজ্ঞতায় আরো বলেন যে জগন্নাথ হলের জিসিদেবকে অন্য জায়গায় নিয়ে হত্যা করা হয়। টিএসসিতেও লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানেও অনেকগুলো গর্ত করা হয়েছিল (মো. মোশারফ, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়- সকাল ১০টা, তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)।

৩.২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, ২৬শে মার্চ ১৯৭১, সকাল ও তার পরবর্তী কয়েকদিন – পর্যালোচনা

৩.১ এ উপস্থাপিত বক্তব্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর সকাল ও পরবর্তী কয়েকদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ করে কর্মচারীদের মরদেহ ছড়িয়ে ছিল।

খ. পাকিস্তানি সৈন্যরা কোথাও কোথাও মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে বের করে এমন কথাও বক্তব্যে এসেছে।

গ. উর্দু জানা এবং কয়েকটি বিশেষ পেশার (ঝাড়ুদার, ধোপা, মুচি) মানুষকে পাকিস্তানি বাহিনী মারবে না এমন কথা প্রচলিত হয়েছিল। কোনো কোনো কর্মচারী এই পেশার মানুষ হওয়ার ভান করেছিলেন।

ঘ. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পরিবারের সদস্যদেরকে, নিজ সন্তানদেরকে দেখে রাখা, মৃতপ্রায় অবস্থায়ও পরিজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

ঙ. হিন্দি জানা মাড়োয়ারি মহিলার (সম্ভবত মানসিক অসুস্থ) প্রতিবাদ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

চ. লাশ-টানা ও লাশ গর্তে ফেলার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ব্যবহার করা হযেছে। লাশটানার গ্রুপকে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী এই দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল।

ছ. গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাঁরা পৌঁছাতে পেরেছিলেন, কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্সরা তাঁদের সাধ্যমতো সেবা প্রদান করেন। তবে মৃত্যু ঘটলে ডেথ সার্টিফিকেট না দিতে চাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

জ. হাসাপাতালে ২৫শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ আহতদের খোঁজে পাকিস্তানি সেনারা আসতে পারে এমন কথা শোনা গিয়েছিল।

ঝ. বিপদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও অসহযোগিতা পাওয়ার উভয় ধরনের উদাহরণ পাওয়া গেছে আহত ও বিপদগ্রস্ত কর্মচারীদের বক্তব্য থেকে।

ঞ. পাকিস্তানি সেনারা কোনো কোনো কর্মচারীর দিকে গুলি তাক করেও শেষ মুহূর্তে গুলি না করার ঘটনারও উদাহরণ পাওয়া গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অবরুদ্ধ থেকে বিজয় পর্ব

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ, এক বৃহস্পতিবার যেখানে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের সূচনা হয়; তেমনি আরেক বৃহস্পতিবার, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, সে সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। তবে মধ্যবর্তী নয়মাস এই ভূখণ্ডের মানুষের শোকগাঁথা এক জীবনের ইতিহাস। প্রতিনিয়ত স্বজন হারানোর বেদনা অথবা প্রিয়জন হারানোর উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করা মানুষগুলোর কাছে এ নয়মাস কেবল কিছু দিনের সমষ্টি নয়, বরং তাদের কাছে এটি ছিল জীবনের দুঃস্বপ্নময় অধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনেও এই নয়টি মাস ছিল দুঃস্বপ্নের মতোই। পরে ডিসেম্বরে বিজয়ের মাধ্যমে অবরুদ্ধ জীবনের সমাপ্তিতে তারাও পেয়েছেন মুক্তির আনন্দ। তবে সেই আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যেও মনের গহীন কোণে ছিল স্বজন হারানোর বেদনা।

পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছিল ঢাকা শহরের নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালির উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ঢাকায় আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর হলগুলো। এছাড়াও রাজারবাগ পুলিশ লাইন, শাখারিবাজার, পিলখানা, ধানমন্ডি, হাজারিবাগ, গুলশানসহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে। খুব দ্রুতই পুরো ঢাকা শহর পাক বাহিনীর দখলে চলে যায়। বিদেশি পত্রিকাগুলো যুদ্ধ চলাকালীন নয়মাসে ঢাকার পরিস্থিতি তুলে ধরে "ঢাকা শহর বন্দী শিবিরে পরিণত" এই শিরোনামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা এবং ২৫শে মার্চে শহিদ হওয়া কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অবরুদ্ধ নয়মাস কীভাবে কাটিয়েছেন তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে যুদ্ধ পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তাঁদের সাক্ষাৎকারে। তাদের 'অবরুদ্ধ' জীবন-অভিজ্ঞতার সাথে সামরিক শাসকের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে জারি করা বিভিন্ন আদেশ-বিজ্ঞপ্তিও রেখেছে নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব।

৪.১. ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কয়েকটি উদ্যোগ ও কর্মচারীদের জীবন-যাপন

গণহত্যার কবল থেকে বেঁচে যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অনেকে প্রাণরক্ষার তাগিদে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে আবার ক্যাম্পাসে ফেরতও এসেছিলেন কয়েকজন কর্মচারী। কেউ ফেরত এসেছিলেন আর্থিক ভোগান্তি/দুর্ভোগ দূর করার জন্য; কেউ আসতেন বরাদ্দকৃত মাসিক বেতন নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কেউ কেউ এসেছিলেন ক্যাম্পাসকে নিরাপদ প্রাঙ্গণ হিসেবে অনুধাবন করে। যারা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেননি এবং যারা পরে আবার ফেরত এসেছিলেন তাদের যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষজনের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটাই ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত কর্মচারীদের অনেকটাই 'অবরুদ্ধ' জীবনযাপন করতে হয়েছে। এসময় সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি জারি করেছিল বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা। ১৯৭১ সালের মে মাসে পাকবাহিনীর প্রত্যক্ষ তৎপরতার বিশ্ববিদ্যালয় 'পরিষ্কার' করার নামে বিভিন্ন হলে নির্মিত শহিদ মিনার ধ্বংস করা হয়। এসময় আবাসিক হলগুলোর নিরাপত্তা প্রহরীরা প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন (চক্রবর্ত্তী,২০২১)।

ঐ মাসের শেষাংশে সামরিক সদস্যরা 'মধুর ক্যান্টিন' ভেঙে ফেলার প্রয়াসও নিয়েছিল। পরে এটির 'ঐতিহাসিক' গুরুত্ব বিবেচনায় তা করা থেকে তারা বিরত থাকে (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০শে জুন, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে যোগদানে অসমর্থ হয়েছিলেন তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়, বঞ্চিত করা হয় প্রফিডেন্ট ফান্ড ও আবাসিক সুবিধা থেকেও। লক্ষ্যণীয় যে, বাদ পড়াদের তালিকায় ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ হওয়া কর্মচারীদের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগস্ট মাসের ২ তারিখ থেকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় চালু করার নির্দেশ জারি করেছিল। আগস্ট মাসের শুরুর দিকে সামরিক সরকার ঢাকা শহরের প্রতিটি সরকারি ও আধা-সরকারি

প্রতিষ্ঠানের কার্মচারীদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন তাদের সন্তানদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। এই নির্দেশনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রদান করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কয়েকজন সরকারি কর্মচারী সাহায্যপূর্ণ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে উল্লেখ করে তাদের তৎপরতাকে দেশদ্রোহীতার সাথে তুলনা করা হয়। এমন কর্মচারীদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে চিঠি মারফত সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়, যার অনুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছালে কর্তৃপক্ষ তা বিভাগের সকলকে অবগত করেছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যে ৫২ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের আদেশ প্রদান করেছিল, তাদের মধ্যে কর্মচারীদের নামও অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে নভেম্বরের ৭ তারিখে রোকেয়া হলে 'ডাকাতি'র ঘটনা ঘটে। সামরিক বাহিনীর কড়া টহলদারির মাঝেও এমন ঘটনার পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। তবে পুলিশ এই ঘটনার জন্য ঐ হলের কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে সন্দেহপূর্বক গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায়। আটককৃতদের মধ্যে ছিলেন দারোয়ান আবদুল কুদ্দুস, হাবুল মিয়া এবং সুইপার পিয়ারী লাল। একজন ছিলেন তার গ্রামের বাড়িতে; যেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপরে স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত তারা জেলে বন্দি-জীবন অতিবাহিত করেছেন (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

এরমধ্যে নভেম্বরের ১৭ তারিখ রমজান মাসের এক দুপুরে মিলিটারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে প্রবেশ করে। এসময় হলে অবস্থানকারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩০-৩৫। কয়েকজন কর্মচারীও থাকতো। তারা মূলত হলে অবস্থান করাকেই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে করেছিল। মিলিটারি এদের মধ্য থেকে সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদসহ আরও দুজন ছাত্র এবং হলের একজন কর্মচারীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল জিপে করে (আহমেদ, ২০১৭)।

আরেকটি ঘটনা হলো, ২৫শে নভেম্বর কারফিউ জারি করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়া। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অপরাহ্নের শুরুতে অনুমতি না নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করে। এমন

ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য শাস্তি উল্লেখপূর্বক একটি নোটিশ প্রদান করেছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের গতিপথে তখন আমূল পরিবর্তন ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন আবাসিক হলগুলোর প্রভোস্টদের নিয়ে একটি সভা করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সকল বিভাগের প্রধানকে কর্মচারী ও শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট জমাদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়; বিশেষত অনুপস্থিত শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাপারে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'গর্ভনরের যুদ্ধ তহবিল'-এ অনুদান হিসেবে অর্থ প্রেরণের জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি কর্মচারীরা মাসিক বেতনের ১% প্রদান করতে ইচ্ছুক কি না তা জানতে চাওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যারা এতে ইচ্ছুক তারা যেন ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে জমা দেয়। শিক্ষক-কর্মচারী কারো এতে দ্বিমত করার অবস্থা না থাকলেও যুদ্ধ-পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা আর করতে হয়নি (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

যুদ্ধের পর ১৯ই ডিসেম্বর উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন শেষ যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাতে কর্মচারীদের ব্যাপারে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বে যে-সকল কর্মচারীদের দণ্ড প্রদান করেছে তারা চাইলে পূর্বের পদে যোগদান করতে পারবে এবং যারা অনুপস্থিত কর্মচারীদের স্থলে কাজ করা শুরু করেছিলেন তারা ঐ পদের মূল অধিকারী কাজে যোগদান করামাত্রই চাকুরি ত্যাগ করবেন। ১৯৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সভার উদ্যোগ প্রথমে নেওয়া হয়েছিল কর্মচারীদের মধ্য থেকেই (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

এর পূর্বেই ১৯৭১-এর ২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সভায় শহিদ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, বাসস্থান সুবিধা ও অন্যান্য বিষয়াবলি পূর্বের মতো বহাল রাখার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয় যাতে ২১শে জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন উপাচার্য মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী 'নীতিগতভাবে' মেনে নিয়েছিলেন (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

যুদ্ধকালে অবরুদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারীদের অবস্থার চিত্র বর্ণনায় জগন্নাথ হলের কর্মচারীদের ব্যাপারে একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যার পরে জগন্নাথ হলে অবস্থান করার মতো সাহস আর কারো ভেতর ছিল না। জনশূন্য এই হলের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে শুরু করে ছাত্র-কর্মচারীদের জিনিসপত্রও বিনা বাধায় লুণ্ঠন করছিল দুষ্কৃতকারীরা। কর্মচারীদেরকে কর্মে যোগদানের যে নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছিল তার প্রেক্ষিতে পুরান ঢাকায় বসবাসরত হলের প্রধান সহকারী কল্যাণ ব্রত বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের সাথে যোগযোগ করেন। এক সময় তাঁকে জানানো হয় যে জগন্নাথ হল আর খোলা হবে না। মৌখিকভাবে হলের প্রাধ্যক্ষ করা হয় অধ্যাপক মীর ফকরুজ্জামানকে (মনোবিজ্ঞান)। হল খোলা হবে না বলে হল প্রশাসন বা কর্মচারীদেরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জগন্নাথ হলের যে-সকল কর্মচারী গণহত্যার কবল থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের বেতন প্রদান করতো। সেই বেতন বিলে ভারপ্রাপ্ত প্রাধ্যক্ষের স্বাক্ষর নিয়ে প্রধান সহকারী কল্যাণ ব্রত সেন নিজ চেষ্টায় চেকের মাধ্যমে কর্মচারীদের হাতে বেতন প্রদান করার কাজটি করতেন। এর ফলে ক্যাম্পাসে অবস্থান না করেও হলের প্রশাসনিক কর্মচারী, দারোয়ান, মালী, সুইপারদের হাতে অর্থের যোগান হয়েছিল (চক্রবর্ত্তী, ২০২১)।

জগন্নাথ হলের কর্মচারীদের বেতন নিয়ে যাওয়ার বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় জগন্নাথ হলের শহিদ কর্মচারী সুনীল চন্দ্র দাস-এর স্ত্রী বকুল রাণী দাসের ভাষ্য থেকেও (চৌধুরী, ২০২০)।

৪.২. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা

বর্তমান গবেষণার এই অধ্যায়ে যেসকল কর্মচারী পরিবারের অবরুদ্ধ জীবনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আলী আক্কাস, হাবুল মিয়া, আমীর হোসেন, গোপাল চন্দ্র প্রমুখ অবস্থান করছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সেই সময়ের তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ছিল এমন:

২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণে আলী আক্কাস তাঁর পরিবারের স্ত্রী, তিন মেয়ে, দুই ছেলেকে হারান। তাঁর সাজানো-গোছানো পুরো সংসারটি ধ্বংস হয়ে যায়। আবার যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করায় তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এত কিছু হারানোর পরও তাঁকে এক জীবনযুদ্ধের মধ্য

দিয়ে যেতে হয়েছে। ২৫শে মার্চ তিনি মুন্সীগঞ্জে ছিলেন। ২৬শে মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে আসেন। ২৫শে মার্চ রাতে স্ত্রী-সন্তানকে হারানোর পর তিনি একা হয়ে যান। তারপর শাশুড়ির অনুরোধে তিনি তার শালিকাকে বিয়ে করেন। ২৭ তারিখ মুন্সীগঞ্জে গিয়ে সেখানে দুই মাস থাকার পর পুনরায় ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকার রাস্তায় মিলিটারির আনাগোনা লক্ষ্য করেছেন। তিনি আবার তাঁর চাকরিতে যোগদান করেন। এ সময় তিনি মানসিকভাবে সুস্থির ছিলেন না। তাঁর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হতো, তাই চুপচাপ থাকতেন। তখন তাঁর বেতন ছিল ৬৭ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে রোকেয়া হলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতরা তাঁর চোখ বেঁধে রেখেছিল। হলের ভেতরে যা যা পেয়েছিল, ডাকাতদল প্রায় সবই লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। তবে তখন তিনি কোনো ধরনের ধর্ষণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি। যুদ্ধের সময়জুড়ে আলী আক্কাস কলোনির ভেতরে প্রভোস্টের বাসভবনের কাছে একটি ঘরে থাকতেন। তিনি ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আবার ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ চলে যান। এভাবেই তাঁর অবরুদ্ধ জীবন কেটেছিল এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পুনরায় ঢাকায় ফিরে আসেন (আলী আক্কাস, সময়ঃ ১৯৯৭ সালে গৃহীত সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

রোকেয়া হলের নৈশপ্রহরী হাবুল মিয়া ২৭শে মার্চ কারফিউ শিথিল হলে হল ছেড়ে গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। হেঁটে ডেমরা গিয়ে দেখেন অজগ্র মানুষ ঢাকা ছেড়ে গ্রামের পথে রওনা হয়েছিল। সেও সবার সাথে যাত্রা শুরু করেছিল। পথে খাওয়ার জন্য অনেকেই সাথে মুড়ি, গুড়, ও পানি সঙ্গে নিয়েছিল এবং অনেকে তাকে সেগুলো খেতেও দিয়েছিল। কিছু রাস্তা হেঁটে এবং কিছু রাস্তা নৌকায় করে গিয়ে সে দাউদকান্দির মোহাম্মদপুরে নিজ গ্রামে পৌঁছেছিলেন। এর কিছুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকুরিতে যোগদানের খবর পাঠালে তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে হলে ফিরে চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যে ভালো ছিল না সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। শিক্ষার্থীরা তেমন কেউ ছিল না। ক্যাম্পাস ছিল প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ কোনো শিক্ষার্থী আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সর্বক্ষণ আতঙ্ক বিরাজ করছিল। পাকআর্মি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত টহল দেওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা একবার বোমা ফাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। হাবুল মিয়া সেই বোমা কলাভবনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাস পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষার ঘোষণা আসে কর্তৃপক্ষ থেকে, তখন রোকেয়া হলে কয়েকজন ছাত্রী

এসেছিলেন। ৯ই নভেম্বরে হাবুল মিয়া ডিউটিরত অবস্থায় রোকেয়া হলে ডাকাত প্রবেশ করেছিল অস্ত্রসহ। প্রভোস্ট বাংলোতেও তারা প্রবেশ করেছিল এবং সামনে যা পেয়েছে প্রায় সবই লুট করে নিয়ে গিয়েছিল (বিস্তারিত জানতে দেখুন রোকেয়া হলে ডাকাতি, পূর্বদেশ এ প্রকশিত ১৯৭১, ১১ই নভেম্বর সংখ্যার পৃ. ১ ও ৬।)

যদিও তৎকালীন প্রভোস্ট হলে ডাকাতির ঘটনায় হাবুল মিয়াকে দোষারোপ করেছিল এবং ডাকাতদের সাথে তার যোগসাজশ আছে এ সন্দেহে হাবুল মিয়াকে অ্যারেস্ট করানো হয়। পরবর্তীতে ডাকাতদের কয়েকজন ধরাও পড়েছিল। হাবুল মিয়ার ভাষ্যমতে, ডাকাত দলটি পুরান ঢাকার একটি দল এবং এর সাথে পাকিস্তানি আর্মির যোগসাজশ থাকতে পারে বলে জানান। তিনি বলেন, "ডাকাতদের দ্বারা অনেক ছাত্রী অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।" পরবর্তীতে জেলে ডাকাতির সাথে মুক্তিবাহিনী জড়িত কি না সে ব্যাপারে তার থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি চেনেন না। তবু তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছিল এবং শুরুর দিকে পুলিশের মারও খেয়েছিলেন। দেশ যেদিন স্বাধীন হয়, হাবুল মিয়া তখন জেলে। ঢাকা জেলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সাথে তিনি তখন থাকতেন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে বিকেলের দিকে জেলের গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং বন্দিরা একসাথে বের হচ্ছিল বিধায় জেল গেটে জটলা পাকিয়ে গিয়েছিল আগে কে গেট দিয়ে বের হবে তা নিয়ে। তিনি খুব লম্বা ছিলেন বিধায় কোনোক্রমে ঠেলে বের হয়ে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে হলেই যান। সেখানে গিয়ে দেখেন চারদিকে আনন্দের বন্যা। সবাই মুক্তির আনন্দে মেতে উঠেছে। সে সময় হলের আবাসিক শিক্ষিকা সাহেরা খাতুন তাঁকে বাসায় ডেকে নিয়ে খাইয়েছিলেন এবং কিছু টাকা দিয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে বলেছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার দেশের দায়িত্ব নিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালে তিনি আবার হলের চাকুরিতে যোগদান করেছিলেন। স্বাধীনতা যেমন আনন্দ নিয়ে এসেছিল, তেমনি মানুষের মনের চাপা কষ্টগুলোকে বারবার নাড়াও দিচ্ছিল। বর্তমান শামসুন্নাহার হলের স্থলে যে বধ্যভূমি ছিল, সেখানে যুদ্ধচলাকালীন যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের দেহগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২০শে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সেই বধ্যভূমি খনন করে তাঁদের দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করার জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেখানে হাবুল মিয়া অংশ নিয়েছিলেন। সেই দেহাবশেষগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন স্থানে

আবার সমাহিত করা হয়েছিল। সেই মুহূর্তের একটি ঘটনা মনে করে হাবুল মিয়া বলেন, "সেদিন এই গর্ত থেকে গিয়াসউদ্দিনের ভাই নাসিরউদ্দিনের হাতের ঘড়িটি পাওয়া যায়। ঘড়ি হাতের হাড়ের সঙ্গে ছিল।" এ দৃশ্য দেখে সবাই কান্নাকাটি করেছিল। তখন সেখানে রোকেয়া হলের লিফটম্যান গিয়াসউদ্দিন দেওয়ান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর পিয়ন মোঃ আব্দুল হাইও ছিলেন। তারা সবাই মিলে কঙ্কালগুলো গণকবর থেকে মাটি সরিয়ে তুলে এনেছিলেন (আল-আমিন ও খান, ২০২০, পৃ.৩৪-৫)।

আমির হোসেন তাঁর পাঁচজনের পরিবারসহ আজিমপুর স্টাফ-কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে জিঞ্জিরায় যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। পথের মধ্যে তাঁর বন্ধুর এক মামাতো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল। সেই ভাই যখন জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাচ্ছো, তখন তিনি বলেন, "কই যাচ্ছি বলতে পারব না। ঘরতান বাহির হয়ে আসছি।" তখন সেই ভাইটি নদীর পাড়ে তাঁদের বাসায় আমির হোসেনের পুরো পরিবারকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা চারজন ছিলেন। নদীর পাড়ে গোসল করতে গেলে একজন ইমাম তাঁকে দেখালেন আর্মি চারদিকে ঘেরাও করেছে এবং গানবোট সারি বেঁধে যাচ্ছে। সে মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ গুলাগুলি করে সেই এলাকায় আক্রমণ করেছিল পাকবাহিনী। যে বাসায় তাঁর পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা ছিল ওখান থেকে ২০০ থেকে ৩০০ গজ দূরে। তিনি সেই বাসায় যেতে পারছিলেন না। তখন মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন তাঁর মা-বোনেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অন্যত্র চলে যায় কি না। তখন তিনি কোনোভাবে পাকবাহিনীর চোখ এড়িয়ে সেই বাসায় এসে পৌঁছান এবং সবাইকে নিয়ে মসজিদে অবস্থান নেন। তবে কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে আসার জন্য বাকি সদস্যদের মসজিদে রেখে যখন আবার আগের বাসায় যান, তখন সেখানে গিয়ে আটকে পড়েন। কারণ সেখানে আর্মি মার্চ করছিল এবং চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। তখন ভয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় একটা খালে পড়ে যান। খাল পার হয়ে খালের ঐপাড়ে 'আটি' নামক স্থানে পৌঁছান। এটা এখনকার ঢাকার কেরানীগঞ্জ। যখন দৌড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে থাকা খুচরা পয়সাগুলো ঝনঝন করে পড়ার আওয়াজও শুনছিলেন। পরে কয়েকটা কুড়িয়ে আবারও দৌড়াচ্ছিলেন আতঙ্কে। সেখান থেকে জিঞ্জিরায় আরেকটি মসজিদে অবস্থান নিয়েছিলেন। সেখানে অনেক হিন্দুরাও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই সেখান থেকেও দ্রুত সরে যাওয়ার কথা ভাবেন এবং নদীর পাড়ে আবার আসেন। ঐখানে গিয়ে তিনি সেই আজিমপুরের বন্ধুর মামাকে নৌকা নিয়ে আসতে দেখেন। তখন

সেই মামা নৌকাটি তাঁকে দিয়ে পার হতে বলেছিলেন। নৌকা তিনি খুব ভালো চালাতে জানতেন না। তাই নৌকাকে কোনোরকমে নিয়ে ঐপাড়ে আসেন এবং তখন সেখানে আরেকটি টমেটো ভর্তি নৌকা দেখতে পেয়েছিলেন, যেখানে একটি লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পড়েছিল। এটা দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। নদীর ঐপাড়ে উঠে হেঁটে লালবাগে বন্ধুদের কাছে আসেন এবং সেখান থেকে দুপুরের দিকে আবার নদীর পাড়ে আসেন। তখন একটি নৌকায় চড়ে নদীর মাঝপথে যান এবং পাকবাহিনীর গানবোট দেখে ভয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। সাঁতরে আবার নদীর পাড়ে ফিরে আসেন। বন্ধুরা দেখে আবার একটা নৌকায় উঠিয়ে দিয়েছিল। নৌকা দিয়ে পার হয়ে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর পরিবার সেই আগের বাসায় চলে গিয়েছিল। তখন তাঁদের নিয়ে আবার আজিমপুর কোয়ার্টারে আসেন। তিনি পরিবারসহ বরিশাল চলে যেতে চেয়েছিলেন। ঐ মাসের বেতনটা নিয়ে যেতে দুই থেকে তিন দিনের মতো ছিলেন ঢাকায়ই। বরিশাল যাওয়ার আগে লালবাগে এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে সে বন্ধুটি ১০০ টাকা দেয় এবং আরেক বন্ধুও ১০০ টাকা দেয়। এই ঘটনার পর সদরঘাটে যান পরিবার নিয়ে বরিশালের উদ্দেশ্যে। সেখানে লঞ্চ না পাওয়ায় সকাল ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত হেঁটে মুন্সিগঞ্জ গিয়েছিলেন এবং খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বিধায় একটি স্কুলঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ক্ষুধার্ত থাকায় বাইরে বের হয়ে কয়েকটা রুটি, ভাজি ও নদীর পানি খেয়েছিলেন। স্কুলঘরে বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য আরোও কিছু পরিবার ছিল। সেখান থেকে নদীর পাড়ে গিয়ে ২০০ টাকায় একটা নৌকা ঠিক করে চারটা পরিবারকে নিয়ে রওনা হয়। নৌকাপথে ডাকাত আক্রমণ করেছিল তাদেরকে, যদিও এই ব্যাপারে লঞ্চওয়ালা তাদেরকে সাহায্য করায় কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। নৌকা দিয়ে কাঠপট্টি নামক স্থানে গিয়েছিল। সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বরিশালের হিজলা নামক উপজেলায় যান। তারপর সেখান থেকে আবার হেঁটে বাড়ি পৌঁছেছিলেন পরিবার নিয়ে। সে যাত্রায় বাড়িতে একমাস অবস্থান করে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে জয়েন করেন। আসার পূর্বে বাড়িতে এক মণ দশ সের চাল ২০ টাকা দিয়ে কিনে এবং মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে চলে আসেন। তিনিসহ চারজন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী মিলে আজিমপুরে একটা কোয়ার্টারে থাকতেন এবং সেখানে বুয়া রান্না করে দিতেন। তবে ক্যাম্পাসে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। তখন ক্যাম্পাস ছিল প্রায় ফাঁকা। কিছু শিক্ষক ও কর্মচারী ছিলেন। ছাত্ররা খুব বেশি একটা ছিল না। তিনি এসে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে জয়েন করেছিলেন। পুরো ক্যাম্পাসে তেমন কেউ ছিল না। কর্মচারীরা দুইটা পর্যন্ত ডিউটি করতো। তবে

ঐসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবসময় চারদিকে পাকসেনা টহল দিতো। কখনো কখনো আইডি-কার্ড দেখতে চাইতো। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ক্লাস ও পরীক্ষার আয়োজন করেছিল প্রশাসন। তবে পরীক্ষা যাতে কেউ দিতে না আসে তাই সিঁড়িতে ককটেলের মতো কিছু একটা বাঁধা ছিল। সেই সময়ের কেয়ারটেকার আর্মিকে খবর দিলে তারা এসে দেখে এটা কোনো বোমা নয় বরং টেপ দিয়ে প্যাঁচানো বালিভর্তি কাপড়। আমির হোসেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-ভবনের কমনরুমে চায়ের দোকান করেছিলেন। যুদ্ধের কয়েকমাস পর ছাত্রীরাও আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর দোকান থেকে চা খেতেন এবং কিছু টাকা আসতো। এর মধ্যে একদিন শুনেছিলেন উনার বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী গোপাল দাসকে খুঁজতে তার বাসস্থান শিববাড়িতে শাহেদ আলীর বাড়িতে পাকবাহিনী রেইড দিবে। তিনি তখন শিববাড়িতে গিয়ে সাইকেলে করে একটা নিরাপদ স্থানে ব্যাচেলররা থাকে সেখানে রেখে এসেছিলেন বন্ধুকে। গোপাল দাস একদিন আবার তাঁর সাথে দেখা করতে কলাভবনের কমনরুমে এসেছিলেন। তখন ক্যাম্পাসে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছিল। চারিদিকে পুলিশ ও পাকসেনা ঘেরাও করে থাকত এবং প্রায়শই বোমা বিস্ফোরণ হতো যেখানে-সেখানে। পাকসেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আসতো, তাদের আইডি-কার্ড চেক করতো। তখন বরিশালে তার পরিবারকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তাঁর বেয়াইনের মাধ্যমে। আর গ্রামের খবর পেতেন যে তাদের আশেপাশের গ্রামগুলো আক্রমণ হচ্ছিল, যদিও তাঁদের গ্রামে আক্রমণ হয়নি। তিনি চা বিক্রির মাধ্যমে যে ৮ থেকে ১২ আনা পেতেন, তা দিয়ে কষ্ট করে চলতেন। আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া বেতনের পুরোটা গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। স্বাধীনতার তিন মাস আগে তার পরিবারকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন, কারণ গ্রামে খাবারের খুব অসুবিধা ছিল। সপ্তাহে দুবার হাট বসতো। তবে বাজার করার মতো কেউ ছিল না। তার পরিবার তার সাথে যখন কোয়ার্টারে থাকতে আসলেন, তখন প্রায়ই রাতে গোলাগুলি হতো কোয়ার্টারের পাশে। তিনি ও তার পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন সবসময়। তবু তাঁদের যাওয়ার জায়গা ছিল না বিধায় যা হয় হবে ভেবে কোয়ার্টারেই ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই থেকে তিন দিন আগেও ভারতের বিমান সর্বক্ষণ তাদের কোয়ার্টারের উপর দিয়ে যেত এবং গোলাগুলি হতো দুই পক্ষের। এসবের মধ্যেই বেঁচে ছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবার। আমির হোসেন দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ মুহূর্তের স্মৃতিচারণায় বলেন, ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হচ্ছিল তা তিনি শুনেছেন। লাইব্রেরির এক বিহারি কর্মচারীর বাসায় গিয়ে এগুলো আলোচনা করলেও ভয়ে ক্যাম্পাসের দিকে

আসতেন না। ১৬ই ডিসেম্বর যখন শুনেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তখন তিনি ও তাঁর সাথিরা পলাশীতে যান কি হচ্ছে দেখার জন্য। তারপর সেখানে গিয়ে দেখেন বিহারিরা গোলাগুলি করছিল। তারপর মিরপুর ১০-এ গিয়ে দেখেন সেখানেও তখন গোলাগুলি চলছিল। তখন বন্ধু সুভাষকে নিয়ে শ্রীপুর হয়ে নিউ-মার্কেটে আসেন। সারাদিন বিজয়ের আনন্দে ঢাকায় এভাবেই ছুটাছুটি করছিলেন এবং বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে! আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না (আমির হোসেন, যোগাযোগ-স্থান: কলাভবন কমনরুম, সময়: দুপুর ২.৩০টা, তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

ঢাকা শহর ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে গোপাল দাস লালবাগ হয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে নৌকায় করে নদী পার হওয়ার জন্য জনতার ভিড় লেগেছিল। সেই ভিড়ে গোপাল ধীরেন চন্দ্র ও তার পরিবার, চিন্তাহরণ ও তাঁর পরিবার ইত্যাদি আরও অনেক পরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। নদী পার হয়ে বহু অপরিচিত মানুষ তাদেরকে জল-খাবার দিয়েছিল। বুড়িগঙ্গার ওপাড়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল এক চেয়ারম্যান-এর বাড়িতে। তারা সেদিন ঐখানেই কাটান। পরে সেখানে গুজব রটল যে, আর্মি আসছে এলাকায় আক্রমণ করতে। এই ভয়ে তারা দিঘিরপাড় চলে যান। সেখান থেকে গোপাল চাঁদপুরে চলে যাওয়ার চিন্তা করেন। কিন্তু যাবে কীভাবে? হাতে তো কোনো অর্থকড়িই নেই। তবু তিনি ট্রেনে করে চাঁদপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। ট্রেনে করে গিয়ে মাইজদিতে নামেন গোপাল। সেখান থেকে হেঁটে রওনা হন বাড়ির দিকে। কিন্তু যাত্রাপথে খাওয়া-দাওয়া করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। লজ্জায় অন্যদের থেকে খাবার চেয়ে নিয়েও খেতে পারছিলেন না। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের জুতাও খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি মাঝেমধ্যে জমির ভেতরের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জমির খিরা (শসা) তুলে খেয়েছেন। হেঁটে হেঁটে গোপাল তার পিসির বাড়িতে পৌঁছান। কিন্তু পিসির বাড়ির লোকজনের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন অনুভব করে দ্রুত সেখান থেকে নিজ বাড়িতে চলে যান তিনি। ২০ মাইল দূরেই তাদের বাড়ি। বাড়িতে তাঁর মা তাঁকে দেখে বলেছিলেন, "তুই কোথ থেকে আসলি, এখানে এমনিতেই ঝামেলা।" তাঁর মায়ের এমন ব্যবহারের পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। পরিবারের অর্থনৈতিক অসঙ্গতির পাশাপাশি হিন্দুদের উপর মিলিটারির বাড়তি আক্রোশ একটি কারণ হতে পারে। যাইহোক, গোপাল বাড়িতে গিয়েছিলেন রাজু নামের একজন মুসলমান

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে তার বাড়িতে হিন্দুর পরিচয়ে থাকতে হবে। কিন্তু, তবু তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

অগত্যা ঐ ছেলেটিকে নিয়ে গোপাল আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন। এছাড়া তাঁর অন্য কিছু করার উপায়ও ছিল না। গোপাল যখন সদরঘাটে এসে নামেন, তখন পূর্বের চিত্রের থেকে ভিন্ন অবস্থা দেখতে পান। সেখানে নৌ পারাপার ঘাটে মিলিটারি দাঁড়িয়ে সকলের আইডি-কার্ড চেক করে দেখছিল। গোপাল তখন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা তাঁর আইডি-কার্ড দেখলে মিলিটারি বুঝতে পারবে যে, তিনি হিন্দু। লাইনের শুরুতে দাঁড়ানো মিলিটারি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখার সুযোগে তাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসেন গোপাল। তারপর সেখান থেকে চলে আসেন বর্তমানের আইবিএ ক্যান্টিনের গেটে। কিন্তু দারোয়ান তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। কলাভবনের দারোয়ানও তাকে প্রথমে ফেরত দিয়েছিল, কেননা সে জানত যে, গোপালের কাছে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। তবু তিনি দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে কলাভবনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এখানে আশ্রয় নেওয়ার আগে সাত-আনা দিয়ে তিনি একটি রুটি কিনে নিয়েছিলেন। তা খেয়েই সারারাত ছিলেন গোপাল। কলাভবনের সেই রাতটি তার ভয়ে ভয়ে কেটেছিল। সকালবেলা গোপাল আজিমপুরে যান তার পূর্ব-পরিচিত আমির হোসেনের মেস-বাসায়। সেখানে কয়েকদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন গোপাল। এরপর গোপাল শিববাড়িতে গিয়েছিলেন (গোপাল দাস, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়: সকাল ১০টা-১২টা, তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)

তাঁর বন্ধু আমির হোসেন আজিমপুরে থাকা অবস্থায় জানতে পারেন যে শিববাড়িতে আর্মি রেইড দিবে। তখন আমির হোসেন সাইকেল চালিয়ে শিববাড়িতে চলে যান। সেখান থেকে গোপালকে নিয়ে নিজের মেসে এনে রাখেন আমির হোসেন। কিন্তু গোপালকে সাইকেলে নিয়ে আসতে অন্য কেউ দেখে থাকলে আমির হোসেনের ঠিকানা বের করে সেখানে মিলিটারি চলে আসতে পারে এই চিন্তা করে তিনি গোপালের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। সেখানে গোপাল কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। পরে গোপাল আরেকদিন কলাভবনে আমির হোসেনের কাছে চলে আসেন। আমির হোসেন তখন কলাভবনে চায়ের দোকান করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন গোপালকে তাঁর সহকারী হিসেবে

রাখবেন। কিন্তু গোপালের আইডি-কার্ড না থাকা ও আরো অন্যান্য দিক বিবেচনা করে তিনি তা করেননি (আমির হোসেন, যোগাযোগ-স্থান: কলাভবন কমনরুম, সময়: দুপুর ২.৩০টা, তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

আমির হোসেনের এমন ভালোবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য গোপাল তাঁর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন সবসময়। গোপাল মনে করেন, শিববাড়িতে সেদিনের মিলিটারি রেইডের আগে আমির হোসেন তাকে না সরালে মিলিটারির হাতে গোপালের মৃত্যু হতে পারতো। গোপাল অবশ্য পরে দীর্ঘদিন থেকেছেন বাংলাবাজারের একটি প্রেসের রুমে। সেখানে অবশ্য তিনি ঠিকমতো খাবার-দাবার পেতেন না। আর সেখানে বিল্ডিংয়ের দোতলায় ছিল রাজাকারদের মিটিংয়ের আখড়া। পরে গোপাল ক্যাম্পাসেও চলে এসেছিলেন। তাঁর খারাপ লেগেছিল যখন দেখেন যে, পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোপিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কিছু নব্য রাজনৈতিকও এসেছিল। যাইহোক, অবরুদ্ধের পুরো নয়মাস গোপালের জীবনযাত্রা নানাভাবে নানাদিকে মোড় নিয়েছে। পরে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই শুনেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার সংবাদ (গোপাল দাস, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়: সকাল ১০টা-১২টা, তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

তৎকালীন ডাকসুর কর্মচারী আব্দুর জব্বার ভাগ্যক্রমে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করছিলেন না। গণ্ডগোলের আশঙ্কা থেকে তৎকালীন কিছু নেতাকর্মীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন এবং সেই রাতে তাঁর গ্রামের বাড়ি চলে যান। তবে যুদ্ধকালীন নয়মাস তিনি নিয়মিত ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ি গিয়ে সিগারেটের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। সেই সূত্রেই নিয়মিত ঢাকায় আসা হতো। ঢাকায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হচ্ছে তার সব খবর জানতেন। পরিচিতদের সাথে এবং মুক্তিবাহিনীর সাথেও তাঁর বেশ যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছ থেকে ঢাকায় ঘটে যাওয়া সেই সময়ের বেশ কিছু ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। আব্দুল জব্বার তাঁর ভাইদের সাথে চারজন মিলে জুন মাস থেকে ঢাকায় সিগারেটের ব্যবসা শুরু করলেন। তখন তাঁদের সাথে মুক্তিবাহিনীর অনেকের দেখা-সাক্ষাৎ হতো এবং যোগাযোগ ছিল। আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে ট্রেনিং করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের

কমান্ডার ওসমান গনিও যুদ্ধে সমস্যার সম্মুখীন হলে কী করতে হবে সে ব্যাপারে কথা বলতেন। তবে খুব একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও ওসমান গনি তাদেরকে ক্রলিং পদ্ধতিটা ব্যবহার করতে বলেছিলেন, যার দাগ আব্দুল জব্বারের হাতে ছিল। এমনকি তখনকার খিজিরপুরের কমান্ডার তাঁদেরকে জঙ্গলে ডেকে নিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ক্রলিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে নিরাপদ স্থানে যাওয়া যাবে পাকবাহিনীর আক্রমণের মুখোমুখি হলে, যেহেতু তাদের ঢাকায় যাতায়াত ছিল নিয়মিত। এমনকি একবার পাকবাহিনী জলপথে যাওয়ার পথে ফায়ার করার সময় তিনি ক্রলিং করে অন্য জায়গায় সরে গিয়েছিলেন। তখন সাথে থাকা জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে চলে এসেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই তিনি আসতেন। তখন যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের অনেকেই কীভাবে, কোথায় লাশ পাওয়া গিয়েছে বা গর্ত করে রাখা হয়েছে তা তাঁরা লিখে রাখতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ে পাঁচটা লাশ পড়েছিল যা তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন। তার মধ্যে চারটা লাশ পুরুষের ছিল এবং একটা ছিল একজন মহিলার, যাদের লাশ থেকে মাংস শকুন, কাক ও কুকুরে খাচ্ছিল এবং খুব দুর্গন্ধ হচ্ছিল। সে সময় পাকবাহিনী কোথায় অবস্থান করছিল সেগুলো কাগজে লিখে রাখতেন। ব্যবসায়ের সূত্রে সদরঘাট টার্মিনাল, যাত্রাবাড়িতে যাওয়া হতো এবং সেখানে পাকবাহিনী কোথায় ছিল এবং কেমন ধরনের অত্যাচার করতো তা লিখে সংরক্ষণ করে রাখতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকবাহিনী যখন মধুদা ও নিশিনাথ বাবুকে মেরে ফেলেছিল, তাদের জগন্নাথ হলে যে স্থানে মাটি চাপা দিয়েছিল সেই স্থান দেখতেও যেতেন। মাঝে মাঝে ওসমান এবং সামাদ মিয়া নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দেখতে যেতেন। তারাও অনেক সময় পাকবাহিনীর আসার তথ্য পেলে আব্দুল জব্বারকে সরে যেতে বলতেন। আব্দুল জব্বারসহ যারা তথ্যগুলো রেখেছিলেন তারা ঢাকার মেইন শহর, সূত্রাপুর ও রায়ের বাজারে সিগারেট বিক্রি করে তথ্যগুলো সংগ্রহ করতেন। কখনো কখনো পাকবাহিনীর সামনেও পড়ে যেতেন। তখন তাঁরা দাড়ি রেখেছিলেন। তাঁদের যখন উর্দুতে জিজ্ঞেস করা হতো হিন্দু না মুসলিম, তাঁরা তখন মুসলমান বললে আর কিছু করেনি। রায়েরবাজারে হিন্দু একজন দারোগা ছিল এবং মোহাম্মদ ইসমাইল নামে মুসলমান একজন প্রভাবশালী মাতব্বর ছিল। রায়েরবাজারে ব্যবসাসূত্রে যাওয়া হতো এবং তাঁদের থেকে সেখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য নির্যাতনের ব্যাপারে জেনেছিলেন। তাছাড়া সেখানে অনেকের বাড়ি লুট হচ্ছিল। ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলেছিল অনেককে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সুন্দরী

মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যেতো। নৌকা নিয়ে যাওয়ার পথে মুক্তিবাহিনীর নৌকার সাথে তাদের দেখা হতো। মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় জানতে চাইত তারা কারা। মালামাল লুটের কি না। তখন তারা যখন মুক্তিবাহিনীদের প্রতি একাত্মতা দেখালো এবং খবরাখবর সম্পর্কে তাদের বললো, তারা যখন একটা পরিচয়পত্র দেয় যা দেখিয়ে পরবর্তীতে তাঁদের নৌকা থেকে তথ্য দিত আব্দুল জব্বারসহ অন্যরা। পাকবাহিনীর সদস্যরা অনেক সময় তাঁদের নৌকা তল্লাশি করতো। তবে তাঁদের বডি তল্লাশি না করায় তাঁদের সাথে থাকা পরিচয়পত্র দেখতে পায়নি। সাময়িক ভয় পেলেও ঢাকায় থেকে মুক্তিবাহিনীকে এভাবে সাহায্য চালিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের নয়মাস অতিবাহিত হলো, আব্দুল জব্বার মতলবের নারায়নপুর বাজারে ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর আনুমানিক দুপুর দুইটার সময় বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে জানতে পারলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন।" তখন তাঁরা সবাই ঢাকায় আসেন ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর পেয়ে। মনে ছিল তাঁর অপার আনন্দ। তাঁর ভাষ্যমতে, "এটা এমন আনন্দ যে, বাংলাদেশে মনে হয় আবার নতুন করে জন্ম নিলাম।" সেই চিরচেনা ঢাকায় আসেন, ঢাকায় বিভিন্ন জায়গাগুলোতে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি দেখছিলেন। পুরান ঢাকায় সরু গলিতে গলিতে তখনও অনেক লাশ পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে লাশ পাওয়া যাচ্ছিল, মাটিতে চাপা দেওয়া ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া অসংখ্য লাশ। এসব দেখে যেমন নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন; একইসাথে স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়া তার মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছিল (আব্দুল জব্বার, ১৯৯৭ সালে গৃহীত সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

চুন্নু মিয়ার স্ত্রী ফিরোজা বেগম জানতেই পারেননি যে ২৫শে মার্চে তার স্বামীর সাথে কী হয়েছে। তার ছেলে মুহাম্মদ শাহজালালও তখন ঢাকায়। দুজনের জন্যই তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত। তাঁর ভাসুর কুদ্দুস ও আরেক ভাসুরের ছেলে হাবুলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতো। ২৫শে মার্চের কিছুদিন পর হাবুল বাড়িতে এসে জানায় তার চাচা চুন্নু মিয়াকে পাকসেনা ২৫শে মার্চ রাতে মেরে ফেলেছে।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ পাকবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে শহিদ হন রোকেয়া হল স্টাফ-কোয়ার্টারে অবস্থান করা মালী চুন্নু মিয়া। তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সন্তানদের জীবন চালনাকারী চুন্নু মিয়া শহিদ হলে তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। চুন্নু মিয়ার সন্তান মোহাম্মদ শাহজালালের ভাষ্যমতে, তাঁরা তখন এত দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন

যে, তাঁর চাচারা তখন তাঁর ও তাঁর বোনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। পরিবারের এই ভঙ্গুর অবস্থায় এবং অর্থনৈতিক দীনতার দরুন শাহজালাল ও তার ভাই বোনেরা কেউই আর পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। মোঃ শাহজালাল আরো জানান যে পড়াশোনাহীন অভাব অনটনে কোনোরকম দিনানিপাত করেছিলেন তাঁদের পরিবার (শাহজালাল রচিত 'সেই দুঃস্বপ্নের রাত আজও আতঙ্কিত করে', *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ. ৪৭- এ বিস্তারিত দেখুন)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন মোহাম্মদ আব্দুল হাই যখন ২৬শে মার্চ রোকেয়া হলের কর্মচারী আলী আক্কাসের পরিবারের সদস্যদের ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। পুরান ঢাকা থেকে তারা বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়েছিলেন। সেখানে আরো লাখ লাখ মানুষও ঢাকা ছাড়ছিল। রোকেয়া হলের নাইট গার্ড হাবুল মিয়ার মতো অভিজ্ঞতা আব্দুল হাইয়েরও ছিল। তিনিও যাত্রাপথে দেখেন মানুষ সাথে করে মুড়ি, গুড় ও পানি সাথে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এগুলো নিয়ে দাঁড়িয়েও ছিলেন। সে সংকটের সময়ও মানুষ নিজের কথা না ভেবে পথের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন যারা, তাদের খেতে দিচ্ছিলেন। এভাবে কিছু পথ লঞ্চ, কিছু পথ হেঁটে নিজ বাড়ি চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ পৌঁছান। যুদ্ধকালীন বাকি সময়টা অভাবের তাড়নায় ছিলেন। একদিকে দেশের খারাপ অবস্থা তার উপর আর্থিক সংস্থান হারিয়ে কষ্টে পড়ে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। পরবর্তীতে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকুরীতে যোগদান করেছিলেন স্বাধীনতার পর (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

অবরুদ্ধ সময়ে রোকেয়া হলের লিফটম্যান গিয়াস উদ্দিন দেওয়ান ২৫শে মার্চের অতর্কিত আক্রমণ ও নিজ চোখে তার ভাই নাসির উদ্দিনের মৃতদেহ সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই এক আত্মীয় তাকে চাঁদপুরে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঘটনার আকস্মিকতায় তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে কিছুটা স্বাভাবিক হন এবং ঘটনার ২৩ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নোটিশে আবার চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন। হলের কোয়ার্টারের বাসায় উঠেছিলেন। রোকেয়া হলে ২৫শে মার্চের পর কোনো ছাত্রীই

ছিল না। তবে জুলাই-আগস্টের দিকে আবার ছাত্রীরা হলে আসতে শুরু করেছিলেন। নভেম্বরের শুরুর দিকে রোজার রাতে গিয়াসউদ্দিনের ডিউটিরত অবস্থায় হলে বিহারিরা ডাকাতি করেছিল। তৎকালীন প্রভোস্টের কথায় ছয়জন কর্মচারীকে ডাকাতিতে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল যাঁদের কোনো দোষই ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন রোকেয়া হল সংলগ্ন বধ্যভূমি খনন করা হয়েছিল, তখন তাঁর ছোটো ভাই নাসিরউদ্দিনের হাতের ঘড়ি পাওয়া গিয়েছিল যা দেহাবশেষের সাথে আটকে ছিল (আল-আমিন ও খান, ২০২০)।

ঢাকা থেকে গ্রামে ফেরা সন্তানদের কাছ থেকে স্বামীর মৃত্যুর খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন জমিলা খাতুন। এই সংবাদ মুহূর্তেই পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং আত্মীয় পরিজনরা এসে জমিলা খাতুনের গা থেকে সমস্ত গয়নাগাটি খুলে নিয়েছিল তাঁকে বৈধব্যের নিয়ম পালন করানোর জন্য। স্বামীহারা জমিলা খাতুনের কাছে তখন মাত্র ৫ টাকা ছিল। তাঁর স্বামী শামসুদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুতে জমিলা খাতুন সন্তানাদি নিয়ে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি তাঁর সন্তানাদি নিয়ে নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুদ্ধের পুরো নয়মাস তিনি সেখানেই কাটিয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততি নিয়ে চাষাবাদ করে সংসার চালিয়েছিলেন জমিলা খাতুন। যুদ্ধের শেষের দিকে পাকবাহিনীর এলোপাথাড়ি গুলিতে বিদ্ধ হয়েছিলেন জমিলা খাতুনের মা। একটি গুলি বৃদ্ধার দুই পা এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। এ কথা স্মরণ করে জমিলা খাতুন বলেন, "যুদ্ধের প্রথম দিন মরছে আমার স্বামী। আর শেষের দিন গুলি খাইছে আমার মা" (জমিলা খাতুন, বয়স-৯৮, শহীদ মো. শামসুদ্দিনের স্ত্রী, যোগাযোগ-স্থান: শিববাড়ি আবাসিক এলাকা, সময়: সন্ধ্যা ৬টা, তারিখ: ০১/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে রচিত)।

উক্ত ঘটনার উল্লেখ জমিলা খাতুনের তৃতীয় ছেলে মোহাম্মদ সাজাহানও করেছেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে দেশ স্বাধীন হওয়ার দুইদিন আগে, অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বরের দিকে ময়নামতি থেকে ধাওয়া খেয়ে কিছু পাকিস্তানি সৈনিক তাঁদের গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। আর তারা এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে সামনের দিকে এগোচ্ছিল। ঐ মুহূর্তেই একটি বুলেট এসে তার নানীর শরীরে লেগেছিল। তাঁর নানীকে ঐ জখম অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছিলেন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা (মুক্তিবাহিনী) এসে মোঃ সাজাহানের নানীর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন করেছিলেন। যুদ্ধকালীন সেই জীবনের কথা স্মরণ করে মোঃ সাজাহান বলেন, "এই নয়টা মাস

আল্লাহ চালাইছে। জিনিসপত্র বেঁচে কোনোরকমে চলতাম আমরা। ছিলাম নানার বাড়িতে।” তাঁর বাবার মৃত্যুতে তাদের পরিবারে অর্থনৈতিক যে ভঙ্গুরতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটাতে মূলত আশ্রয় নিয়েছিলেন নানার বাড়িতে। কিন্তু সেই সময়টিও পার করতে হয়েছিল নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। তিনি জানান, তার বড়ো ভাই জনাব দেলোয়ার হোসেন; যিনি যুদ্ধের দুই মাস আগে পাকিস্তান আর্মি থেকে ট্রেনিং শেষ করে সদ্য দেশে ফিরেছিলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে প্রথম তিন মাস অবধি লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জনাব দেলোয়ার পরিবারকে জানান যে, “আর কতদিন এমন লুকিয়ে থাকব। তার থেকে বরং আমি যুদ্ধে চলে যাই।” মোঃ সাজাহান বলেন যে তাঁর ভাই যেহেতু সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন তাই তাঁকে যুদ্ধের জন্য আর কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হয়নি বরং তিনি নিজেই বহু লোককে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তৎকালীন চাঁদপুর এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন শহিদ শামসুদ্দিনের সন্তান দেলোয়ার হোসেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল এই শহিদ সন্তানকে। যুদ্ধদিনের সেসব স্মৃতি এখনো অম্লান হয়ে আছে মোঃ সাজাহানের মনে (মো. সাজাহান, বয়স-৫৫, শহিদ মো. শামসুদ্দিনের ছেলে, যোগাযোগ-স্থান: শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময়: দুপুর ৩ টা, তারিখ: ০২/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে রচিত)।

বাবা শহিদ খগেন্দ্র চন্দ্র দে ও বড়ো ভাই শহিদ মতিলাল দে'র মৃতদেহ জগন্নাথ হল মাঠে ফেলে রেখে নিজেদের প্রাণ রক্ষার তাগিদে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও পরবর্তীতে ঢাকা শহর ত্যাগ করেছিলেন বাসনা দে ও তাঁর পরিবার। অজানা পথ পাড়ি দেওয়ার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে বাসনা দে বলেন, “এরপর তো শুরু হয়েছিল কেবল এখান থেকে সেখানে পালিয়ে বেড়ানো, আর বেঁচে থাকার লড়াই” মা, ভাই, বোনদের জীবন বেঁচে যাওয়াটাকে দৈব ঘটনা বলে মনে করেন বাসনা দে। সেই সময়কে উল্লেখ করতে গিয়েই তাঁর মনে পড়ে যায় তাঁর সেই একমাত্র জামাটির কথা যা তিনি যুদ্ধকালীন পূর্ণ নয়মাস ধরে পরেছিলেন। সাদা ও লাল রঙের ঘন কুচি লেসের হাতকাটা সেই ফ্রকটিও যেন তাদের যুদ্ধদিনের দুর্বিষহ সাক্ষ্য বহন করেছিল। একই চিত্র তাঁর মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। তিনি উল্লেখ করে বলেন, “আর মায়ের বড়ো পাড় দিয়ে মরচে রঙের শাড়িটার কথাও ভুলিনি। ঐ একটা শাড়ি যে মাকে পরতে দেখেছি দীর্ঘ নয়মাস যাবত। স্নান করার সময় শাড়ির কিছুটা অংশ গায়ে থাকতো, কিছুটা অংশ ভেজাতেন।” যুদ্ধকালীন তাঁদের

এই জীবনসংগ্রাম ও সেখান থেকে বেঁচে ফেরাটা বাসনা দে'র কাছে এক জাদুকরী ঘটনা মনে হয় (বাসনা দে রচিত '২৬ মার্চ' ৭১: যা ঘটেছিলো, *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ.৩৫-৬-এ বিস্তারিত দেখুন)।

তাঁর এই জীবনের আরেক সঙ্গী তাঁর ছোটো ভাই শিবেন্দ্রচন্দ্র দে (শিবু)। শিবেন্দ্রচন্দ্র তাদের অবরুদ্ধ জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর পরিবার যখন ঢাকা ছেড়েছিল তখন তিনি ছিলেন কোলের শিশু। দীর্ঘ যাত্রাপথে কোনো খাবার তাঁরা খেতে পাননি। বাধ্য হয়ে ছোট্ট শিবুকে খাওয়াতে হয়েছে কাঁচা বার্লি। তাঁদের এই অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে পথিমধ্যে দুইবার তাঁকে ক্রয় করে রেখে দিতে চেয়েছিলেন কেউ কেউ। বাসনা দে বলেন, "মাকে এইভাবে বলে যে, আপনার তো স্বামী নেই। এতগুলো ছেলে-মেয়েকে কীভাবে বড়ো করবেন, তার থেকে আমাদের কাছে ছোটো ছেলেকে বিক্রি করে দেন।" সন্তান হারানোর আশঙ্কায় রেনুবালা দেবী সেই জায়গা দ্রুত ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। বহু কষ্টে পৌঁছেছিলেন নোয়াখালী, তাঁদের গ্রামের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে জীবন-যাপনের জন্য করতে হয়েছে ভিন্ন এক লড়াই। জমিতে চাষাবাদ করে জীবিকার সংকুলান করেছিলেন শিবেন্দ্র চন্দ্রের পরিবার। খাওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, "গ্রামের তো লতাপাতাই খাওয়া যায়।" খাওয়া-পরার কষ্টের পাশাপাশি তাঁর পরিবার তখন আরোও এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল। শিবেন্দ্র চন্দ্রের মা রেনুবালা দেবী স্বামী ও বড়ো সন্তানকে হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, "আমার মা অনেকদিন পাগলের মতো ছিলেন।" তাঁর মা এতটাই অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিলেন যে, যত্নের অভাবে তাঁর মাথার সব চুল দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীর মধ্যে এটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাঁরা রেনুবালা দের কাছে 'জলপড়া' নেওয়ার জন্য আসতেন। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন জট পড়ায় রেনুবালা দে'র মধ্যে নিশ্চয় কোনো দৈব ক্ষমতার আগমন ঘটেছে এবং তিনি বোধহয় সিদ্ধি জানেন। এতে চরম বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল শিবেন্দ্রচন্দ্রের পরিবারকে। এর থেকে উত্তরণের জন্য শিবেন্দ্রচন্দ্রের দিদিমা তাঁর মায়ের চুল কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সকল যাতনার কথা শিবেন্দ্রচন্দ্র এখনও ভুলতে পারেননি (শিবেন্দ্র চন্দ্র দে (শিবু), শহিদ খগেন চন্দ্র দের সন্তান, যোগাযোগ-স্থান: সেমিনার লাইব্রেরি, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ০৮/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে রচিত)।

মোঃ আবু জাফরের পিতা শহিদ আব্দুস সামাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)-এর চৌকিদার। ১৯৭১ সালের রাতে তাঁর বাবাও পাকবাহিনী কর্তৃক শহিদ হন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তাদেরকে আরো একটি নতুন জীবন-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। তাদের সেই যুদ্ধটা ছিল জীবন নির্বাহ বা বেঁচে থাকার লড়াই। কারণ তাঁর বাবা তাদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল। সেই আয় দিয়ে তাদের সংসার চলত। কিন্তু সেই আয়ের উৎস যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে যুদ্ধের অবরুদ্ধ নয়মাস কাটাতে হয়েছিল। মোঃ আবু জাফরের মা গোলাপ জান বিবি। তাঁর বাবা ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ হলে তাঁর মা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাবা যেহেতু তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিলেন এবং তাঁর বাবা হঠাৎ করে নিহত হওয়ার কারণে তাঁর মায়ের পক্ষে সংসার চালানো খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তাদের একটু সাহায্য করবে সেরকম কোনো সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। তাই তাদেরকে অনেক সংগ্রামমুখর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বাইরে ছিল পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ আর ভেতরে ছিল তাদের কোনোরকমে দুবেলা খেয়ে জীবনযাপন করার যুদ্ধ। যে যুদ্ধ ছিল অতি কষ্টকর। তাদেরকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। কোনো উপায় না পেয়ে জীবন রক্ষার জন্য মোঃ আবু জাফরকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়েছিল। এভাবে যুদ্ধের অবরুদ্ধ নয়মাস তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে এই ধরনের অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। আবু জাফরের মাকে অবরুদ্ধ নয়মাস তাঁর পরিবারকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম করতে হয়েছিল যা তাকে আরও একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। আর উপার্জনশীল স্বামীকে হারিয়ে আবু জাফরের মাকে অসম্ভব অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল (আবু জাফর রচিত 'শহিদ পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরা গর্বিত', *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ.২৮-৯ এ বিস্তারিত দেখুন)।

বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে বকুল রানী তাঁর সন্তানদের নিয়ে লোকজনের সাথে পাড়ি জমিয়েছিলেন জিঞ্জিরাতে। জিঞ্জিরায় গিয়ে তাঁর পরিচয় ঘটে একজন মুড়ি বিক্রেতা বিধবার সাথে। বকুল রানীর স্বামী শহিদ হয়েছেন জানতে পেরে মুড়ি বিক্রেতা বৃদ্ধা তাঁর পরিবারের সকলকে খাবার প্রদান করেছিলেন। তাদেরকে প্রায় এক সপ্তাহ নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন এই মুড়ি বিক্রেতা বৃদ্ধা। সেখানে বৃদ্ধার বাড়ির

লোকজনই বকুল রানীর সন্তানদের দেখাশুনা করেছে ঐ কতক দিন। এরপর সেই বাড়িতেও পাকিস্তানি সৈন্যরা হানা দিলো। বকুল রানী ঐ পরিস্থিতিতে তাঁর মেয়েকে সাময়িক সময়ের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্বামীহারা, সন্তানহারা বকুল রানী তাঁর কোলের পুত্র দিলীপকে নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় সঙ্গী-সাথিদের সাথে আবারো যাত্রা করেন অজানার উদ্দেশ্যে। জিঞ্জিরা থেকে প্রায় ৩০ মাইল হাঁটার পরে তাঁরা জল-খাবার খান এক মুসলমান চেয়ারম্যানের বাড়িতে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা চলে যান বিক্রমপুরের রাজানগরে। সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায় বকুল রানীদের। সেখানে এক মুসলমান বাড়িতে তাদের আশ্রয় জুটেনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ হওয়ায়। পরে অবশ্য তাদের জায়গা হয়েছিল সেখানকার চেয়ারম্যান বাড়ির একতলা বিল্ডিং-এর একটি রুমে। সেখানে তাঁরা প্রায় দেড় মাস আশ্রয় পেয়েছিলেন। এখানে থাকা অবস্থায় মেয়ের সাথে বকুল রানীর পুনর্মিলন ঘটে। পূর্বে জিঞ্জিরায় যেখানে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে একজন সহযাত্রী (পিসেমশাই) যাচ্ছেন শুনে বকুল রানী তাকে তাঁর মেয়েকে সাথে করে রাজানগর নিয়ে আসতে বলেন। তাঁর সে পিসেমশাই মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। জিঞ্জিরায় থাকা অবস্থায় সেখানে লোকজন তাঁর মেয়েকে অনেক খাতির-যত্ন করেছিল। তাঁর বাবা নেই শুনে রাজানগর ফেরার পথে অনেকে তাঁকে টাকা পয়সাও দিয়েছিলেন (চৌধুরী, ২০২০)।

রাজনগরের সেই চেয়ারম্যান রিলিফের চাল, ডাল এনে আশ্রয় নেওয়া বকুল রানী ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের দিতেন। সেগুলোই তাঁরা রান্না করে খেতেন। বকুল রানীর সাথে যারা ছিলেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মাসিক বেতন নিয়ে যেতেন। তাদের মাধ্যমে চৌদ্দটুলীর মেথরপট্টিতে থাকা বকুল রানীর এক ধর্মবোন খবর পাঠিয়েছিলেন বকুল রানীকে ঢাকায় নিয়ে আসতে। পরে তিনি বেতন নিতে ঢাকায় যাতায়াত করা সঙ্গীদের সাথে শহরে চলে এসেছিলেন। শহরে এসে চৌদ্দটুলীতে তাঁর ধর্মবোনের বাসায় যেতে সাহায্য করেছিলেন ক্যাফেটেরিয়াল মিনতি। সেখানে বকুল রানী তিন মাস অবস্থান করেন। ধর্মবোনের বাড়ির লোকজনই তাঁর ছেলে-মেয়েকে খাবার দিত। এসময় তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে নানা জায়গায় হন্যে হয়ে খুঁজেছে। তাঁর ভাসুরের কথামতো তাঁর দেবর বকুল রানী ও সন্তানদের খুঁজতে ছেড়া পোশাক পরেই ঢাকায় চৌদ্দটুলীর বাসায় চলে আসে। বকুল রানী তাঁর স্বামীর শোকে এত বেশি কাতর ছিলেন যে খাবার-দাবার ছেড়ে অনবরত কান্না করতেন। তাকে কেউ খুঁজতে এসেছে শুনে তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে তাঁর স্বামী ফিরে

এসেছেন। তখনকার পরিস্থিতিও এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বকুল রানী জানান, "আমি চাইর তলায় থাকতাম। ঐ নিচের তলায় এসে খুঁজছে, তখন একজন আইসা বলে যে, মাসি মাসি, মামা আসছে। তখন আমি ভাবছি যে, ওর বাবা মনে হয় আসছে। আমার দেবর আসছে, আমি মনে করছি ওর বাবায় আসছে। চার তলা থেইক্যা আমি ঐখানেই অজ্ঞান হইয়া পইড়া গেছি। তিন থেকে চার জন আমারে ধরাধরি কইরা নিচে নামাইছে। নিচে নামানোর পরে ঐখানে আইসা আবার দেইখ্যা আবার অজ্ঞান হইয়া গেছি। তিন ঘণ্টা ছিলাম। তিন ঘণ্টা পরে আমার জ্ঞান ফিরছে। ঐ রাতটা ছিলাম। পরের দিন আমাকে বাড়িত নিয়ে গেছে" (চৌধুরী, ২০২০)।

শ্বশুরবাড়িতে তিনি (বকুল রানী) ছিলেন চার থেকে পাঁচ দিন। বাবার বাড়ির লোকজন বকুল রানীর খবর পেয়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর বাবার বাড়িতেও পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করেছিল। বাবার বাড়িতে তিনি ছিলেন ৭ থেকে ৮ দিন। এইসময় মুক্তিবাহিনীর কয়েকজনের সাথে তাঁর পরিবারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা বকুল রানীর ছেলেদের কোলে নিয়ে বিস্কুটও খাইয়েছিল। একাত্তরের শ্রাবণ মাসে বকুল রানী অবস্থান করছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। এখানে থাকতেই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানিদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ধ্বংসযজ্ঞ। প্রথমবার জগন্নাথ হলে থাকার সময় চৈত্র মাসে। দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় শ্রাবণ মাসে। সেই দিনের বিবরণ দিয়েছেন বকুল রানী,

> ...পরে দেখি কী এই সাইডে দিয়া এক পার্টি পাঞ্জাবি ঢুকছে, আমাগো চেক কইরা বাইর হইয়া গেছে। আবার ওই দিক দিয়া আরেক পার্টি আসছে। আইসা ঘরবাড়ি সব চেকটেক কইরা ঘরের মধ্যে গুঁড়াটুড়া দিয়া আগুন ধরায়া দিছে। আমি তো দেখছি ঢাকায়। আমি পাটক্ষেতে গেছি। পাটক্ষেতে জলের ভেতরে খাড়ায়া ছেলেটারে উঁচা কইরা ধইরা রাখছি। রাখার পরে আমার মেয়ে কোথায় তা আমার কোনো খোঁজখবর নাই। আমার শ্বশুর আবার আমার মেয়েটাকে নিয়া অন্যদিকে গেছে, তারপরে বাড়ি পোড়ার পরে, আমি তো জলের ভেতর থিকা বাড়ি আসছি। আইসা দেখি কি, আমাগো কুমোড় গাছ ছিল, ওই কুমোড় সিদ্ধ হইয়া রইছে। ওই সিদ্ধ কুমোড় সবাই খাইতেছে। আর কিছু নাই খাওয়ার। যা ছিল সব পুইড়া ফালাইছে। সকালে এই ঘটনা ঘটছিল। তারপরে এই কুমোড় খাইয়া আমরা একদিন কাটাইছি।...

এই দিনের পর বকুল রানীর বাবা তাঁকে এসে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি ছয়মাস ছিলেন। স্বাধীনতার পরে এক থেকে দুই দিন শ্বশুর বাড়িতে থাকেন তিনি।

এরপর ঢাকা থেকে তাঁর ভাইয়ের চিঠি পেয়ে চলে আসেন জগন্নাথ হলে (চৌধুরী, ২০২০পৃষ্ঠা: ১৩০)।

বকুল রানীদের এই যুদ্ধের মাসগুলো অভাব অনটনের পাশাপাশি আতঙ্কের মধ্য কেটেছিল। বাবার বাড়িতে আশ্রয় পেলেও তাঁদের অবস্থা খুবই করুণ ছিল। সচ্ছলভাবে চলার মতো কোনো পথ তাদের ছিল না খোলা। জায়গা-জমিও ছিল না। খাবারের জন্য অনেক সময় মানুষের বাড়ি থেকে পাওয়া সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। স্বামীকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বকুল রানীর পক্ষে তাঁর পরিবারকে সামলিয়ে রাখা, স্বাভাবিকতা বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল (দিলীপ কুমার, শহিদ সুনীল চন্দ্র দাসের সন্তান, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়: দুপুর ১২টা-১টা, তারিখ: ০৫/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লিখিত)।

হোসেনী দালান থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ ২৭শে মার্চ থেকে শহিদ মনভরণ রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী দেবী ও তার পরিবারের লোকজন নতুন এক জীবনসংগ্রামে সামিল হয়। দেশের সব জায়গায় পাকিস্তানিরা যখন ধ্বংস-যজ্ঞ চালাচ্ছিল, তখন কেমন ছিল এই পরিবারের অবরুদ্ধ জীবনযাত্রা তা জানা যায় রাজকুমারী দেবীর ভাষ্য থেকে। হোসেনী দালানে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় দেড় থেকে দুইশ লোক। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা। মসজিদের খাদেমরা যখন তাদেরকে আর আশ্রয় দিয়ে না রাখতে পারার কথা জানিয়েছিলেন, তখন রাজকুমারী কী করবেন, কোথায় যাবেন, বুঝতে পারছিলেন না। ঢাকার সব জায়গায় তখন গণ্ডগোল চলছিল। এই সময় কিছু লোক বলেছিল মেডিক্যালের দিকে যাওয়ার কথা। মেডিক্যালে রাজকুমারীদের লোকের মাধ্যমে জানাশোনা ছিল বলে তাঁর ভাসুর সেখানে গিয়ে একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। ঘরটি ছিল মূলত লাশঘরের পাশের একটি পরিত্যক্ত ক্লাসঘর। সেখানে তাঁরা সপ্তাহখানেক অবস্থান নিয়েছিলেন। এই কয়েকদিনের খাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজকুমারী উল্লেখ করেন,

> ....খাওয়া-দাওয়া হইতো না। কেউ দিতেন পাউরুটি, কেউ বিস্কুট, কেউ ভাত বাসা থেকে দিয়ে গেছে। বাচ্চারা খায়, এই করে আতঙ্কে দিন যাইত। স্টাফ ছিল কিছু। কিছু আত্মীয়-স্বজন খবর পাইয়া, কেউ পাউরুটি নিয়া আসতো, কেউ বিস্কুট নিয়ে আসতো। এতটুকু ভাতই ছিল বাচ্চাদের জন্য। তারপর আবার কয়েকটা মহিলা সাহসী ছিল। তারা আবার লাশ ঘরের পাশের বারান্দায় রান্না করে দিত চাল, ডাল আইনা। ওইখান থিকা বাচ্চাদেরকে দিত। খাওয়া হইত... (চৌধুরী, ২০২০, পৃষ্ঠা: ১২৩)।

সপ্তাহখানেক মেডিক্যালে অবস্থানের পর তাঁরা মিরিনজিলার মেথরপট্টির এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাজকুমারীর পরিবার শুধু এককভাবে মিরিনজিলায় গিয়ে আশ্রয় নেননি। তাঁরা অন্যান্য পরিবারগুলোর সাথে একত্রে থাকতেন। রাজকুমারীর কাকি-শাশুড়ির দিক-নির্দেশনায় তিনি তাঁর তিন সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে আশ্রয় নেন মিউনিসিপালিটিতে চাকুরি করা এক আত্মীয়ের বাড়িতে। চাকুরী করা সেই আত্মীয় তাদের দুর্দশার কথা শুনে গোয়ার পট্টিতে একটি খালি ঘরে থাকতে দিয়েছিল। এখান থেকে রাজকুমারী একবার গ্রামেও গিয়েছিলেন। সেখানেও মিলিটারির আক্রমণের আশঙ্কা-আতঙ্কে তাঁরা শুধু দৌড়ের উপরেই থাকতেন। গ্রামে অবস্থানকালে তাদের সাক্ষাৎ হয় মুন্সীগঞ্জের টুঙ্গিবাড়ি গ্রামের চেয়ারম্যানের সাথে। চেয়ারম্যান তাদেরকে ঢাকা ফেরত আসার পথের বিপদের কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন। তাঁরা হিন্দু জনগোষ্ঠীর হওয়ায় বিপদটি যে আরো প্রকট রাজকুমারী তা বুঝতে পারেন। তখন সে চেয়ারম্যানের পরামর্শ ও তাঁর লোকজনের সহায়তায় বোরখা পরে রাজকুমারীরা ঢাকার মিরনজিলাতে চলে আসেন। এখানেই তাঁরা যুদ্ধের বাকি দিনগুলো পার করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের/হিন্দু ধর্মালম্বী হওয়ার কারণে গ্রামে অবস্থানকালীন এ পরিবারের অভিজ্ঞতার সারকথা ছিল এমন, “প্রথমে তো সবাই মনে করেছিল.. মুসলিম দুইজন। কিন্তু পরে গ্রামে গিয়ে শুনি যে, হিন্দু রাইখো না, হিন্দু রাইখো না। রাখলে বিপদ আছে। সবার জীবনের ভয় আছে। তখন আমি এই মেথরপট্টিতে নয়মাস থাকলাম।” যুদ্ধের পরে রাজকুমারী দেবী তাঁর পরিবারসহ অন্যান্য শহিদ কর্মচারী পরিবারের মতো জগন্নাথ হলে ফেরত আসেন। পরে শহিদ পরিবারের সদস্যদের মাঠের স্থানে থাকতে দেওয়া হয় (চৌধুরী, ২০২০)।

জগন্নাথ হল-এর মাঠে ফেরত এসে তাঁরা কীরকম অবস্থা অবলোকন করেছিলেন তা জানা যায় রাজকুমারী দেবীর পুত্র বিমল রায়ের ভাষ্য থেকে। জগন্নাথ হলের মাঠে এসে তাঁরা নিদারুণ দৃশ্য দেখতে পান। মিলিটারি কর্মচারীদের আবাসস্থল আগেই পুড়িয়ে দিয়েছিল। ফেরত এসে চাটাই ও চটের ছালা দিয়ে কোনোরকমে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। এরপর বঙ্গবন্ধু শহিদ পরিবারগুলোকে দুই হাজার টাকা করে দান করেছিলেন। এই অর্থ দিয়ে বিমল রায়ের মা টিনের ঘর তুলে বসবাস করতে শুরু করেন (বিমল রায় রচিত ‘আমার বাবা শহিদ মনভরণ রায়’, *যাত্রিক*, বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ২৫ মার্চ ২০২৩, পৃ.৪৫-এ বিস্তারিত দেখুন)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই যুদ্ধ শুধু যুদ্ধের ময়দানে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রাকে। স্বাধীনতার পরে যুদ্ধকালীন ঘটন ও অঘটনের প্রেক্ষিতে অনেক মানুষ মানবিক সংকটের মুখে পড়েছিলেন। এই মানবিক সংকটের একটি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় বকুল রানীর যুদ্ধ-পরবর্তী জীবনচর্চাতে। স্বামীকে হারিয়ে মানসিকভাবে বকুল রানী যে তীব্র আঘাত পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় বকুল রানীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ইমতিয়াজ আহমেদের লেখা *Historicizing 1971 Genocide* গ্রন্থে,

> ....On a bright sunny day Bangladesh achieved its ultimate glory, its independence. Bokul returned to Dhaka. She lined with the employees of Jagannath Hall, but she could not sleep because she was frightened. She was very young at that time. Her children slept but she passed sleepless nights. Sitting under the mosquito net. In the morning when everyone went out for work, Bokul's tired eyes closed down. It was a rest for her eyes, but Bokul had no rest. She had to fight the battle of her life, even long after the battle for Bangladesh was over...(Ahmed, 2009, p:88).

শহিদ হাফিজ উদ্দিনের ছেলে মিন্নত আলীর কাছ থেকে পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন তাঁদের জীবনের গল্প। তাঁর বাবা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকবাহিনী কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছিল। তাঁর মায়ের নাম হাজী জামিলা খাতুন। তাঁর বাবা যখন শহিদ হন তখন মিন্নত আলীর বয়স ছিল তিন বছর। তাদের পরিবারে তাঁর বাবা ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। কিন্তু সেই একমাত্র উপার্জনকারী বাবা যখন ২৫শে মার্চ শহিদ হন, তখন তাঁদের পরিবারের উপর নেমে আসে বিপর্যয়। যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ নয়মাস ছিল তাদের জন্য এক দীর্ঘতম পরীক্ষা। এই নয়মাস তাদের হাতে না ছিল টাকা, না ছিল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা। তাঁদেরকে অনেক কষ্ট করে চলতে হয়েছিল। আর স্বামী হারিয়ে তাঁর মা জামিলা খাতুন হয়ে গিয়েছিলেন এক অসহায় ব্যক্তি। তাঁর মায়ের একমাত্র সম্বল ছিল মিন্নত আলী।

আবার এই সময় তাদের কাছে কোনো নগদ অর্থ ছিল না। এই মহাদুর্যোগের সময় জামিলা খাতুন তাঁর বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিন্নত আলী বলেন, "আমাদের কাছে টাকা পয়সা তেমন ছিল না।" তাঁদের খাওয়া দাওয়াসহ যাবতীয় খরচ মেটানো হতো তাদের মামাবাড়ির মাধ্যমে। তাঁদের বাড়ি ছিল ভৈরবের নন্দিয়া গ্রামে। নদীর ওপারে অবস্থিত হওয়ায় তাদের গ্রামে আর্মি আক্রমণ করতে পারেনি। তবু এই অবরুদ্ধ সংগ্রামের সময় তাদেরকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়েও যেতে হয়েছে। যা ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই। অবরুদ্ধ নয়মাসের স্মৃতি তাকে এখনও তাড়া করে বেড়ায়। যখনই এই ভয়াবহ স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে তখনই ভেঙে পড়েন এবং গভীরভাবে আহত হন। কারণ স্বামী ছাড়া অবরুদ্ধ নয়মাস ছিল জামিলা খাতুনের জন্য সংগ্রামের চেয়ে বেশি কিছু। একমাত্র ছেলে মিন্নত আলীকে নিয়েই এই সময়টা অতিবাহিত করতে হয়েছে। মিন্নত আলীকেও ২৫শে মার্চ তাঁর বাবাকে হারিয়ে এক ভয়ংকর সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই নয়মাসের মধ্যে তাঁর পরিবার কখনও ঢাকায় আসেনি। গ্রামের বাড়িতেই থেকেছেন পুরোটা সময় (মিন্নত আলী, শহিদ হাফিজ উদ্দিনের সন্তান, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, সময়: সকাল ১১টা-১২টা, তারিখ: ০৬/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

২৭শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জানা যায় মোহাম্মদ মোশারফের বক্তব্য থেকে। তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর বাবার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তখন পাকিস্তানি আর্মি নদী পার হয়ে তাদের গ্রামের মাঝখানে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তিনি এবং তাঁর বড়ো ভাই ঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন। পাকবাহিনী তাদের গ্রামে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ করেছিল। তাঁদের গ্রামে যারা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাঁদের ধরার জন্য পাকবাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজছিল। কিন্তু পাকবাহিনী কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে পায়নি। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা পানিতে লুকিয়ে ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে না পেয়ে এই গ্রাম থেকে চলে যায়। মোশারফসহ আরো অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন রকমের খাবার পাঠাতেন। মুক্তিযুদ্ধের এই অবরুদ্ধ নয়মাস তাদের অনেক আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁদের কাছে ৬০ টাকা দিয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারের কিছু জমি ছিল তবে এই সময় জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়েছিল। অন্যের জমিতে কাজ করা, ঘর মোছাসহ আরও অনেক কাজ করতে

হয়েছে। মো. মোশারফ জানান ঐসময় মানুষ মানুষকে সাহায্য করতো। কারো কাছে পাঁচ টাকা থাকলে এক টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয়ের খবরটি পেয়েছিলেন যারা ঢাকা থেকে গ্রামে আসা যাওয়ার মধ্যে ছিলেন তাদের কাছ থেকে। তার মধ্যে আব্দুল মতিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের নির্বাহী প্রকৌশলী। তার পাশের গ্রামের একজন ঠিকাদারও ছিলেন। মোশারফ যখন বাংলাদেশের বিজয়ের খবর খবর শুনতে পান তখন তার একদিকে আনন্দ আর অন্যদিকে চোখে অশ্রু। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। পাকবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেল। বাবা আজ বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতো।" তবে তাঁর আফসোস যে, তিনি তাঁর পিতাকে কবর/ দাফন করার সুযোগটি পাননি। শহিদ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি খুব গর্বিত অনুভব করেন। তিনি মনে করেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তাঁর বাবা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। সে হিসেবে তাঁর গর্ব হয়। তিনি বলতে পারেন যে তাঁর বাবা দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তির দিন তাঁর হাতে বিজয়ের পতাকা ছিল। তিনি বলেন "কী পেয়েছি না পেয়েছি এটা বড়ো বিষয় না, দেশ স্বাধীন হয়েছে।" ১৯৭২ সালে আবার তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন (মো. মোশারফ, শহিদ আহমদ আলী ফরাজির সন্তান, যোগাযোগ-স্থান- সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময়: সকাল ১১টা-১২টা, তারিখ: ০৫/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)

এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষের আগে শহিদ মধুসুদন দে'র পরিবারের অবরুদ্ধ জীবনের বর্ণনা প্রদান করা বাঞ্ছণীয়। মধুসুদন দে'র সন্তান অধীর চন্দ্র দে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নয়মাসের স্মৃতিচারণে বলেন, এত বছর হয়ে গিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের, তবু এখনও পাকবাহিনীর দেওয়া সেই সময়ের ক্ষত রয়ে গেছে। তাঁর বড়ো বোন রানু রায় হাসপাতালে থাকা অবস্থায় বলাই নামক একজন ব্যক্তি যিনি সম্পর্কে মামা হন এবং মধুসূদন দে'র একজন বন্ধু হীরালাল অধীরচন্দ্রসহ তাঁর অন্য ভাইবোনদের নিয়ে হীরালালের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে রানু রায়কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মনির হোসেন বাচ্চু শ্রীনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের গ্রামের বাড়িতে। রানু রায় ছাড়া অধীর চন্দ্র দে ও তাঁর অন্যান্য ভাই-বোন হীরালালের বাড়ি সাভারে এগারো দিন অবস্থান করে শ্রীনগরে গ্রামের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা রানু রায়ের গ্রামের হাসপাতাল থেকে বড়ো অপারেশন হয়েছে এবং কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। বোনকে সুস্থ দেখে অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে

পড়েছিলেন তিনি। তবে পিতা-মাতাহীন ভাই-বোনগুলো অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। অধীর চন্দ্র দে'র মতে সেই ঘটনার কিছুদিন পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁদের হাতে কোনো টাকা ছিল না। খাবার মতো কিছু ছিল না। ঢাকার বাড়ি থেকে আনা পিতলের থালা-বাটি বিক্রি করে তাঁদের খেতে হয়েছিল। এমনকি বাড়ির টিনের চালটিও বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। তাঁরা তখন একইসাথে অভিভাবকত্বহীনতা এবং দরিদ্রতার কষাঘাত সহ্য করছিল। নিত্যসঙ্গী ছিল আতঙ্ক। তাছাড়া তাঁরা হিন্দু হওয়ায় ভয়টাও ছিল বেশি। সেনাবাহিনী তখন আশেপাশের গ্রামগুলোতে প্রায়ই আক্রমণ করছিল এবং আতঙ্ক শ্রীনগরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে খবর পান রাজাকারদের সহায়তায় পাকবাহিনী তাঁদের গ্রামের দিকে আসছিল। তাই তাঁরা নিজেদের বাড়িও ছেড়ে দেন এবং ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে শরণার্থী হিসেবে ছিলেন। সেখানেও তাদেরকে কষ্টের মধ্যে কোনোরকমে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর নিজ দেশে আবার ফিরে আসেন সেই চিরচেনা দুঃখময় স্মৃতি বিজড়িত স্থানে (Ahmed, 2009)।

মধুসূদন দে'র ছোটো ছেলে অরুণ দে যুদ্ধের সময় বেশ ছোটো ছিলেন। তবু তাঁর স্মৃতিতে এখনো তাঁর বাবা, মা, দাদা ও বৌদি অম্লান। ২৫ শে মার্চে ঘটে যাওয়া সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্বিষহ ঘটনার কথা মনে আছে তাঁর। পরিবারের অভিভাবকদের হারানোর পর কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাদেরকে। যুদ্ধসময়ের কিছুদিন কাটান তাদের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরের শ্রীনগরে। তারপর যখন গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায় পাকবাহিনীর আক্রমণের, তখন নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ে চার দিন চার রাত হেঁটে ভারতের ত্রিপুরায় পৌঁছেছিলেন তাঁরা। সেখানেই তাঁরা কাটান যুদ্ধের বাকি সময়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসে দেখেন যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাদের ক্যান্টিন ভেঙে ফেলেছিল। পরবর্তীতে ছাত্রনেতাদের সহায়তায় নতুন করে চালু হয়েছে মধুর রেস্তোরাঁ (চৌধুরী, ২০২০)।

মধুদা'র পরিবারের সাথে সার্বক্ষণিক ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকা মনির হোসেনের বাচ্চুর ভাষ্য এই পর্যায়ে তুলে ধরা প্রয়োজন। মনির হোসেনের কাছ থেকে জানা যায় মধুদা'র পরিবারের সদস্যরা, যারা ২৫শে মার্চ ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক অদম্য লড়াইয়ের কথা। মধুদা'র মেঝো মেয়ে রানু দে'কে হাসপাতাল থেকে এনে চুনকুইট্টা নামক স্থানে বোনের বাসায় রেখে এসেছিলেন।

এর মধ্যেই তিনি একবার মধুদা'র বাসার অবস্থা দেখতে সেখানে যান এবং দেখেন ঘর তালাবদ্ধ এবং ভেতরে মধুদার পরিবারের অন্য সদস্যদের মৃতদেহ। তারপর মধুদার পরিবারকে নিয়ে তিনি শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পৌঁছাতে কিছু রাস্তা নৌকার গুন টেনে এবং কিছু রাস্তা বৈঠা দিয়ে, আবার কিছু রাস্তা দ্রুত যাওয়ার জন্য কাঁধে গুন টেনে ভেঙে ভেঙে রাস্তা পার হয়েছিলেন। শ্রীনগরে যাওয়ার পর সেখানের হাসপাতালের ডাক্তার বুঝতে পারেন যে, রানু দে'র শরীর ভেদ করে একটা গুলি বের হয়ে গেলেও আরেকটা গুলি চোয়ালের ভেতর রয়ে গিয়েছিল। তাই অতি দ্রুত সেখানেই গাল কেটে গুলি বের করা হয়। শ্রীনগরে মধুদা'র চৌচালা একটি বাড়ি ছিল। যার চারটা রুম ছিল। যাওয়ার সময় তাঁরা সাথে করে তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারেননি। তাই মনির হোসেনকে পরের দিনই আবার ঢাকায় যেতে হয়েছিল। মধুদা'র পরিবারের সদস্যদের ভাষ্যমতে, কাপড়-চোপড় ও কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে আবার শ্রীনগরে ফিরে যান। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার শ্রীনগর থেকে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন হলে, কখনো কাসার কিছু জিনিস বা পিতলের কিছু দ্রব্য যেমন থালা, বাটি, কলসি নিয়ে ঢাকার বাসা থেকে শ্রীনগরে যেতেন। এগুলো শ্রীনগর বাজারে বিক্রি করতেন মধুদা'র পরিবারের নিত্য খরচ মেটানোর জন্যে। এগুলো বিক্রির টাকা দিয়েই তখনকার বাজার খরচ চলেছে। এভাবে একদিন ঠিক করলেন ঢাকায় থাকা একটা ২ মণের চালের বস্তা নিয়ে যাবেন শ্রীনগরে। মধুদা'র তালাবদ্ধ রুমটাতে তখনো তিনটা লাশ এবং রুমে রক্তের মধ্যে গোড়ালি অব্দি ঢুকে যাচ্ছিল। মনির হোসেন ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, লাশগুলো কালো হয়ে আছে এবং মধুদার স্ত্রী যোগমায়া দে'র পেট ফেটে গর্ভে থাকা বাচ্চাটা বের হয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। যোগমায়া দেবী ছিলেন সবার অত্যন্ত প্রিয়। ড. রোজিনা বেগম যোগমায়াদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "স্বামীর মতো তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে ছিলেন প্রিয় মানুষ এবং পাকিস্তানের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি তাদের সহায়তা করতেন। অসহযোগ আন্দোলন-পর্বে ছাত্র নেতারা সরাসরি মধুদা'র কাছে না যেয়ে যোগমায়াদের মাধ্যমে খবর পাঠাতো মধুদাকে" (ড.রেজিনা বেগম, *মুক্তিযোদ্ধে নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকা একটি পর্যালোচনা*, প্রস্তাবিত প্রবন্ধ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।)

গণহত্যা ঘটনার দুদিন পর মনির হোসেন ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, সিটি কর্পোরেশন থেকে লোকজন এসে লাশ সরিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছিল। তখন তিনি চালের বস্তাটি কিছু জায়গা মাথায় করে, তারপর রিকশা, তারপর আবার নৌকা, তারপর বাস, অতঃপর আবার নৌকা এবং বাড়ির পথটুকু মাথায় করে শ্রীনগরের বাড়িতে চালের বস্তাটি নিয়ে আসলেন। যদিও সেই চালটা আর খাওয়া যায়নি। কারণ চাল রক্ত শুষে নিয়েছিল তাই উৎকট গন্ধ করছিল। মনির হোসেন তখন মধুদার ছেলেমেয়েদের সাথে থাকতেন এবং তাদের সাথেই খেতেন। হঠাৎ একদিন চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল পাকিস্তানিরা গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে শ্রীনগরের দিকে আসছে। তখন সেখান থেকে মধুদা'র বড়ো মেয়ের দেবরের বাড়ি শ্রীনগরের ভেতরে সুবোইধ্যা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য শুনেছিলেন পাকবাহিনী পাশের গ্রাম তালতলী জ্বালিয়ে দেওয়ার পর আর শ্রীনগর আসেনি। তখন তাঁরা আবার শ্রীনগর চলে এসেছিলেন। এর কিছুদিন পর শ্রীনগরের বাড়িতে কয়েকজন আসে যাঁদের গোয়ালঘরে রাখা হয়েছিল এবং রুটি বানিয়ে খাইয়েছিলেন। এরকম কাজ তিনি আগেও করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যখন মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে, সেখানে মধুর ক্যান্টিন থেকে যেসব খাবার অর্ডার করা হতো, তা তিনিই পৌঁছে দিতেন। যুদ্ধের সময়েও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থা এবং আর্থিক তেমন কোনো সংস্থাপন না থাকায় মধু দে'র পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতে চলে যাওয়ার। তখন মনির হোসেনও তাঁদের সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের অনেক বন্ধু-বান্ধব তাকে যেতে দিতে চাচ্ছিল না ভারতে। তাই তিনি তাদের চোখ এড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন। এমনকি মা-বাবা ও আত্মীয়দের সাথেও দেখা করে যাননি যদি তাকে যেতে না দেয়। অনেকেই বলেছিল, "তুই মুসলমান মানুষ, হিন্দুদের সাথে যাবি?" ভারতের উদ্দেশ্যে শুরু হয় মধু দে'র পরিবারের সদস্যদের সাথে মনির হোসেনের এক অজানা যাত্রা। প্রথমে গুদারা পার হয়ে মদনগঞ্জ যান এবং তারপর উজানচরে। সেখানে পরিচিত একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। তারপর ভারতের বর্ডার পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। আগরতলা সীমান্ত দিয়ে ট্রাকে করে একশ মাইলের মতো ট্রাকে যান আসামের দিকে। তারপর আসাম থেকে বেশ কয়েক ভাগে ট্রেনে করে লামডিং যান। যেখানে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা তাদেরকে নিরামিষ খাবার দিতেন। পিতলের বালতিতে করে লাউ, কুমড়া এরকম পাঁচ সবজির নিরামিষ দিত। কলকাতায় মধু দে'র মেয়েজামাইয়ের এক মামা বেলগুড়িয়ায় ছিলেন। সেখানে কিছুদিন ছিলেন। তাঁদের দুইজন মাসি টালিগঞ্জে ছিল, সেখানে গিয়ে

কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তাঁরা বড়ো বড়ো মসুর ডাল ও আটা রেশন পেতেন, সেগুলোই খেতেন। টালিগঞ্জে মাসির স্বামী তখন ফুটপাতে ব্যবসা করতেন। তাঁর সাথে মনির হোসেনও যোগ দিলেন। সেখানে কমলা কিনে বিক্রি করতেন। তারপর এভাবেই দিন চলছিল। দেশ যখন স্বাধীন হলো, তখন তাদের নিয়ে আবার দেশে ফিরে আসেন (মনির হোসেন বাচ্চু, বয়স-৭৫, যোগাযোগ-স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সময়- দুপুর-২.৩০, তারিখ: ১২/১১/২০২৩ এর সাক্ষাৎকার হতে সংগৃহীত)।

৪.৩. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা – কয়েকটি পর্যালোচনা

৪.১ এবং ৪.২ এ বর্ণিত তথ্য ও বক্তব্য থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. ২০শে জুন ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে যোগদান না করা কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুত করে এবং তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, এই তালিকায় ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ কর্মচারীদের নামও ছিল।

খ. পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও ক্লাস চলছে এমন দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনা ঘটলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গ. জনশূন্য অবস্থায় জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হলে লুণ্ঠন ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। এর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সংযোগ আছে কি না এমন অভিযোগ দিয়ে কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে।

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা কর্মচারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য (অস্ত্র লুকানো, বোমা বহন, মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি) করেছেন এমন উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার খোঁজে ঢাকা ত্যাগ করে বাড়ি যাওয়ার সময় পথে নানা ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন। প্রয়োজনের সময় মসজিদে হিন্দু, মুসলমান সকলেই আশ্রয় পেয়েছেন এমন বক্তব্যও পাওয়া গেছে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সহায়তা করে, পথে মুড়ি বিক্রেতাসহ বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা পেয়েছেন এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে।

চ. শহিদ কর্মচারীর স্ত্রী তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে গ্রামে খাওয়ার কষ্টে কাটানোর উদাহরণ পাওয়া গেছে। যত্নের অভাবে চুলে জটলা পড়ে যাওয়া আবার তা দেখে গ্রামবাসীরা 'জলপড়া' নিতে আসার ঘটনা ঘটেছে।

ছ. প্রিয়জনের ফেরার জন্য কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের উদ্‌বেগ এবং কখনও কখনও মানসিক সমস্যা তৈরী হওয়ার কথা এসেছে।

ঝ. পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখেছেন কর্মচারী ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যরা।

ঞ. হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না করে শহিদ পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে ভারতে নিয়ে গিয়ে এবং ভারতে অবস্থানকালে ফুটপাতে ফল বিক্রি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী এমন উদাহরণ পাওয়া গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক মৌখিক ইতিহাস
মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য

মৌখিক ইতিহাস (Oral history) হলো ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের একটি শাখা। এটি ঐতিহাসিক নথি, ব্যক্তিগত বিবরণ ও স্মৃতি সংগ্রহ করে। তুলনামূলক মৌখিক ইতিহাস (Comparative oral history) হলো বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ বা ঐতিহ্যের মৌখিক ইতিহাসের মধ্যে তুলনা করার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারেন এবং সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। মৌখিক ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বিভিন্ন উৎস ও জনগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত ইতিহাসের বিবরণগুলোর মধ্যে মিল ও পার্থক্যগুলো অধ্যয়ন করা হয়। মৌখিক ইতিহাসে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিচয়ের মিল ও পার্থক্য, প্রেক্ষাপট, পদ্ধতিগত এবং ব্যক্তিগত চিন্তার প্রভাব ইতিহাস বিষয়কে বিবেচনা করতে হয়। গবেষণা-প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তুলনামূলক মৌখিক ইতিহাসের উপস্থাপনা বিভিন্ন অবস্থান ও রূপ ধারণ করতে পারে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে অন্যতম গৌরবের বিষয়, একইসাথে দুঃখ-শোকেরও। রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলাদেশের মানুষ আজ যে স্বাধীনতা অর্জন করছে সেই স্বাধীনতা এসেছে লক্ষ প্রাণ ও বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা চালিয়েছে। হতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ছিল এমন এলাকায় তাদের তদারকি, আক্রমণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে তাদের কার্যক্রমের এইসব তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের ইয়ত্তা জাহির করলে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে সকল এলাকায় পাকিস্তানি আর্মি প্রবেশ করেছে সেই সকল এলাকার মানুষজনের অভিজ্ঞতা এবং যে এলাকায় পাকিস্তানি আর্মি প্রবেশ করেনি সে এলাকার মানুষজনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। এই ভিন্নতার পার্থক্য মানুষজনের পেশার ভিত্তিতে দেখানো যায়; দেখানো যায় পাকিস্তানিদের যাতায়াতের সুবিধা বা দখলকৃত স্থানের অবস্থানিক গুরুত্বের ভিত্তিতে

কিংবা দেখানো যায় ধর্মীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষজনের প্রতি পাকিস্তানিদের মানসিকতার মাপকাঠিতে।

একাত্তরে শহরের মানুষেরা যে বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, গ্রামের চিত্র ছিল তার থেকে ভিন্ন। যারা কৃষিজীবী কিংবা দিনমজুর পরিবারের সদস্য ছিলেন, তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতা সরকারি বা আধা-সরকারি চাকুরিজীবীদের থেকে আলাদা। ভিন্নতা উপস্থাপন করা সম্ভব যে পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি পাকিস্তানিদের হাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, সেই পরিবারের সার্বিক অভিজ্ঞতার সাথে অন্যদের পরিবারের সার্বিক অভিজ্ঞতার। যে সকল অঞ্চলে পাকিস্তানিরা হামলা চালিয়েছে বা হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছে, সেইসব অঞ্চলের মানুষরা যে শুধু যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের দামামায় প্রভাবিত হয়েছে। যে সকল স্থানে পাকবাহিনীর নিশানা কম ছিল, সে সকল স্থানের মানুষজন এক উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছে। অবরুদ্ধ দিনগুলোতে ঢাকার কথাই ধরা যাক। এই শহরে অবস্থানকারীদের জীবনে নেমে এসেছিল এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার অধ্যায়। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা হস্তক্ষেপ করেছিল। দৈনন্দিন চলাফেরাতে আরোপিত হয়েছিল নানা ধরনের বিধিনিষেধ। এসব বিধিনিষেধের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরাও বাদ পড়েননি। নিরাপত্তার জন্য কিংবা আর্থিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যেই হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থানরত কর্মচারীরাও পার করেছেন উৎকণ্ঠার জীবন। উৎকণ্ঠার জীবন অতিবাহিত করেছেন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী মানুষজনও। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত কর্মচারীদের উৎকণ্ঠার সাথে অন্যান্য পেশার মানুষজনের উৎকণ্ঠার পার্থক্য সম্ভবত/মূলত 'উপলক্ষ'-তে যে-কোনো প্রেক্ষিতে তাঁরা উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন। শুধু ঢাকা বা রাজধানী সংলগ্ন এলাকায় নয়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেওয়া বাঙালিদের জীবনাভিজ্ঞতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অবরুদ্ধ জীবনের একটি তুলনামূলক উপস্থাপন এই গবেষণার বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

এই অধ্যায়ে আলোচিত তুলনামূলক কেস-স্টাডির ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে ঢাকা শহর, নরসিংদী, খুলনা, বাগেরহাট ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামকে। পৃথক বাতায়নে নয়; ক্ষুদ্রাকারে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করা হয়েছে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অবরুদ্ধ জীবনযাত্রার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কর্মচারী পরিবারের অবরুদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের গণহত্যার শিকার হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের মধ্যে একটি অংশ ছিল জগন্নাথ হলের অবস্থান/বসবাসরত হিন্দু কর্মচারী। হিন্দু কর্মচারী জনপ্রিয় মধুসুদন দে (মধু দা) -এর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের জীবিতরা ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব বিবেচনায় হিন্দু কর্মচারীদের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা ও বাগেরহাট জেলার রামপালের দু'টি গ্রামকে। এই দুই গ্রামের অধিকাংশ হিন্দু জনগণকে ভোগ করতে হয়েছে শরণার্থী জীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা।

নরসিংদী জেলাকে কেস-স্টাডির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এটির সাথে ঢাকা শহরের সংশ্লিষ্টতাকে বিবেচনা করে। নরসিংদীর একটি গ্রামে পাকবাহিনী আক্রমণ করেনি। এই গ্রামের মানুষজনের জীবনযাত্রার সাথে ২৫শে মার্চের পরে আর মিলিটারির আক্রমণের শিকার না হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিবেচনা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ ক্যাম্পাসে অবস্থান না করে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতার সাথে কুমিল্লা জেলার পিপুলিয়ার অধিবাসীদের অভিজ্ঞতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পিপুলিয়ার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতাও এখানে তুলে ধরা হবে।

ঢাকা শহরে বসবাসকারীদের জীবনাভিজ্ঞতার জন্য বিভিন্ন স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ, *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র* ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রামের পরিস্থিতি বিবেচনায় আফসান চৌধুরী সম্পাদিত *বাংলাদেশ ১৯৭১*, *গ্রামের একাত্তর*, *হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর* ও অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থসহ আরও কিছু উৎস বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.১. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য– কিছু তুলনামূলক চিত্র

৫.১.১. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও অন্যান্য– কিছু তুলনামূলক চিত্র : সংগৃহীত তথ্যের আলোকে

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কয়েকটি হলের পাশাপাশি ২৫শে মার্চ রাতে গণহত্যা চালিয়েছে জগন্নাথ হলে। পরবর্তীকালে তারা সময়ে সময়ে এমন গণহত্যা পরিচালনা করেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এই গবেষণার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ২৫শে মার্চের আক্রমণের আগে কেউ কেউ হল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন বা অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। যদিও এ ভাবনাকে বাস্তবতায় রূপ দিতে পেরেছিলেন খুব কমসংখ্যক কর্মচারীর পরিবার। তখন তাঁদের মাঝে এই আতঙ্ক ছিল না যে, আক্রমণে আসলেই কর্মচারীদেরকে হত্যা করবে পাকিস্তানিরা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্যান্য হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ চালাতে পারে এমন খবর চাওড় হয়ে গিয়েছিল এবং বাস্তবে ঘটেছিলও তেমনটাই। জগন্নাথ হলে হিন্দু নিধনকর্মের খবর দ্রুতই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব জানার পর থেকে একরকম আতঙ্কের মধ্যে থাকলেও ভারতে না গিয়ে আপন ডেরায় বসবাস করে যাচ্ছিলেন বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ডাকরা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দারা। জগন্নাথ হলের কর্মচারীরা অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন; কিন্তু এখানকার হিন্দুরা পূর্ব-ধারণা রেখেছিলেন যে, তাঁদের ওপর আক্রমণ আসতে পারে। এমনকি যে রাতে তাঁরা গণহত্যার শিকার হন, তার আগে এলাকার অপরপ্রান্তের স্বাধীনতা-বিরোধী নেতাদের গঠন করা শান্তি কমিটির মিটিংয়ে আলোচিত 'হিন্দু লুট' এর সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারেও তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত ডাকরা একটি বড়ো গ্রাম। এই গ্রামের একটি অংশে মুসলমানদের বাস, অন্য অংশে বসবাস হিন্দুদের। তবে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্ক এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতির একটি অংশ; যেমনটি দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ সূচনার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলিম কর্মচারীদের মধ্যকার সম্প্রীতির সম্পর্কের দৃষ্টান্তে। এমন সম্পর্কের ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত জানামতে একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস '*রাইফেল, রোটি, আওরাত*'-এ

> ....এই ফ্ল্যাটগুলোতে থাকতেন কারা? তারা সেই দু'শতাব্দীর পূর্বের ফেলে-আসা পৃথিবীর মানুষ। তারা এখন ইতিহাস। এইখানে থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়-অফিসের একজন হিন্দু কর্মচারি [কর্মচারী], বাড়ি নোয়াখালি। আর তাঁর সামনেই ঐ ফ্ল্যাটে যিনি ছিলেন তাঁর আদি নিবাস বিহার। নোয়াখালিতে ছেচল্লিশের দাঙ্গায় শ্রীগোপালচন্দ্র ভৌমিক তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন। নিজে তিনি তখন মায়ের সঙ্গে ছিলেন মামা বাড়িতে, চাঁদপুর। অতএব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি ও তাঁর মা সেবার বেঁচে গেছেন। তারপর মামা বাড়িতে থেকেই বি. এ. পাস ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পেয়েছেন। ভারতে যাননি। মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ক্রমেই তিনি ভুলে গেছেন, তিনি হিন্দু না মুসলমান। তাঁর সহকর্মী বন্ধু হুমায়ুন তাঁকে হিন্দুত্ব ভুলিয়ে ছেড়েছেন। ...। শেষ পর্যন্ত বৌদিকে অর্থাৎ গোপালের স্ত্রীকেও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে হয়েছে হুমায়ুনদের বাড়িতে– একেবারে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন। কিন্তু কৈ, কিছু তো মনে হয়নি। বরং হিন্দুর বাড়ি মুসলমানের বাড়ি বলে যে ভেদটাকে তিনি নিজের মধ্যে এতকাল লালন করে এসেছেন সেটাকে তাঁর মনে হয়েছে কৃত্রিম। .....(আনোয়ার পাশা, ২০১৯, পৃ. ৫৪)

এমন ধরনের মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন ডাকরা গ্রামে হিন্দু-মুসলমানরাও। একাত্তরের মার্চের শেষের দিকে পাকিস্তানিদের আক্রমণের কথা শুনেও গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সম্প্রীতির কথা ভেবেই প্রথমে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের কোনো সমস্যা হয়তো হবে না। কিন্তু এপ্রিল নাগাদ যুদ্ধ, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, পাকিস্তানিদের আক্রমণের মাত্রা ও রাজাকারদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির বিষয়গুলো এই সম্প্রদায়ের লোকজনের ভেতর ব্যাপক ভীতির সৃষ্টি করে।

ডাকরা গ্রামটি বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার মাগারতলী খালের (স্থানীয়দের কথায় নদী) তীর ঘেষে অবস্থিত। এখানে ব্রিটিশ শাসনামলেই ১৯৪০ সালে নির্মিত হয়েছিল 'ডাকরা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়'। বর্তমানে বিদ্যালয়টি নদীর ধারে রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠাকালীন নদীটি আরো উত্তর দিকে ছিল; যা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। নদীর এই স্থান-পরিবর্তন সময়ে সময়ে প্রভাব ফেলেছে গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনাচারণেও। এই নদীর পাড়েই গড়ে উঠেছে কালীগঞ্জ বাজার। দক্ষিণদিকের পাড়াটিতে মুসলমানদের বাস আর উত্তর দিকে বসবাস হিন্দুদের। একাত্তরের সময়েও এমন 'Demographic Distinction' ছিল। একাত্তরে এখানে একটি 'জাগ্রত' মন্দির ছিল; মন্দিরের তান্ত্রিকের নাম ছিল বিনোদ চক্রবর্তী। এলাকার লোকজন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বহু এলাকার লোকজন তাঁর কাছে আসতেন। তারা তাঁকে গুরুদেব হিসেবে দেখতেন, মেনে চলতেন। এই গ্রামের লোকজনের মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্যবসায়ী। সেই সময় অনেক ধান উৎপাদন হতো। এখন অবশ্য সমুদ্রের লোনা পানির আবহে ধানের

উৎপাদন কমেছে; বেড়েছে চিংড়ি ও মাছের ঘেরে মাছ চাষাবাদ। একাত্তরের সময় এই গ্রামে নারিকেল ও সুপারি গাছের আধিক্য ছিল। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছিল সুপারি গাছ। এক্ষেত্রেও বাধ সেধেছে পরিবেশ ও জলবায়ু। বর্তমানে সুপারি বা নারিকেল গাছের আধিক্য পূর্বের মতো আর নেই। গ্রামের সেই বিখ্যাত মন্দিরটি এখন যেখানে রয়েছে, একাত্তরের সময় সেখানে ছিল না; ছিল মাদারতলী নদীর কুল ঘেষে। নদীর পাশে লম্বায় প্রায় ২০০ গজ এরিয়া নিয়ে কালীগঞ্জের হাট বসতো সপ্তাহের প্রতি বুধবার। মোংলার দিকে চলে যাওয়া এই নদীর পাড়ের হাটে নারিকেল, সুপারি, ধানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেঁচা-বিক্রি হতো। তখন যোগাযোগের মাধ্যম ছিল পায়ে হেঁটে চলা আর নৌকা। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই নৌকা ছিল। লোকজনের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎস ছিল ধান, যা আষাঢ় মাসে হতো। আর আশ্বিন মাসের দিকে আর্থিক অবস্থায় টান পড়লে মানুষজন নিজেদের বাড়ির সুপারি-নারিকেল হাটে হাটে বিক্রি করতো। পাকিস্তানি দোসরদের গণহত্যার কবলে পড়ার আগ পর্যন্ত গ্রামের সবকিছু স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। এলাকার হিন্দুরা ভেবেছিল তাঁদের সাথে হয়তো ঢাকায় হওয়া গণহত্যার মতো কিছু হবে না।

তবে পরিস্থিতি বদলের সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে মুজাম ডাক্তারসহ রামপালের স্বাধীনতা-বিরোধী নেতারা মিটিং-এ বসে। তারা সেই মিটিং-এ বলেছিল যে, “হিন্দুদের যা আছে, সেগুলো লোটো, পোটো, খাও।” এই ধরনের কথা শুধু ছড়িয়েই পড়েনি, রামপালের বিভিন্ন স্থানে বাস্তব প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখন ডাকরা গ্রামের হিন্দুদের মনে হয়েছে যে, জীবন বাঁচাতে দ্রুত ভারত-সীমান্তে পাড়ি দেওয়া প্রয়োজন। এসময় গ্রামের অবস্থাশালী একজন মুসলমান তাঁদেরকে বলেছিলেন তাঁরা যেন ভারতে না যায়; খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা তাঁরাই করে দিবেন। কয়েকদিন গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই সাহায্য পেলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরের কিছুদিন সকলের অনেক কষ্ট করে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। আশেপাশের এলাকার লোকজন ভারতে চলে যাচ্ছিল ব্যাপক হারে। সবকিছু বিবেচনা করে ডাকরার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সিদ্ধান্ত নেন আষাঢ় মাসের শুরুতে অমাবস্যার রাতে নৌকাযোগে রওনা করবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে অন্য এলাকায় তান্ত্রিক বিনোদ চক্রবর্তীর যে-সকল অনুসারী ছিলেন, তারা চলে আসেন। বুধবার যাত্রা

করার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু গুরুদেবের সাথে যাবেন বলে অন্যান্য এলাকার লোকজন চলে আসায় নৌকায় আর সকলের জায়গা হচ্ছিল না।

তখন স্থানীয়রাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা বরং শুক্রবার যাবে; বহিরাগতরা বুধবার যাক। পরে শুক্রবার, ২১শে মে ডাকরাসহ এর আশেপাশের কয়েক জায়গায় চালানো হয় গণহত্যা। এই গণহত্যা চালানো হয়েছিল দিনেরবেলায়। দুই দিক থেকে নৌকাযোগে এসেছিল শত্রুরা। শত্রু বলতে রজব আলীর নেতৃত্বে আসা রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। তাদের হাতে ছিল রাইফেল। এসময় নৌকাযোগে যাত্রার উদ্দেশ্যে বহু লোক ছিল ডাকরায়। গ্রামের লোকজন; যারা স্থানীয়, তারা দিগ্‌বিদিক ছুটে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বাহিরের যারা এখানে এসেছিল তারা রাস্তা-ঘাট ভালো চিনতো না বলে বিপদে পড়েছিল বেশি। ডাকরার স্থানীয় মারা যায় ২৯৮জন। তবে আশ্রয় নেওয়াদের মধ্যে ঠাকুর বাড়িতে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁদের প্রায় সবাই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। বহু লোক গণহত্যায় শহিদ হয়েছেন। পানিতে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাঁদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। রাজাকাররা শুধু গণহত্যা চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; তারা এখানে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণের মতো ঘটনাও সেদিন ঘটিয়েছিল। স্থানীয় যারা বেঁচেছিলেন, তাঁরা শুধু ভাগ্যের জোরেই বেঁচে ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা যে গণহত্যার শিকার হয়েছিল, তার মূল হোতা ছিল পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা। কিন্তু ডাকরার গণহত্যার শিকার হওয়ারা মৃত্যুবরণ করেছেন এদেশীয় দোসরদের দ্বারা। এটিতে পার্থক্যটি অবশ্য যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তনের সাথে। শুরুতে পাকবাহিনীর লোকেরা এমন ঘৃণ্য কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে এ দেশীয় দোসররা, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডাকরা গ্রামের গণহত্যা। এই হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা দ্রুত চলে গেছেন ভারতের দিকে। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায় করে। যাত্রাপথটি অবশ্য মসৃণ ছিল না। পথে পথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁদেরকে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অনেকে তাঁদেরকে পথ দেখিয়েছেন; দিয়েছেন চিড়া, মুড়ি, গুড়ের মতো খাদ্যদ্রব্যও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা গণহত্যার পর যখন জিঞ্জিরায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল, তখন বুড়িগঙ্গার ওপারের মানুষজনও ঠিক একইভাবে সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দিয়েছিল। এদিক থেকে মিল পাওয়া যায় দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে গণহত্যার কবলে পড়া দুই শ্রেণির বা পেশাজীবী মানুষের মধ্যে।

এই গবেষণার গবেষকদল খুলনা অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। খুলনা জেলায় বটিয়াঘাটা উপজেলার হাটবাটির কিসমত ফুলতলা ও হেতালবুনিয়া গ্রামের কয়েকজনের কাছ থেকে। গ্রাম দু'টি পাশাপাশি একই এলাকায় অবস্থিত। FGD করে একাত্তরে সেখানকার মানুষজনের অভিজ্ঞতার বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে।

হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকাটিতে এখন যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তাঁদের কেউ কেউ একাত্তরে অন্য এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরে এখানে এসে বসতি গড়ে তুলেছেন। এই এলাকায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসবাস তুলনামূলকভাবে কম। এখানকার মানুষজনের পেশা মূলত কৃষি। স্বাধীনতার আগে থেকেই তাঁরা কৃষিকাজের সাথে জড়িত। এলাকার মধ্য দিয়ে সিথিন্দামারি খাল বয়ে গেছে। এই খালে প্রচুর পরিমাণে সিরিন্দা নামক মাছ পাওয়া যেত। লোকজন তাঁদের নৌকায় করে জাল দিয়ে মাছ সংগ্রহ করতো। কিন্তু কালের স্রোতে এই খাল ভরাট হতে হতে বর্তমানে মৃত অবস্থায় পৌঁছেছে।

এলাকায় যারা শিক্ষিত ছিলেন তাদের অনেকেই ১৯৬৪ সালে ভারতে চলে যান। দেশভাগের কিছুকাল পূর্বে ও এর পর থেকে হিন্দু-মুসলিমের মাঝে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে তারা ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। নিজ দেশ, নিজ জন্মস্থান, নিজ বাসভূমি ছেড়ে তারা কয়েকজন চলে গেলেও যেতে পারেননি দীর্ঘদিন থেকে বসবাসরত অন্যরা। এলাকার প্রবীণ একজন ব্যক্তির বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য, যা থেকে দেশমাতৃকার তরে মনস্তত্ত্বে জড়িয়ে থাকা আবেগের প্রতিফলন পাওয়া যায় যে, কেন অন্যরা অনেকে দেশভাগের পর ভারতে চলে গেলেও তারা যাননি। তিনি বলেন,

> ...সবাই আমরা এলাকাতেই থাকতাম। উচ্চশিক্ষিত যারা, তারা ৬৪-তে ইণ্ডিয়া চলে গিয়েছিল। একটা কথা কী, এই বাংলাদেশ ছাড়া এত ভালো জায়গা কিন্তু এই পৃথিবীতে নেই। এইটা যারা বাইরে না গেছে, তারা বুঝবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ যারা এইখানে আইসে, সুন্দরবনের গাছ কেটে এইখানে পরিষ্কার করে বসতি গড়েছে। এইখানের বাঘের সাথে, কুমিরের সাথে ও প্রত্যেকটা ভয়ঙ্কর জিনিসের সাথে লড়াই করে টিকে থেকেছে। জল নদীতে প্রবাহিত হয়, এই জল খেয়ে কলেরায় মারা গেছে এক বংশের সব। খালি বিধবারাই থাকত। যে বাড়িতে ধরেছে কলেরা, সে

> বাড়ির সব শেষ। এর মধ্যেই কয়েক পুরুষ বসবাস করেছে। তাহলে বুঝেন এই মাটির সাথে আমাদের কত পুরুষের রক্তের সাথে কঠিনভাবে সম্পর্কিত। ইণ্ডিয়াতে আমরা চাইলেই আমাগের বস্তি বানাতে পারতাম। বহুলোক গেছে, বস্তি দিছে। এখানে বহুলোক আছিল। যারা গরিব হয়ে গেছে, তারা চলি গেছে। তারা কিন্তু এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। একেকজন গাড়ি-বাড়ি, নানান জায়গার মালিক। তবে আমরা ৬৪ কিংবা ৭১-এর পরেও বসতভিটার মায়া ছাড়তে পারি নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে ভারত থেকে চলে এসেছি এখানকার মাটি, মানুষ, বাতাসের টানে। এখনও আছি সেভাবেই।...

এই এলাকার অনতিদূর দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এই এলাকার নেতা-কর্মীদের মধ্যে অনেকে কমিউনিস্ট ন্যাপের (মুজাফফর) সমর্থক ছিলেন। তবে আওয়ামী লীগেরও ছিলেন কয়েকজন। একাত্তরে এই এলাকাকে অনেকে “আঁটো-সাঁটো হিন্দুস্থান” বলতো। পাকিস্তানিদের হিন্দু-নিধনযজ্ঞের কথা শুনে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন স্থানের হিন্দু-জনগোষ্ঠী যখন ভারতের দিকে যাচ্ছিল, তখন দেখা যায় যে এই এলাকাতে বিভিন্ন জেলার মানুষজন নৌকায় করে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় বলতে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য নয়, ভারতে যাওয়ার যাত্রাপথে কোথাও আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি। এখানে খুলনা শহর থেকে লোক আসতো, আসতো বাগেরহাট থেকে; এমনকি বরিশাল থেকেও। এমনও দিন গেছে যে, নিকটবর্তী নদীতে বাহিরে থেকে প্রায় ৪০০ নৌকা এসে ভিড়েছে। সকলের গন্তব্য ছিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতের দিকে যাওয়া। তবে নদীপথ জুড়েও পাকিস্তানিরা টহল দিয়েছে। বহুলোককে হত্যা করে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর জলে।

এই সময় নৌকা ছিল তাদের যাতায়াতের একমাত্র বাহন। এলাকার লোকজন পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে নিজেদের নৌকাতে করে সপরিবারে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। যাওয়ার আগে নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ, ধান বা অন্যান্য কিছু জিনিস কম দামে বিক্রি করার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার পরে তারা অবশ্য এখানে এসে সবকিছু লুট করা হয়েছে এমন অবস্থায় পেয়েছিলেন। ধানের জমিতে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, পাকিস্তানিদের আক্রমণের শিকার হওয়ার আগে এলাকার লোকজন ১৯৭১ সালের মে মাসের ১৯ তারিখে (৪টা জ্যৈষ্ঠ বুধবার) ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিল। যাওয়ার পথে এই এলাকার মানুষজন পরের দিন সম্মুখীন হয়েছিল চুকনগর গণহত্যার। পাকিস্তানিদের আক্রমণে সেইদিন এই এলাকার অনেকে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে

হারিয়েছেন। যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তারা শুধু সৃষ্টিকর্তার অলৌকিকতার প্রতি কৃতজ্ঞ। চুকনগর গণহত্যার কবলে পরেও বেঁচে যাওয়া লোকেরা দ্রুত ভারত সীমান্তে পৌঁছানোর জোর চেষ্টা চালান। এই গ্রামের অনেকের প্রিয়জনকে হারান ২রা মে (৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার) ঝাড়ডাঙ্গায় পাকিস্তানিদের চালানো গণহত্যায়। মূলত তাদের সাথে বিভিন্ন এলাকার বহু লোক তখন ভারতের দিকে যাত্রা করেছিলেন। নদীপথে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করতো মূলত গানবোটে করে এসে। এই দুই গণহত্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া এলাকার লোকজন ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে শারণার্থী হিসেবে জীবনযাপন করতে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যারা পাকিস্তানিদের হাতে শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মধুদা'র পরিবার ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। মধুদা'র পরিবারের সদস্য এবং তাঁর পরিবারের সাথে সবসময় অবস্থান করা মনির হোসেন বাচ্চুর বক্তব্যে ফুটে ওঠা শরণার্থী জীবনের সাথে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার এই এলাকার লোকজনের শরণার্থী জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সকলের জন্য বরাদ্দকৃত প্রতিদিনের রেশনি, খাবার, বাসস্থান ইত্যাদির চিত্র অনেকটাই একরকম। শরণার্থী হলেও এই এলাকার অনেকে অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন যেমনটা মনির হোসেন বাচ্চুও শুরু করেছেন। গণহত্যার দিনের সাথে তুলনা করতে গেলে একটি কথা বলতেই হয় যে, এলাকার এই মানুষরা জীবন রক্ষার তাগিদে নদীতে লাফিড়ে পড়া, লুকিয়ে থাকা, আড়ালে লুকিয়ে রাখার মতো যেমন... বা সুযোগ পেয়েছিলেন সে তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ হওয়া কর্মচারীরা তেমন সুযোগ পাননি। আর তারা শিকার হয়েছিলেন অতর্কিত হামলার, যেখানে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া খুলনার এই এলাকার লোকজন পূর্বে থেকে পাকিস্তানিদের আক্রমণের গতিবিধি ও মাত্রা অবজারভ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ বা চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা করেন এবং স্বয়ং অনেক মুক্তিযোদ্ধারা একটা প্রশ্ন অহরহ করেন যে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষজন কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন? ঢাকা তো বটেই, বিভিন্ন শহরে কী পরিস্থিতি ছিল সেটা জানা প্রয়োজন। তরুণ, যুবক ও মধ্যবয়স্ক – যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ছিলেন এবং যারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছিলেন বা শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন, অনেকে নেয়নি। এই

অঞ্চলটি অর্থাৎ সুয়াগাজি বাজার গ্রামীণ একটি জনপদ। তবে যোগাযোগ ও শিক্ষার দিক থেকে অন্যান্য গ্রামীণ জনপদের চেয়ে এগিয়ে ছিল, সেখানে বর্তমান গবেষকদল একটি এফজিডি করে।

মুক্তিযোদ্ধা বাবুল মিয়া জানান যে, তিনি নির্বাচিত স্কুল ক্যাপ্টেন ছিলেন। থাকতেন স্কুলের হোস্টেলে। ছাত্রদের নিয়ে তখন ছাত্র সংসদে নির্বাচিত হন। তিনি বললেন, "আমি ছিলাম নির্বাচিত ভিপি"। মার্চ মাসে তারা মিছিল, মিটিং-এ যোগ দেন। তিনি জানান, "খোলা ট্রাকে করে আমরা ছাত্ররা চৌদ্দগ্রাম ও কুমিল্লায় গিয়ে মিছিল মিটিং-এ যোগ দিতাম। দেশ খুব উত্তাল 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে আমরা অনুপ্রাণিত। তখন সবাই বঙ্গবন্ধুর কথা শুনত।" ২৫শে মার্চ হত্যাকাণ্ডের পর ২৬শে মার্চ তারা বটগাছ কেটে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে প্রতিরোধ তৈরি করেন। ছাত্রজনতার নেতৃত্বে এই প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে বড়ো বড়ো গাছ কাটা হয়, যার মধ্যে শতবর্ষী বটগাছটিও ছিল। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, পাকিস্তানি সেনাদের রুখতে গাছ কেটে বেরিকেড দেওয়ার কাজে ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাও ছাত্রদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

এরপর যুদ্ধ শুরু হলে তিনিসহ দেশ স্বাধীন করার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অনেকে যুদ্ধে যোগ দেয়। তিনি বললেন, "আমি মা-বাবাকে না জানিয়ে যুদ্ধে যোগ দিলাম।" প্রথমে গিয়ে উঠলাম কাঠালিয়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। যার প্রধান ছিলেন আমান চৌধুরী। ইনি হলেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের একজন ফুটবলার এবং অবিভক্ত উপমহাদেশে বঙ্গীয় কৃষক সমিতির সভাপতি জননেতা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর ভাতিজা। প্রথমে এটি ছিল কাঠালিয়া, এরপর ইয়ুথ ক্যাম্পটি ত্রিপুরার বড়মোড়ায় সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি বলেন,

> ...বাবা-মাকে না জানিয়ে আমি যুদ্ধে যাই। তবে সবাই, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক শিক্ষিত অংশের মধ্যে দোদুল্যমানতাবাদী লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক সুবিধাবাদী চরিত্রের লোকও ছিল। যেমন আমার চাচাত ভাই একজন ছিল, সে তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ৩য় বর্ষে অর্থনীতিতে পড়ত। সে যায়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তো সবার ভিতর ছিল না। সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। অথচ যুদ্ধে যাবার সকল শক্তি ও ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু সে যায়নি।...

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও কেউ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কেউ চাকুরিতে যোগদান করেছিলেন, কেউ নিরাপত্তার খোঁজে বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

৫.১.২. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে জীবন: কয়েকটি পাঠ্যের আলোকে

১৯৭১ সালে ঢাকায় অবস্থানকারী জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার অধ্যায়। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা হস্তক্ষেপ করেছিল। দৈনন্দিন চলাফেরাতে আরোপিত হয়েছিল নানান ধরনের বিধিনিষেধ যা মন্টু খান রচিত '*হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন*' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, ২৮শে মার্চের পর থেকেই ঢাকা শহরের মানুষদের মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার হিড়িক পড়ে যায়। যে যেদিকে পারছিল ছুটে পালাতে থাকে। মন্টু খানকে যখন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা ঢাকা ছাড়ার কথা ক্রমাগত বলতে শুরু করেন, প্রতিউত্তরে তিনি তাদের জানিয়েছিলেন, "মরতে হলে জনগণের সাথে মরব। যখন শহরের সবাইকে নিয়ে যেতে পারছি না, তখন তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সবাইকে ফেলে রেখে পালানোর শিক্ষা আমি পাইনি।" তাঁর চেতনা ও শহরপ্রীতির দাম শীঘ্রই দিতে হয়েছিল তাঁকে। ২১শে মে অন্যান্য দিনের মতোই অফিসের কাজে তিনি তাঁর মোটর সাইকেলে করে যাওয়ার সময় তৎকালীন শাহবাগ হোটেলের কাছে তাঁকে থামিয়ে আইডি-কার্ড চেক করেন দুইজন পাক সৈনিক। কার্ড দেখেই কালবিলম্ব না করে মন্টু খানকে তারা বন্দি করে ফেলে। শুরু হয় তাঁর জীবনের নারকীয় অধ্যায়। তাঁর উপর চলতে থাকে হানাদারদের পাশবিক অত্যাচার (হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন)।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন রকম অত্যাচারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। জানা যায়, যুদ্ধের বছর মানুষকে হাঁটতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যানবাহনে চড়ার সুযোগ তারা পাননি। কেননা, সেই সময় যুদ্ধের কৌশলগত কারণেই যাতায়াত-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ভঙ্গুর যাতায়াত-ব্যবস্থা একদিকে যেমন পাকবাহিনীর থেকে নিরাপত্তা দিয়েছিল, তেমনি আশ্রয় অনুসন্ধানের সময় জীবন বাঁচাতে পালানোর সময়ও তাঁদেরকে স্বীকার করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্টের (গ্রামের একাত্তর, পৃষ্ঠা ১২)।

মানবমনে আতঙ্ক এতটাই গ্রাস করেছিল যে, কুষ্টিয়া অঞ্চলের লোকজন বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে হলে পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে জানিয়ে কয়েকজন সংঘবদ্ধ হয়ে তবে যেতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আঘাত এনেছিল যুদ্ধ। ধর্মীয় কর্ম পালনেও মানুষকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে (গ্রামের একাত্তর, পৃষ্ঠা ১৬)।

কুষ্টিয়ার মিরপুরের অধিবাসী জাহানারা বেগমের বক্তব্যে উঠে আসে, "জুম্মার নামাজে যাওয়ার উপায় ছিল না। রোজার সময় নামাজ পড়লেও তারাবি পড়া সম্ভব হতো না। গোলাগুলি, হইচই শুনে নামাজিরা নামাজ ছেড়ে চলে আসত।" (গ্রামের একাত্তর, পৃষ্ঠা ২৪)

অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ-এর বক্তব্যে উঠে আসে ভয়ে পূজামণ্ডপে ঢাক বাজাননি তাঁরা। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উলুধ্বনি দেওয়াও সম্ভব হয়নি। এমনভাবেই পূজা সম্পন্ন করেছেন যেন মণ্ডপের বাইরে পর্যন্ত কোনো শব্দ না যেতে পারে (গ্রামের একাত্তর, পৃষ্ঠা ২৬)।

অন্যদিকে কুমিল্লার এক ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলাম রচিত *"মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অপতৎপরতা ও মানবিক সংকট: প্রেক্ষিত কুমিল্লা জেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়ন"* প্রবন্ধে।

এখান থেকে জানা যায় যে, কুমিল্লার বিবিরবাজার এলাকায় পাকবাহিনী অবস্থান করেছিল এবং রাজমঙ্গলপুর গ্রামের অধিবাসী জনাব আলকাছ মিয়ার বাড়িকে পাকবাহিনীর একটি নির্যাতন-কেন্দ্র হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। আর বিভিন্ন এলাকা হতে নারীদেরকে সেখানে তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হতে জানা যায়, নির্যাতন-কেন্দ্রে নারীরা তাঁদের পরনের কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতো। যেন এরূপ না করতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করে রাখা হতো।

নারীদের আতঙ্কের আরেক চিত্র পাওয়া যায় নরসিংদী জেলার আলোকবালী ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রেহেনা আক্তারের ভাষ্যে। তিনি জানান যে, তিনি তাঁর মা ও চাচীর কাছ থেকে শুনেছেন তাঁদের এলাকায় পাকবাহিনীর কখনো আক্রমণ না হলেও তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা করিমপুর ইউনিয়নে প্রায়শই পাকসেনারা আক্রমণ করেছিল। আর সেই সময়গুলোতে মেয়েদেরকে লুকিয়ে

রাখার জন্য বড়ো করে গর্ত করে সেই গর্তের ভেতর মেয়েদেরকে প্রবেশ করিয়ে গর্তের মুখ খড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো (সাক্ষাৎকার- রেহেনা আক্তার-নরসিংদী)।

অন্যদিকে আলোকবালী ইউনিয়ন-এর তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় মো. দানিছুল হকের বক্তব্যে। তিনি বলেন, "আমাদের গ্রামে পাঞ্জাবিদের অক্রমণ হয়নি কখনোই, কিন্তু লোকজনের মধ্যে সারাক্ষণই একটা আতঙ্ক বিরাজ করতো। প্রায়ই সন্ধ্যা হলে লোকজন ভয়ে পাটক্ষেতের ভেতর লুকিয়ে রাত্রিযাপন করতো। তাঁদের মধ্যে এই ভয় ছিল যে রাতের অন্ধকারে মিলিটারি আসলে তাঁরা আর কোথাও পালাতে পারবে না।" জীবনের এই অনিশ্চয়তা মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন পুরো নয়মাস জুড়েই বিরাজ করছিল (সাক্ষাৎকার- দানিছুল হক-নরসিংদী)।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বাংলাদেশিরা কেবল পূর্ব-পাকিস্তানেই অবরুদ্ধ ছিলেন না, বরং তা সীমানা পেরিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানেও প্রবেশ করে। এরকমই একটি ভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা পাওয়া যায় সামরিক অফিসার ল্যাফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত কাজী এম এ কাদেরের স্ত্রী হেলেন কাদেরের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় হেলেন কাদের সদ্য-বিবাহিত ছিল এবং সামরিক অফিসার স্বামীর সাথে আটকে গেলেন পশ্চিম-পাকিস্তানে। সেখানে বাঙালি হওয়ার কারণে অনেক অত্যাচারিত হতে হয়েছিল তাকে। সে সময় আবার তিনি ছিলেন সন্তান-সম্ভবা। তাঁর স্বামীকে যখন যুদ্ধে পাঠানো হয়, তখন অনাত্মীয় পাকিস্তানের তিনি আলো, পানি, ডাক্তার ও বন্ধুর অভাববোধ করছিলেন। সারাক্ষণ তাঁর ওপর চলছিল কড়া নজরদারি। এ এক অসহনীয় অবরুদ্ধ জীবন। এমনকি সন্তান জন্মদানের সময় হলেও তাঁর তীব্র আর্তনাদে কেউ এগিয়ে আসেনি। তারপর নিজেই গেলেন হাসপাতালে। যুদ্ধ শেষ হলো। অনেক অপেক্ষার পর তাঁর স্বামী ফিরে এলো। তারপর শুরু হল বন্দি-বিনিময়ের সেই ধীর পদ্ধতি। এভাবে জীবনের মূল্যবান একটা সময় তাঁর কাছে অসহনীয় বেদনার স্মৃতি হিসেবে কষ্ট দেয় (পাকিস্তানে বন্দি জীবন ১৯৭১, হেলেন কাদের)।

পূর্ব-পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন জীবনযাত্রার একটি চিত্র ক্লেয়ার হোলিং ওয়ার্সের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয়। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় ৮০ লাখ মানুষ নিজ দেশে খাদ্যহীন, গৃহহীন। নিরাপদ আশ্রয় ও খাবারের খোঁজে দলে দলে মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের

আক্রমণের প্রতিবাদে যখন পাকসেনারা গ্রামগুলোতে আগুন জ্বালাচ্ছিল এবং অতর্কিত গোলাগুলি হচ্ছিল, সে সময় জীবন বাঁচানোর তাগিদে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে অনেক মানুষ গৃহত্যাগ করে। এদিকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল দুর্ভোগ। বন্যার কারণে নৌকার অভাব ছিল এবং মুক্তিফৌজ পাকসেনাদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথে বাধা দিতে রেলওয়ে, সড়ক ও কালবার্টসমূহ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। তবে এতে করে যেসব মানুষ দেশ ছাড়তে চেয়েছিল তারা কোথায় আছে সেটা জানা যাচ্ছিল না। ডাক্তারদের দেখা তথ্যমতে এ জনগোষ্ঠীর ৫ ভাগের এক ভাগই মৃত্যুবরণ করেছিল (বিদেশীর চোখেঃ ১৯৭১-আন্দালিব রশীদ, পৃষ্ঠাঃ ১০৮-১১০)।

ঢাকায় ২৫শে মার্চ অতর্কিত আক্রমণের পর থেকে সেনাবাহিনীর ধাপে ধাপে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ঢাকা থেকে প্রায় এক লাখ মানুষ পালিয়ে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে ১লা এপ্রিল সামরিক বাহিনীর গোলাগুলি চলছিল। চট্টগ্রাম বন্দর ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে বাঙালি ও বিহারি মুসলমানদের মধ্যে কয়েক দফায় সহিংসতা হয়েছিল এবং সামরিক বাহিনী আগুন জ্বালিয়ে, গোলাবর্ষণ করে গ্রামসমূহে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। অধিকাংশ গ্রামে চলছিল আতঙ্ক ও নিস্তব্ধতা। রাস্তা ছিল জনশূন্য। দোকানপাট ছিল বন্ধ ও সারারাত চলেছিল অনবরত গোলাগুলি। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম ছিল যেন মৃত্যুপুরী। চট্টগ্রামের এই অবস্থা কেমন ছিল তার চিত্র একজন কর্নেল এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “আমাদের গোলাগুলির শক্তি তাদের চেয়ে অনেক বেশি। যখনই কোথাও কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়, আমরা সেই বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে দিই এবং তার আশেপাশের এলাকা।” (বিদেশীর চোখেঃ ১৯৭১ - আন্দালিব রশীদ, পৃষ্ঠাঃ ৮০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ এবং পর্যালোচনা করা। এই গবেষণাটি বিবরণমূলক। এই গবেষণায় প্রধানত মৌখিক গবেষণা-পদ্ধতি আংশিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। একটি সেমি-স্ট্রাকচার্ড প্রশ্নমালা ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের সময় উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং স্মৃতির মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা কথন (narration) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একইসাথে বিভিন্ন গবেষণা ও বইয়ে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সাক্ষাৎকারও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত কর্মচারী অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা ব্যক্তিগণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের কাছ থেকে গৃহীত পরামর্শ অনুযায়ী (*স্নো বল পদ্ধতি অনুসরণে*) আরেকজন সাক্ষাৎকারী নির্বাচন করা হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যাশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গবেষণা করতে কাজে লাগবে এই প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নন এমন জনগোষ্ঠীদের থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধে অভিজ্ঞতাসমূহের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে গবেষণার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ২৫শে মার্চ রাত, ২৫শে মার্চ রাতের অব্যবহিত পরের উদ্ধার-পর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বিজয় অর্জন পর্যন্ত যাপিত জীবনের অবস্থা ও অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে অধ্যায় বিন্যাস করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্তসার নিচে উপস্থাপন করা হলো।

৬. ১. ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ রাতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা-একটি পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরে কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার জন্য 'অপারেশন সার্চলাইট' আরম্ভের পূর্বে ও পরে মার্চ ১৯৭১ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্রগুলোকে ২.১.১. ও ২.১.২. অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার নিচে তুলে ধরা হলো।

৬.১.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী মার্চ, ১৯৭১ঃ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্বে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজ করছিল। সেইসাথে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক অবনতির বিষয়টি আঁচ করা যাচ্ছিল। মার্চ মাসের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। ট্রেনিংয়ের কাজে কর্মচারীরা সহযোগিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ এর ৭ই মার্চের ভাষণে আন্দোলনের গতি এনেছিল। ছাত্রদের সাথে গাছ কেটে বেরিকেড তৈরিতে কর্মচারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর সকাল থেকে নানা ধরনের গুঞ্জন চলছিল। এই সময় উপাচার্যের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল কি না দেখতে গিয়ে একজন কর্মচারী সেখানে বাংলাদেশের পতাকা দেখতে পাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা আশু আক্রমণের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অনেক খালি হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন কর্মচারী গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ছুটি না পাওয়ায় যাননি। আবার কর্মচারীদের উপর আক্রমণ হবে না এই বিশ্বাসে অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলেন।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যারাতে অন্যান্য রাতের মতো গীতাপাঠের আয়োজন ছিল এবং কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের কয়েকজন তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আক্রমণের পূর্বেও নানা ধরনের খবর (ধর্মঘট হতে পারে, তিন দিন পানি থাকবে না ইত্যাদি) ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া ইয়াহিয়া খান ১১ দফা মেনে নেওয়ার গুজব শুনে আনন্দে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ঘটনার কথা বক্তব্যে এসেছে।

৬.১.২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, মার্চ ১৯৭১: অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। জীবিত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পিতা, মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু ও অন্যান্য পরিজনদের এই রাতে হারানো মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি বহন করছেন। যদিও আক্রমণের খানিক পূর্বে কর্মচারীদের কিছু হবে না ('কত যুদ্ধ গেল... আমাদের কিছু হলো না') এমন বিশ্বাসও কোনো কর্মচারী ধারণ করেছিলেন।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি জায়গায় অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। রোকেয়া হলে ট্রেনিং গ্রহণকারী ছাত্রীদের পাকিস্তানি সেনারা খোঁজ করেছিল। প্রভোস্ট ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় লুকিয়ে থেকে রোকেয়া হলে অবস্থানকারী সাতজন ছাত্রীর জীবন রক্ষা পায়।

একই বাড়িতে কাবা শরিফ, জিন্নাহ, বঙ্গবন্ধুর ছবি টাঙানোর উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখে পাকিস্তানি সেনারা ক্ষেপে গেলে কাবা শরিফ, জিন্নাহ এসব ছবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'নিজেরা মুসলমান' এমন পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তবে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের (পরিবারের সদস্যদের) ওপর গুলি বর্ষণ করে। 'মুসলিম লীগ সমর্থক' এমন কথা বলার কারণে পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মৃতের ভান করে থেকে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৃতের ভান করে থাকার সময় পাকিস্তানি আর্মির বেয়নেটের খোঁচা, চুল ধরে টানা সহ্য করতে হয়েছে। নারীদের বিবস্ত্র করার কথাও কোনো কোনো বক্তব্যে এসেছে। আক্রান্ত অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস পালন (সুরা, আয়াত পাঠ, সরস্বতী মূর্তির পিছনে লুকানো) এমন ঘটনা ঘটেছে।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় রাত। ঐ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনের সকল স্বাভাবিকতা চিরতরে নস্যাৎ হয়ে যায়। এই আক্রমণের চিত্র ছিল অত্যন্ত করুণ এবং ভয়াবহ। এই এক রাতে অনেকেই হারায় তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনদের। আবার, কেউ তাদের চোখের সামনে তাদের

সবচেয়ে আপনজনকে মরে যেতে দেখেছে। কখনও সেই প্রিয়জনেরই মৃতদেহকে ফেলে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

৬.১.৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সকাল ও তার পরবর্তী কয়েকদিন – পর্যালোচনা

৩.১ এ উপস্থাপিত বক্তব্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সকাল ও পরবর্তী কয়েকদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু পর্যালোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ করে কর্মচারীদের মরদেহ ছড়িয়ে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা কোথাও কোথাও মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে বের করে এমন কথাও বক্তব্যে এসেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পরিবারের সদস্যদেরকে, নিজ সন্তানদেরকে দেখে রাখা, মৃতপ্রায় অবস্থায়ও পরিজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার, পাকিস্তানি সেনারা কোনো কোনো কর্মচারীর দিকে গুলি তাক করেও শেষ মুহূর্তে গুলি না করার ঘটনারও উদাহরণ পাওয়া গেছে।

উর্দু জানা এবং কয়েকটি বিশেষ পেশার (ঝাড়ুদার, ধোপা, মুচি) মানুষকে পাকিস্তানি বাহিনী মারবে না এমন কথা প্রচলিত হয়েছিল। কোনো কোনো কর্মচারী এই পেশার মানুষ হওয়ার ভান করেছিলেন। আবার, হিন্দি জানা মাড়োয়ারি মহিলার (সম্ভবত মানসিক অসুস্থ) প্রতিবাদ ও হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে।

লাশ টানা ও লাশ গর্তে ফেলার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ব্যবহার করা হয়েছে। লাশটানা গ্রুপকে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী এই দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে যাঁরা পৌঁছাতে পেরেছিলেন, কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্সরা তাঁদের সাধ্যমতো সেবা প্রদান করেন। তবে মৃত্যু ঘটলে ডেথ সার্টিফিকেট না দিতে চাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। হাসপাতালে ২৫শে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ আহতদের খোঁজে পাকিস্তানি সেনারা আসতে পারে এমন কথা শোনা গিয়েছিল।

বিপদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও অসহযোগিতা পাওয়ার উভয় ধরনের উদাহরণ পাওয়া গেছে আহত ও বিপদগ্রস্ত কর্মচারীদের বক্তব্য থেকে।

৬.১.৪. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা – কয়েকটি পর্যালোচনা

৪.১ এবং ৪.২ এ বর্ণিত তথ্য ও বক্তব্য থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জীবনের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০শে জুন, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মক্ষেত্রে যোগদান না করা কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুত করে এবং তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, এই তালিকায় ২৫শে মার্চ রাতে শহিদ কর্মচারীদের নামও ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও ক্লাস চলছে এমন দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনা ঘটলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জনশূন্য অবস্থায় জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হলে লুণ্ঠন ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। এর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সংযোগ আছে কি না এমন অভিযোগ দিয়ে কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করা কর্মচারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য (অস্ত্র লুকানো, বোমা বহন, মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি) করেছেন এমন উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তার খোঁজে ঢাকা ত্যাগ করে বাড়ি যাওয়ার সময় পথে নানা ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন। প্রয়োজনের সময় মসজিদে হিন্দু, মুসলমান সকলেই আশ্রয় পেয়েছেন এমন বক্তব্যও পাওয়া গেছে। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে সহায়তা করে। পথে মুড়ি বিক্রেতাসহ বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা পেয়েছেন এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া গেছে।

শহিদ কর্মচারীর স্ত্রী তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রামে খাওয়ার কষ্টে কাটানোর উদাহরণ পাওয়া গেছে। যত্নের অভাবে চুলে দলা পড়ে যাওয়া, আবার তা দেখে গ্রামবাসীরা ‘জলপড়া’ নিতে আসার ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়জনের ফেরার জন্য কর্মচারী পরিবারের সদস্যদের উদ্‌বেগ এবং কখনও কখনও মানসিক সমস্যা তৈরী হওয়ার কথা এসেছে।

পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ঘর-বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখেছেন কর্মচারী ও কর্মচারীর পরিবারের সদস্যরা। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না করে শহিদ পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে ভারতে নিয়ে গিয়ে এবং ভারতে অবস্থানকালে ফুটপাতে ফল বিক্রি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী এমন উদাহরণ পাওয়া গেছে।

৬.২. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

ক. গবেষণার বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনো সুগঠিত কাঠামো ব্যবহার করা হয়নি। বক্তব্যগুলো অগঠিত প্রবাহের কারণে বক্তব্যগুলো হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

খ. জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতি সংবেদনশীল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সময়, বয়স এবং মানসিক অবস্থার ব্যবধানের কারণে মৌখিক তথ্য সময়ের সাথে পরিবর্তিত ও সংযমহীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ

যাঁদের সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়েছেঃ

গোপাল দাস- তৎকালীন মধুর ক্যান্টিন কর্মচারী।

আমির হোসেন-তৎকালীন কর্মচারী ও বর্তমানে কলাভবন কমনরুম এটেন্ডেন্ট হিসেবে কর্মরত।

মনির হোসেন বাচ্চু- তৎকালীন মধুর ক্যান্টিন কর্মচারী।

আলী আব্বাস– তৎকালীন কর্মচারী।

মো. মোশারফ- শহিদ আহমদ আলী ফরাজির সন্তান।

আব্দুল জব্বার- তৎকালীন কর্মচারী।

জমিলা খাতুন– শহিদ মো. শামসুদ্দিনের স্ত্রী।

মো. সাজাহান- শহিদ মো. শামসুদ্দিনের সন্তান। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মরত আছেন।

দিলীপ কুমার- শহিদ সুনীল চন্দ্র দাসের সন্তান।

মো. ইকবাল- শহিদ আব্দুল মজিদের সন্তান- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে অস্থায়ীভাবে কর্মরত আছেন।

শিবেন্দ্র চন্দ্র দে- শহিদ খগেন দে'র সন্তান– বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে কর্মরত আছেন।

হাজী জামিলা খাতুন ও হাজী মিন্নত আলী– শহিদ মো. হাফিজ উদ্দিনের স্ত্রী ও সন্তান।

সহায়ক গ্রন্থ

আল-আমিন, মো. ও খান, বাশার (সম্পা.)। (২০২০)। রোকেয়া হল গণহত্যা: আহত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য। কাগজ প্রকাশন।

আহমেদ, হুমায়ূন। (২০১৭)। আমার আপন আঁধার। প্রতীক।

কাদের, হেলেন। (২০০৬)। পাকিস্তানে বন্দীজীবন ১৯৭১। আগামী প্রকাশনী।

খান, বাশার। (২০১৯)। একাত্তরের ঈদ। দ্যু প্রকাশন।

খান, মন্টু। (২০১৬, পঞ্চম সংস্করণ)। হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন। মুক্তধারা।

চক্রবর্ত্তী, রতনলাল (সম্পা.)। (২০১৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যা ১৯৭১: জগন্নাথ হল। আগামী প্রকাশনী।

চক্রবর্ত্তী, রতনলাল। (২০২১, দ্বিতীয় সংস্করণ)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১), দ্বিতীয় খণ্ড। দি ইউনিভার্সেল একাডেমি।

চৌধুরি, আফসান (সম্পা.)। (২০২০)। হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

চৌধুরী, মোফাজ্জল। (২০১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ)। একাত্তরের ডায়েরি। আগামী প্রকাশনী।

পাশা, আনোয়ার। (২০১৯, সপ্তম সংস্করণ)। রাইফেল, রোটি, আওরাত। স্টুডেন্ট ওয়েজ।

বিশ্বাস, সুকুমার। (২০০১)। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তাঁর দোসরদের তৎপরতা। সুবর্ণ পাবলিশার্স।

বেগম, জোহরা (সম্পা.)। (২০২৩)। যাত্রিক: বিশেষ সংখ্যা: ২৫ মার্চ কালরাতে গণহত্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

মুবিন, সুমাইয়া। (২০২২)। 'অপারেশন সার্চলাইট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। মেসবাহ কামাল (সম্পা.), একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯, আগামী প্রকাশনী।

সুলতানা, জাফরিন ও কামাল, মেসবাহ। (২০২২)। ‘২৫ মার্চ রোকেয়া হল গণহত্যা’। মেসবাহ কামাল (সম্পা.), একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী: মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা– ৩৩-৩৪। আগামী প্রকাশনী।

স্টাফ রিপোর্টার। (১৯৭১, নভেম্বর ১১)। রোকেয়া হলে ডাকাতি। পূর্বদেশ, পৃ. ১ ও ৬।

Ahmed, Imtiaz. (2009). Historicizing 1971 Genocide: State versus Person. The University Press Limited.

Kabir, Mafizullah. (1972). Experience of an Exile at Home: Life in occupied Bangladesh. Published by Rezina Nazli Kabir, Dacca, 1972

Salik, Siddiq. (1997). Witness to Surrender. The University Press Limited.

পরিশিষ্ট: ১

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ কর্মচারীদের তালিকা

প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে এই তালিকা রচিত হয়েছে। এই তালিকা পূর্ণাঙ্গ এমন দাবি করা হচ্ছে না, এই তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংশোধন, সংযোজন ও সম্পাদনের সুযোগ রয়েছে।

আব্দুল খালেক

তিনি রোকেয়া হলের মালী ছিলেন। পিতা- নইমউদ্দিন ভূঁইয়া।
গ্রাম- মন্দিরপুর, ডাকঘর- বালিয়াপাড়া, থানা- বৈদ্যের বাজার, ঢাকা। বয়স ৩০-৩২ বছর।
রোকেয়া হলের স্টাফ-কোয়ার্টারে ২৫শে মার্চ রাতে পাকসেনা আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে তাঁর মামাতো ভাই মোহাম্মদ আলী ও শ্যালিকা নূরজাহানসহ আব্দুল খালেক শহিদ হন। ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তর দিকে গণকবর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে এই গণকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

আব্দুল জলিল

জহুরুল হক হলের কর্মচারী ছিলেন।

আব্দুল মজিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবের বেয়ারা ছিলেন। গ্রাম ও ডাকঘর- সুবিদপুর, থানা- নলছিটি, জেলা- ঝালকাঠি। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাবের মধ্যেই তিনি শহিদ হন।

আব্দুস শহীদ

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনীর গুলিতে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মধ্যেই শহিদ হন আব্দুস শহীদ।

আব্দুস সামাদ

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের একজন কর্মচারী ছিলেন।

গ্রাম- কোঠাধারা, ডাকঘর-বুতনী, থানা-শিবালয়, জেলা-মানিকগঞ্জ।
তথ্যমতে তিনি ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। বর্তমানে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস ভবনের পাশে তাঁর কবর রয়েছে।

আলী হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন। জানা যায় যে, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবের মধ্যেই তিনি শহিদ হন।

আহমেদ আলী

তিনি রোকেয়া হলের লিফটম্যান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জব্বার ফরাজী। আহমেদ আলী মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার ইসমানির চরে ১৯২৬ সালের ২১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ-কোয়ার্টার আক্রমণ করলে তিনি ও তাঁর একজন আত্মীয় সেই আক্রমণে শহিদ হন। ২৭শে মার্চ তাঁকে সমাহিত করা হয় শামসুন নাহার হল গেটের উত্তর দিকের গণকবরে। উল্লেখ্য যে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর।

এ. কে. এম আব্দুল্লাহ ভূঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উচ্চমান সহকারী ছিলেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র দে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। জগন্নাথ হলের মধ্যে কাঁচা ঘর তৈরি করে পরিবারসহ বাস করতেন। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী আক্রমণ করলে সেই রাতে তিনি শহিদ হন।

গিয়াসউদ্দিন

রোকেয়া হলের বেয়ারা ছিলেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ কোয়ার্টার আক্রমণ করে। ফলে পাকসেনার গুলিতে তিনি শহিদ হন। তাঁর চারজন আত্মীয় এ সময় শহিদ হন। ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তর দিকে গণকবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

চুন্নু মিয়া

রোকেয়া হলের মালী ছিলেন। পিতা- আজগর আলী প্রধান।
গ্রাম- মাহমুদপুর, ডাকঘর- গৌরিপুর, থানা-দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা।
২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ-কোয়ার্টার আক্রমণ করে। ফলে পাকসেনার গুলিতে তিনি শহিদ হন।

জওহর লাল রাজভর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মালী ছিলেন। পিতা- ফৌজদার রাজভর। মাতা- ভাগীরাথী রাজভর।
২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী আক্রমণ করলে একপর্যায়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে দিয়ে লাশ বহনের কাজে লাগায়। লাশ বহনের কাজ শেষ করলে তাঁকেও শেষের দিকে লাইনে দাঁড় করায় এবং এই লাইনের উপর পাকবাহিনী গুলি চালায় এবং তিনি পাকবাহিনীর এই গুলিতে নিহত হন। পরে তাঁর দেহ জগন্নাথ হলের মধ্যেই গণকবরে সমাহিত করা হয়।

দাসুরাম রাজভর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের মালী ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জের ভৈরবে জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ হলের মধ্যে কাঁচাঘর তৈরি করে পরিবারসহ বসবাস করতেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকবাহিনী জগন্নাথ হল আক্রমণ করলে ঐ রাতে তিনি শহিদ হন।

দুঃখী রাম মন্ডল

তিনি জগন্নাথ হলের একজন দারোয়ান ছিলেন। পিতা- অর্জনচন্দ্র মন্ডল
গ্রাম- শানবান্দা, ডাকঘর- বলিরটেক, থানা ও জেলা- মানিকগঞ্জ।
তিনি জগন্নাথ হলের উত্তরবাড়ির দারোয়ান ছিলেন এবং ঐসময় তিনি দায়িত্বরত ছিলেন। জগন্নাথ হলে আক্রমণ শুরু হলে উত্তরবাড়িই প্রথম আক্রমণের শিকার হয় এবং তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। তাঁকে জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত করা হয়।

নমী রায়

তিনি রোকেয়া হলের প্রধান দারোয়ান ছিলেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে রোকেয়া হলের স্টাফ-কোয়ার্টার আক্রমণকালে পাকবাহিনী লাথি মেরে তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে অবিশ্রান্ত গুলি চালালে তিনি ও তাঁর ০৮ জন আত্মীয় শহিদ হন।

শামসুন নাহার হলের উত্তরে অবস্থিত গণকবরে ২৭শে মার্চ তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নুরুল ইসলাম

তিনি রোকেয়া হলের বেয়ারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্ধু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে রোকেয়া হলের স্টাফ কোয়ার্টার যখন পাকপাহিনী আক্রমণ করে তখন তিনি ও তাঁর দুজন আত্মীয় পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। শামসুন নাহার হলের উত্তরে অবস্থিত একটি গণকবরে তাঁকে ২৭শে মার্চে সমাহিত করা হয়।

নোনা মিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের কর্মচারী ছিলেন।

নেওয়াজ আলী

রোকেয়া হলের পিয়ন ছিলেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ কোয়ার্টারে আক্রমণের ফলে পাকসেনার গুলিতে তিনি শহিদ হন। তাঁর তিনজন আত্মীয় এই সময় শহিদ হন। ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের উত্তর দিকে গণকবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে এই গণকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

পীর মোহাম্মদ ওরফে পিরু মিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অফিসের পিয়ন ছিলেন।
পিতা- ওয়াজউদ্দিন খলিফা ও মাতা মালেকা বেগম।
শহিদ হবার সময় বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি সপরিবারে শিববাড়িতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। ২৫-২৬শে মার্চের ঘটনার পর যখন ২৭শে মার্চ কারফিউ শিথিল করা হলো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণহত্যার চিত্র ব্যক্তিগতভাবে দেখে অন্যান্যদের মতো তিনি একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সপরিবারে মুন্সীগঞ্জে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ির দিকে ট্রাকযোগে রওনা হন। পথিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ট্রাক পৌঁছুলে পাকবাহিনী ট্রাকের উপর এলোপাথারি গুলি চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই পীর মোহাম্মদ ওরফে পীরু মিয়া শহিদ হন। মুন্সিগঞ্জ সদরের এক চেয়ারম্যানের পারিবারিক গোরস্থানে শহিদ পীর মোহাম্মদ ওরফে পিরু মিয়াকে কবর দেওয়া হয়।

প্রিয়নাথ রায়

তিনি জগন্নাথ হলের দারোয়ান ছিলেন। গ্রাম ও ডাকঘর- ঘনিয়ার চর, থানা ও জেলা- কুমিল্লা। ২৫শে মার্চ রাতে জগন্নাথ হলে আক্রমণ করলে তিনি সেই আক্রমণে শহিদ হন।

বাসুদেব

রোকেয়া হলের ধোপা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ কোয়ার্টার আক্রমণ করে। ফলে পারসেনার গুলিতে তিনি শহিদ হন। তাঁর ছয়জন আত্মীয় এই সময় শহিদ হন। ২৭ মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তর দিকে গণকবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে এই গণকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

মধুসূদন দে

পিতা- আদিত্য চন্দ্র দে। ঢাকার বিক্রমপুরে তাঁর আদি নিবাস। তাঁর পিতা আদিত্য চন্দ্র দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চা ও খাবার বিক্রি করতেন। শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যখন বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল তখন তার চা ও খাবার বিক্রি করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ির নিচে একটি দোকান খুলেন। আনুমানিক ১৯২২-২৩ সালে তিনি এই এলাকায় একটি অস্থায়ী দোকান তৈরি করেন। মধুসূদন মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর বাবার সাথে ব্যবসায় যোগদান করেছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় তখন ডাকসুর দাবির ফলে মধুসূদনের চায়ের স্টলটিও এখানে স্থায়ীভাবে চলে আসে। তখন এর নামকরণ করা হয় মধুর ক্যান্টিন। স্বাধীনতার অনেক আগেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবমন্দিরের নিকট অবস্থিত স্টাফ কোয়ার্টারের একটি কক্ষ বরাদ্দ পেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানি সমরবাহিনী এখানেই ২৬শে মার্চ সকালবেলা আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে মধুসূদন দে প্রায় সপরিবারে নিহত হন। তাঁর সাথে ঐদিন নিহত হয়েছিল তাঁর অন্তঃসত্ত্বার স্ত্রী যোগমায়া দে, পুত্র রনজিত ও নবপরিণীতা পুত্রবধূ রানী। তাঁর মেয়ে রানু গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। ঐসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাড়ির কর্মচারী শ্যামলাল ও চান্দ দেব রায় গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত জীবন্ত মধুসূদন দের দেহ নিয়ে আসেন জগন্নাথ হলের গণকবরে এবং এই গণকবরেই জীবন্ত মধুসূদনের স্থান হয়েছিল। বাকি মরদেহগুলো ঘরের মধ্যেই কিছুদিন পড়েছিল। শেষে পৌরসভার সুইপাররা এসে মরদেহগুলো নিয়ে যায়।

(রানু রায় ও অরুণ দের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, রতনলাল চক্রবর্তী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা: ১৯৭১- জগন্নাথ হল, পৃষ্ঠা ৫৮-৬০ থেকে সংগ্রহীত)

মনভরণ রায়

নিপা (National Institute of Public Administration (NIPA) এর পিয়ন পদের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি জগন্নাথ হলের মধ্যে কাঁচাঘর তৈরি করে পরিবারসহ বসবাস করতেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী জগন্নাথ হল আক্রমণ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর একপর্যায়ে পাকবাহিনী মনভরণ রায়কে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে লাশ বহনের কাজে লাগায়। কাজ শেষ হলে সকাল দশটার দিকে লাশ বহনকারী সকলকে লাইন করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয় এবং তাদের উপর গুলি চালায়। এখানেই মনভরণ রায় শহিদ হন এবং তাঁর দেহ জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত করা হয়।

মোঃ মনিরুদ্দিন

রোকেয়া হলের দারোয়ান ছিলেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলের স্টাফ কোয়ার্টার আক্রমণ করে। ফলে পাক-সেনার গুলিতে তিনি শহিদ হন। তাঁর পাঁচ জন আত্মীয় এসময় শহিদ হন। ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তর দিকে গণকবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে এই গণকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

মিস্ত্রী রাজভর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তরের বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। পিতার নাম রামরতন রাজভর। শহিদ হবার সময় বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। জগন্নাথ হলের মধ্যে কাঁচাঘর তৈরি করে পরিবারসহ বসবাস করতেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী জগন্নাথ হল আক্রমণ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর এক পর্যায়ে মিস্ত্রী রাজভরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে লাশ বহনের কাজে লাগায়। কাজ শেষ হলে সকাল দশটার দিকে লাশ বহনকারী সকলকে লাইন করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয় এবং তাঁদের উপর গুলি চালায়। উল্লেখ্য যে মিস্ত্রী রাজভর ছিলেন এই লাইনের প্রথম ব্যক্তি। তাঁর দেহ জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত করা হয়।

মোঃ শামসুদ্দিন (শামসু মিয়া)

জহুরুল হক হলের নৈশপ্রহরী ছিলেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী জহুরুল হক হল আক্রমণ করে নির্বিচারে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে মোহাম্মদ শামসুদ্দিন তখন কর্মরত ছিলেন। পাকবাহিনী প্রথমে মুহাম্মদ শামসুদ্দিন (শামসু

মিয়া)-কে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে এবং পরে তাঁর দেহ লেপ দিয়ে মুড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের শরীরের অর্ধেকেরও বেশি অংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তাঁর মরদেহ জহুরুল হক হলের পশ্চিম প্রান্তে গণকবরে সমাহিত।

মোঃ হাফিজ উদ্দিন

রোকেয়া হলের একজন দারোয়ান ছিলেন।
গ্রাম- লুন্দিয়া। ডাকঘর- আগানগর। থানা- ভৈরব। জেলা- কিশোরগঞ্জ।
রোকেয়া হলে পাকবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে আক্রমণ করলে সেই আক্রমণে কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি শহিদ হন। তাঁকে ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তরদিকে সমাহিত করা হয়।

লাড্ডু লাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সুইপার ছিলেন। স্ত্রী চিন্তামণি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গোপিবাগের সুইপার কলোনিতে বাস করতেন। তিনি ও তাঁর দুই পুত্র গণেশ লাল ও ভরত লাল ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমার আঘাতে নিহত হন।

শিবু মোদক

তিনি জগন্নাথ হলের দারোয়ান ছিলেন। পিতার নাম গয়নাথ মোদক। জগন্নাথ হলের মধ্যে কাঁচাঘরে বসবাস করতেন। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী কর্তৃক জগন্নাথ হল আক্রমণের শিকার হলে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে দিয়ে লাশবহনের কাজে লাগায়। কাজ শেষ করলে তাকে সকাল দশটার দিকে লাশবহনকারী সকলকে লাইনে দাঁড় করার নির্দেশ দেয়। তারপর তাদের উপর গুলি চালালে তিনি পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন।

সিরাজুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন। গ্রাম ও ডাকঘর- কারখানা। থানা- বাউফল জেলা- পটুয়াখালী।
জানা যায়, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাবের মধ্যেই তিনি শহিদ হন।

সুনীলচন্দ্র দাস

তিনি জগন্নাথ হলের একজন দারোয়ান ছিলেন।

পিতা- প্যারিমোহন দাস। গ্রাম ও ডাকঘর- চিনামুড়। থানা- দাউদকান্দি। জেলা- কুমিল্লা।
তিনি জগন্নাথ হলের একটি কাঁচা ঘরে বসবাস করতেন। ২৫শে মার্চ রাতে তাঁর দায়িত্ব ছিল জগন্নাথ হলের দক্ষিণ বাড়িতে এবং দক্ষিণ বাড়িতেই তিনি পাকবাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। তাঁকে জগন্নাথ হলের গণকবরে সমাহিত করা হয়।

সুনীলচন্দ্র দে

পাম্প খালাসী, প্রকৌশল দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
পিতা- ভানুরঞ্জন দে। মাতা- কুসুমবালা দে।
শহিদ হবার সময় বয়স আনুমানিক ২২ বছর। ২৫শে মার্চ রাত দশটার পর শহীদুল্লাহ হলের স্টাফ কোয়ার্টার হতে জগন্নাথ হলে আসেন। ঐ রাতে পাকবাহিনী জগন্নাথ হলে আক্রমণ করলে হলে তিনি আটকা পড়ে যান এবং ঐ রাতে পাকবাহিনীর আক্রমণে নিহত হন। জগন্নাথ হলেই তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়েছে।

সোলায়মান খান

রোকেয়া হলের চাপরাশি, তবে মাঝে মধ্যে দারোয়ানের কাজও করতেন।
পিতা- আবদয়ল জব্বার খান। মাতা- যবুনা খাতুন।
গ্রাম- নওগাঁও। ডাকঘর ও থানা- মতলব। জেলা- চাঁদপুর।
২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী রোকেয়া হলে আক্রমণ করে। এসময় সোলায়মান খান নিদ্রিত ছিলেন। পাকসেনা অতর্কিতে লাথি মেরে তাঁর ঘরের দরজা ভেঙ্গে বিছানার উপর গুলি করে। সাথে সাথে সোলায়মান খান শহিদ হন। তাঁর একজন আত্মীয়ও এসময় শহিদ হন। ২৭শে মার্চ বর্তমান শামসুন নাহার হলের গেটের উত্তরদিকে গণকবর দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে এই গণকবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের নিকট স্থানান্তর করা হয়।

সোহরাব হোসেন

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন।
পিতা- লাল গাজী।
গ্রাম ও ডাকঘর- সুবিদপুর। থানা- নলছিটি। জেলা- ঝালকাঠি।
তিনি ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাবে শহিদ হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী পরিবারের শহিদদের নামের তালিকা

শহিদ খগেন্দ্র চন্দ্র দে-এর আত্মীয়

মতিলাল দে

শহিদ আহাম্মদ আলী ফরাজী-এর আত্মীয়

আঃ ছাত্তার সরকার

শহিদ আব্দুল খালেক-এর আত্মীয়

নূরজাহান নূরী

মনির উদ্দিন-এর আত্মীয়

জিন্নাতুন নেছা
সুরাইয়া বেগম
মোহাম্মদ আলী
সোবহান
রাশিদা বেগম

আলী আক্কাস-এর আত্মীয়

আফিয়া বেগম
রাশিদা বেগম
নাহার
পারভীন
জাহাঙ্গীর আলম
আলমগীর হোসেন

নেওয়াজ আলী-এর আত্মীয়

ছমিরুন নেছা
ছাদেক আলী
তোফায়েল আহম্মেদ

গিয়াস উদ্দিন-এর আত্মীয়

নাছির উদ্দিন

মোসলেম উদ্দিন

আবুল হোসেন

শহিদ নমী রায়-এর আত্মীয়

শংকর রায়

সুন্দরী রায়

বিরু রায়

শান্তি রায়

ছায়া রানী রায়

শিবু রায়

মায়া রানী রায়

তথ্যসূত্র:

এই তালিকাটি প্রস্তুতের জন্য *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (অষ্টম খণ্ড)*, রতনলাল চক্রবর্ত্তী রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭-১৯৭১ (১ম খণ্ড)*, রতনলাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যা: ১৯৭১ জগন্নাথ হল*, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন স্মৃতিফলকের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট: ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মচারীর ভাষ্য

১। গোপাল দাস (স্থান: কারাস ভবন, তারিখ: ১০-০৮-২০২৩, সময়: সকাল ১১:০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী গোপাল দাসের ভাষ্যে উঠে আসে সেই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র, বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুভূতি। ছোটোবেলাতেই অভাবের তীব্রতা অনুভব করেছেন। এমনো সময় গিয়েছে যে, না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হতো তাঁর পরিবারকে। শুধু খাবারের বিনিময়ে কাজ নিয়েছিলেন গ্রামের চায়ের দোকানে। কিন্তু সেখানে তাকে মারধর করায় বেশিদিন টিকতে না পেরে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন তার বাবা ঢাকায় এসেছে কাজের সন্ধানে। পরে পরিচিত একজনের সাথে তিনিও চলে আসেন ব্যস্ততম নগরী ঢাকায়। তখন থেকে শুরু হয়ে যায় তার ঢাকার জীবন। ঢাকায় এসে নাগরিক চাকচিক্য দেখে অবাক যেমন হয়েছিলেন, পাশাপাশি মায়ের জন্য মন খারাপ করছিলেন। একজনের সাহায্যে বাবার কাছে পৌঁছালেন, তাঁর বাবা জগন্নাথ হলে ডাইনিং-এ কর্মরত ছিলেন। ক্যাম্পাসের সকলের সুন্দর ব্যবহার, পরিবেশ, খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে গোপাল দাস মিশে গেলেন ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের সাথে। পরবর্তীতে তিনি নিজেও মধুর ক্যান্টিনে কাজ শুরু করেন। এমনকি ১৯৭১ সালের পুরো সময়জুড়ে তিনি ছিলেন ক্যাম্পাসের অন্যতম সক্রিয় ব্যক্তি। ছিল সকলের সাথে যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে ছাত্রসমাজ যে পাকিস্তানিদের পছন্দ করছে না এবং পাকিস্তানিরাও যে সেটা জেনে গিয়েছিল, তা তিনিও বুঝতে পারছিলেন। যেহেতু মধুর ক্যান্টিন ছিল তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু গোপাল সেই সমকালীন অনেক কিছুই সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

মার্চ মাসের শুরু থেকে দেশে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারে এরূপ আশঙ্কা করছিল। মার্চের দুই তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-কর্মচারীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। সেই প্রশিক্ষণের জন্য বিএনসিসি থেকে অস্ত্র এনে ডাকসুতে রাখতেন আবার প্রশিক্ষণ শেষে বিকেলবেলায় তা বিএনসিসিতে

জমা দিয়ে আসতেন। সেই সময় ডাকসু ছিল বর্তমান কলাভবনের ভেতরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ যেখানে, ওখানে। তিনটা রুম নিয়ে ছিল ডাকসুর কার্যক্রম। ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে গোপাল দাস বলছিলেন যে, খুন্তি, কোদাল নৌকা নিয়ে বহু লোক এসেছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে। লোকজন যত গাছ-গাছালি ছিল- তাল গাছ, জাম গাছের আগায় বসে ভাষণ শুনেছিল। গোপাল দাস বলছিলেন "মনে হচ্ছিল যেন গাছের মধ্যে মানুষ ধরে আছে।" এদিকে ছাত্র ইউনিয়ন খেলার মাঠে, ছাত্রলীগ কলাভবনে, কর্মচারীরা জগন্নাথ হলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখে। এভাবে ২৫শে মার্চ বিকেল পর্যন্ত চলেছিল। তখন ক্যাম্পাস ছিল প্রায় ফাঁকা। কয়েকজন ছাত্র-নেতাদের আনাগোনা ছিল শুধু। কেউ জানত না যে রাতে কি ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে হবে। তখন রাত প্রায় দশটা কি এগারোটা বাজে। আমার বাবা তখনও বাসায় ফিরেনি। ব্রজানন্দে কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন। উনি খুব ভালো মাদল বাজাতে পারতেন। মন্দির থেকে উনি জগন্নাথ হলে প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় গিয়েছিলেন। বাবাকে খুঁজে ওখানে গিয়ে উনাকে বাসায় নিয়ে আসি। তখন দেখেছিলাম ছাত্ররা গাছ কেটে রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু তারা এসবে এত পারদর্শী না হওয়ায় কর্মচারীরা তাদের সহযোগিতা করছিল। তারা বেরিকেড দিচ্ছিল পাকিস্তানিদের আসার আশঙ্কা থেকে। বাবা আর আমি বাসায় ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তখনো বারোটা বাজে নাই। বাইরে দেখলাম তখনকার যে রেললাইন (পলাশী নীলক্ষেত হয়ে সোনারগাঁও রোডে) ছিল, তার পাশের বস্তিতে ভীষণ আগুন লেগেছে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্পাসে ট্যাংক নিয়ে ঢুকে। যখন বস্তিতে গোলাগুলি শুরু করে দেয়, তখন আমরা আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। সেখানে আরো অনেককে দেখতে পেয়েছিলাম যারা আমাদের মতো আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ হলে মেডিক্যালের কিছু ছাত্র থাকতো, তারা মূলত নেপালি। আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করছিল। কারো হাতে, কারো বা বুকে গুলি লেগেছিল। এভাবে সারারাত গুলি চলল।

২৬শে মার্চ সকাল হলো। ভেবেছিলাম সারারাত গোলাগুলি হলো এখন সকালবেলা হয়তো আর গুলি করবে না। এদিকে সারারাতের আতঙ্কে গলার শুকিয়ে গিয়েছিল। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধায় হাঁটতে পারছিলাম না। এই অবস্থায় কোনোরকমে মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে পৌঁছালাম। ওখান থেকে দুইটি ওরিয়েন্ট রুটি নিয়ে খাবার জন্য

বসতেই পাক হানাদাররা দরজা ভেঙে প্রবেশ করে এবং আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। আমি মধুদা'র ক্যান্টিনের পেছনের একটি ড্রামের ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। ওটা ছিল গরুর ভুসির ড্রাম। তারপর ওরা এসে ঐ ড্রামে সজোড়ে লাথি মারলো এবং ড্রামটা তখন ঘুরছিল। ড্রাম ঘুরায় ভেতরে থাকার ফলে আমারও প্রচণ্ড মাথা ঘুরছিল। "সত্যি কথা বলি যে আমি পেশাব করে দিছি।" বেলা বারোটার দিকে হানাদাররা চলে যাওয়ার পর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসি মধুদা'র বাসার খবর নেওয়ার জন্য আমি রওনা হলাম। যাওয়ার পথে মাজারের খাদেমের ছেলে মান্নান সাইকেল দিয়ে দৌড়ে এসে বলে, "ভাংচুর মার দেয়, ভাগো।" ওরা বাংলা হিন্দি মিলিয়ে কথা বলত। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারত না। ওর সাইকেলে চড়ে আমরা যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যেই মিলিটারিদের গাড়ি দেখে মান্নান সাইকেল উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আমরা পড়ে যাই এবং আমি কিছুক্ষণ যাবৎ রাস্তায় পড়েই থাকি যাতে ওরা ভাবে আমি আহত।

মিলিটারি গাড়ি চলে যাবার পর আমি সেখান থেকে উঠে মধুদা'র বাসায় যাই। ওদের বাসায় সিঁড়িতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখতে পাই। তখন তোতা মিয়া নামক একজন ইউনিভার্সিটির কর্মচারীকে বলি "কাকা! মধু'দা কই?" তিনি বললো, "ওই যে দেখস না, সব মালের উপর।" আমাকে আবার বলল, "মধু কো মারকে গাঙ্গা মে ফেক দিয়া, তুম কো ভি মারকো গাঙ্গা মে ফেক দেগা।"

তারপর সেখান থেকে ফেরার পথে জগন্নাথ হলে দেখলাম মিলিটারি ট্যাংক দিয়ে মাটি উঠাচ্ছে আবার সেগুলো চাপা দিচ্ছে। ওখান থেকে কোনোক্রমে বাসায় ফিরতে পেরেছিলাম। তখন অনেকে বলছিল "তোরা হিন্দু, তোদের আগে মারবে। ভাগ, ভাগ। ঢাকা থেকে পালা।" তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু মাসের শেষ হওয়ায় হাতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। মধুর ক্যান্টিন থেকে এক কোটা ওভালটিনে চিনি মিশিয়ে সাথে নিয়েছিলাম রাস্তায় খাওয়ার জন্য। ২৭ তারিখ বিকেলবেলা আমরা রওনা হই। রাস্তায় সর্বত্র লাশ আর রক্তের দাগ। বুড়িগঙ্গার তীরে পৌঁছেই দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বউ-বাচ্চা সবাই অপেক্ষা করছে। সেখানে জগন্নাথ হলে প্রভোস্ট অফিসের পিয়ন ধীরেন দা'কে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা কি অবস্থা শহরের সব আত্মীয়-স্বজনের? তখন উনি ডুকরিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আমরা সবাই গিয়ে নৌকায়

উঠলাম। নৌকায় বড়ো-ছোটো সকল বয়সী মানুষ, বাচ্চাদের খেলনায় গিজগিজ করছিল। আর্মিরাও ছিল ওখানে একটু দূরে। ওরা গুলি করতে করতে আসছিল। নদীর ওপারে আমরা জিঞ্জিরায় গিয়ে উঠলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম বহু ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনদেরকে খাবার দিচ্ছে। চিড়া, গুড় বিতরণ করছিল তারা। "তখন মানুষের যে ভক্তি, মানুষের যে আন্তরিকতা অন্যরকম ছিল বুঝছেন। এখন তো....."

গেলাম লালবাগ বুড়িগঙ্গার তীরে। গিয়ে দেখি ছাত্র-জনতা লাইন ধরে আছে। জগন্নাথ হলের ধীরেন দা'ও ছিলেন। তার বউয়ের কোলে বাবু ছিল, চিন্তাহরন। তাদের নিয়ে রাস্তা পার হলাম। ঐ পারে গিয়ে দেখি কোলাহল। লাইন ধরে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, খাবার দিচ্ছে। আমরা সেখানে চেয়ারম্যান বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ঐ বাড়িতে সেদিন থাকি। পরেরদিন গুজব উঠল আর্মিরা আক্রমণ করবে। চেয়ারম্যানও বলতে পারে। আমরা দিঘীরপাড় চলে গেলাম। চাঁদপুর যাব ভাবলাম। হাতে টাকা নেই। তাই কীভাবে যাব বুঝতে পারছিলাম না। খাবারও ছিল না। ক্ষুধায় কুঁজো হয়ে খেলাম। পয়সার জন্য আসলে বললাম ভাড়া নেই। তারাও কিছু বলেনি। এরই মধ্যে মানুষের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। আমরা গিয়ে ট্রেনে উঠলাম অথচ কাছে টাকা-পয়সা নেই। সেখান থেকে ট্রেনে করে মাইঝদি গেলাম।

২৮ বা ২৯ তারিখ হয়ে গেল। জুতা খুলে ফেলে দিলাম। আর হাঁটতে পারছিলাম না। খাওয়া-দাওয়া নাই। কারোর কাছেও চাইতে পারছিলাম না লজ্জায়। হাঁটতে হাঁটতে জমির মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় সেখান থেকে খিরা (শসা) খেয়েছিলাম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে মাইল ত্রিরিশেক দূরে আমরা পিসিদের বাড়িতে গেলাম। ৩১ তারিখের দিকে গেলাম। তারা আমাদের বেশি সমাদার করেনি। কারণ জানে দেশে ঝামেলা চলছে। খামোকা এগুলো (আমরা) যন্ত্রণা। ঐখান থেকে আমাদের বাড়ি বিশ মাইল। সেখানে গিয়ে দেখি বোনসহ আরো অনেকে ওখানে। মা জিজ্ঞেস করলেন তুই কোথা থেকে আসলি? এখানে এমনিতেই ঝামেলা। নিজের সন্তানকে এভাবে বলছে তাই ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পেলাম। আমি আবার সাথে করে একটা মুসলিম ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

সদরঘাটে আসলাম। সদরঘাট থেকে নামার পর আইডি-কার্ড দেখাতে বলে। দেখলে তো বুঝে যেত আমি হিন্দু। পাশেই ঝামেলা চলছিল। ঐদিকে মুখ করায় আমি তখন থেকে চলে যাই দ্রুত। এখানে এসে আইবিএ ক্যান্টিনের সামনে গেট-

কিপাররের কাছে বললাম “কাকা আজ এখানে থাকব।” সে বলল এখানে জায়গা নেই। কলাভবনের দারোয়ান হামিদের কাছে গেলাম। সে ভেতরে ঢুকতে দিলো না। জানতো যে যন্ত্রপাতিতে আমি হাত দিয়েছি এবং রাইফেল আমার কাছে আছে। তারপরও উনার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সাত আনা দিয়ে একটা রুটি কিনে ভেতরে ঢুকি। এটা খেয়েই সারারাত ছিলাম। এত বড়ো ভবনে আমার ভয় লাগছিল। বাতাসে দরজার ধাক্কা লাগলেই ভয় পাচ্ছিলাম। সকাল হলে চোখ ফাঁকি দিয়ে আজিমপুর গেলাম আমির হোসেনের বাসায়। সে ঠিক করে দিলো আজিমপুর শাহসার মেসে। সে ছিল আমির হোসেনের বন্ধু। সে আবার প্রতিদিন নামাজে গেলে ডাক দেয়।

নামাজের আগে পরে বাইরে থাকি। প্রতিদিন ডাকে এবং বেয়াদব বলে গালি দেয়। তারা জানতো না আমি মুসলিম না। একদিন পর এখান থেকেও চলে আসি। তারপর প্রেসের কাছে বাংলাবাজার গিয়ে মামুন ভাইকে বলি জায়গা দিতে হবে। না হয় গুলি করব। আমার কাছে একটা রিভলবার ছিল। জাহিদ ভাইয়ের থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভালো চালাতে পারতাম। উনি আমাকে এক তালায় থাকতে বলেন। তারা দুতলায় থাকতেন। সুনীর নামে এক রাজাকার থাকত নিচতলার কাছে। সেখানে আরো রাজাকাররা আসে। তাদের মিটিং হয়। তারা ঠিকমতো খাবার দিতো না। চাকর দিয়ে খাবার পাঠাইতো। তাও ঠিকমতো দেয় না। সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর ক্যাম্পাসে আসি, দেখি কি হচ্ছে ক্যাম্পাসে। তখন দেখি আওয়ামী লীগের যারা নতুন ছাত্রলীগ করে, তারাও ১৪ই আগস্ট পাক-সরকারের আন্ডারে পরীক্ষা দিতে আসে। এটা আমার খারাপ লাগে। তখন হাসি বলে একজন বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নি সেও পরীক্ষা দেয়। বাবা ওউজ এর চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। দেশে যখন গেলাম, খাবার ছিল না। মুড়ির মধ্য খেজুরের গুড় মিশিয়ে মোয়া বানিয়ে বিক্রি করতো। গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতো এবং যা পেতো তা দিয়ে আমরা ভাই-বোনরা খেতাম। বাবার সাথে থাকতাম। আমি মধুর ক্যান্টিন ও ডাকসুতে চাকরি করতাম। ঐ রাতে জগন্নাথ হলে ছিল। রাত বারোটার সময় এখানে গিয়ে বাবাকে বললাম ঢাকায় গণ্ডগোল হবে চলে যাই।

২ । **আমির হোসেন** (স্থান: কলাভবন কমনরুম, তারিখ ৮-১১-২০২৩, সময় দুপুর ২:৩০ মিনিট)

আমি এখানে আছি ১৯৬২ সাল থেকে। বর্তমানে এখানে ঢাকা মেডিক্যালের ইমারর্জেন্সি বিভাগে। আগে পুরোনো আমতলাতে কমনরুম এটেন্ডেন্ট হিসেবে ছিলাম।

আমি যখন প্রথমে কাজে যোগ দেই, তখন কলাভবনের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়াটার ছিল। এখানে ছিলাম ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পর্যন্ত। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর আমরা চলে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আজিমপুর কোয়ার্টারে।

ষাটের দশকে যখন আন্দোলন হচ্ছিল, সময়টাতে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম না তেমনভাবে। স্বাধীনতার পরে কর্মচারীদের সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলাম। তখন অনেক কাজ করেছি।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ রাতে যখন শুনলাম পাকবাহিনী আক্রমণ করবে, তখন আমাদের ঐ বাউন্ডারির গেটটা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম যাতে ওরা বুঝতে না পারে। যখন সবাই গাছ কেটে বেরিক্যাড দিচ্ছিল, তখন আমরা আমাদের এই গেট এরকম করে ইট দিয়ে বাউন্ডারির সমান উঁচু করে বন্ধ করে দিই। এরপর আমি ও আমার বন্ধু সুভাষচন্দ্র দে (তখন সে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে চাকরি করতো) আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে পলাশী পর্যন্ত আসি। আমাদের একটু ভয় হচ্ছিল যে, কখন কোন দিক দিয়ে পাকিস্তানিরা চলে আসে। এই ভয়ে আমরা ফিরে যাই। পরে আনুমানিক রাত বারোটার দিকে চারপাশে এত শব্দ হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল আমাদের বিল্ডিং কাঁপছে। আমরা থাকতাম তিনতলায়। পরে আমার মা-বোনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সিঁড়ির নিচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

পরের দিন ২৬ তারিখ ঠিক হয়নি কিছু। এর পরের দিন ২৭ তারিখ কারফিউ ছাড়লে আমার বন্ধু সুভাষকে নিয়ে প্রথমে জহুরুল হক হলে আসি। এসে দেখি ওদের যে টিভি-রুমটা, ঐখানে দুইটা ছাত্র বেঞ্চে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর নিচে রক্তে ভরে গেছে। ওখান থেকে পরে জগন্নাথ চলে আসি। এসে দেখি মাঠে ট্যাংক দিয়ে মাটি উঠিয়ে অনেক মানুষকে মাটি-চাপা দিয়েছে। এটা দেখে আমার বন্ধু সুভাষকে বলি সুবাস এটা মধুদা'র মতন দেখা যায় না? মধুদা'র হাতে অনেক আংটি ছিল। ঐ মাটির ভেতর থেকে একটা হাত বের হয়েছিল যেটাতে মধুদা'র আংটির মতন আংটি পরা ছিল। ও বলে চল তো দেখি ওদের বাসায়। পরে শিববাড়িতে ওদের বাসায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি উনার ছেলের বউ, বড়ো

ছেলে, মধুদা'র স্ত্রী এবং উনার ছেলে ঘরের কোনায় গিয়ে পালিয়ে ছিলেন। এখানে ওই অবস্থাতেই তারে মেরেছে। মধুদা'র ওই ছেলের স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় ছিল। তাকেও মেরেছে। ওদেরকে দেখে আমি বললাম বাড়ির বাকি মেয়েরা গেল কোথায়? ওখান থেকে বের হয়ে কলাভবনের দিকে আসি। আবার বোন এখানের একটা বস্তিতে থাকত। এখানে আমার বড়ো বোনকে দেখতে পাই নাই।

কলাভবনের পেছনে একটা মাজার ছিল। এই মাজারের এখানে একটা ঘর ছিল। এই ঘরে আমার একটা সিট ছিল। আমি এইখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতাম। এটা কোন জায়গায় ছিল? এই মাজারের সঙ্গেই ছিল। এখন যেটা ডাকসু ভবন এখানেই ছিল। এইখানে এসে আবার আরেক বন্ধু তোফাজ্জল হোসেনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে চাকরি করতো। আমি ওরে বলি যে কি করবা তুমি এখন? সে বলে যে "আমি বাড়ি চইলা যামু।" আমি তাকে বলি, "তুমি যে বাড়ি চইলা যাইবা, আমরা তো বেতন-টেতনও পাই নাই কিছু। আমার কাছেও টাকা নাই। তোমার কাছে টাকা থাকলে আমারে কিছু টাকা দেও।" সে বলেছিল, "আমার কাছে ৬ টাকা আছে। তুমি ৫ টাকা নাও। আমি আরেকখান থেকে টাকা সংগ্রহ করে বাড়ি চলে যাইতে পারমু।" সে ৫ টাকা আমারে দিছিল। পরে এখান থেকে বাহির হয়ে বাসার দিকে যখন যাই। তখন ভিসির বাড়ির সামনে একটা বাংলো ছিল, ওইখানে প্রক্টর মহর আলী সাহেব থাকতো। ওইখানে দুইটা গাছ ছিল। ওই গাছের মধ্যে দেখি একটা লোক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওইটা দেইখা সোজা নীলক্ষেত দিয়ে যাইতে দেখতে পাই আমাদের বর্তমানের ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর বারান্দার ভেতরে দুইটা লোকের লাশ পড়ে রয়েছে। এটা দেখে চইলা যাই আজিমপুরে। বাসায় গিয়ে চিন্তা করি যে কী করব। আমাদের আরও স্টাফ আজিমপুর কোয়ার্টারে ছিল। ওরা জিঞ্জিরায় চলে যাওয়ার কথা বলেছিল। আমি বলি জিঞ্জিরায় তো পরিচিত কেউ নাই, কোথায় যাব, গিয়া কী করব? ওরা বলেছিল যে, চলো; গেলেই একটা ব্যবস্থা হইবো। পরে ঠিক করলাম যে জিঞ্জিরায় চলে যাব। সবাইকে নিয়ে যাই। যাওয়ার পরে আজিমপুরের আমারই এক বন্ধু, ওর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞেস করল আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমি বললাম, "কই যাচ্ছি বলতে পারব না। ঘরতনে বাহির হয়ে আসছি। এখন যাইতেছি কোথায় আশ্রয় নিবো দেখি।" সে তখন বলল যে, "চলেন আমাদের বাসায়।" পরে নদীর পাড়ে ওদের বাসাতেই গেলাম আমরা পুরো পরিবার।

আমার মা, আমার তিনটা বোন, আমি এইটাই আমাদের ফ্যামিলি ছিল। ৫ জনের ফ্যামিলি। আমার বড়ো বোন, বোন-জামাই ছিলেন তখন আমাদের সাথে। এটা হচ্ছে ২৭ তারিখের ঘটনা। পরে ওইখানে আমরা চারদিন ছিলাম। চারদিন পরে সকালবেলা ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে যাব। তো চিন্তা করলাম একটু গোসল করে নেই। আমি লুঙ্গি আর গামছা কাঁধে নিয়ে নদীতে আসতেছি। নদীর পাড়ে আসার পরে ঐ মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে একটা থাপ্পড় দিয়েছিল। আমি তাকে বললাম আপনি আমাকে মারলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, "দেখছ না বেটা এগুলো কী?" আমি বলি, কী? বলেন "বেটা আর্মি চাইরোদিকে দিয়া ঘেরাও করতাছে।"

আমি বলি "আর্মি ঘেরাও করতেছে!" পরে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখি যে ঠিকই গানবোট নিয়ে আর্মিরা যাইতেছে। গানবোট একটা না, কয়েকটা সমানে সারি কইরা যাইতাছেন। ওইখান থেকে বাহির হইলাম। বাহির হইয়া শুধু নদীর পাড় থেকে উপরে উঠতে উঠতেই শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ ওইখানে। পরে আমি যে বাসায় থাকি ওই বাসায় আর যেতে পারি নাই। বাসাটা ওইখান থেকে ২০০-৩০০ গজ দূরে। তো আমি ওই মসজিদের ভেতর চলে গেছি। যাওয়ার পরে চিন্তা করলাম মা-বোন আছে। ওরা যদি ভয়ে আবার কোনো দিকে বাইর হয়ে যায়। তো ফাঁকে ফাঁকে দৌড় দিয়ে আমি বাসায় চলে গেছি। গিয়ে ওদেরকে বলেছি "মা কী করবা এখন?" মা কয়, কী করবি? আমি বলি, "চলো, আগে মসজিদে যাই আমরা।" পরে একটা টিনের সুটকেস ছিল আমাদের। এটা নিয়ে মসজিদে চলে আসছি। ওদেরকে রেখে আমি আবার গেছি যে দেখি কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। ওই যে কাপড় আনতে গেছি আর আসতে পারি নাই। দেখি আমার পাশেই আর্মি মার্চ কইরা যাইতেছে। আমি ওই ভয়ে দৌড় দিছি।

দৌড়াইয়া একটা খালের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। খাল পার হয়ে ঐপারে গিয়ে এখান থেকে আটি চলে গেছি। আটি একটা জায়গার নাম। আপনার ফ্যামিলি তো তখন ঐখানেই ছিল? আমার ফ্যামিলির ওইখানে রেখেই গেছি। ওদেরকে কিছু বলতেও পারি নাই। এটা কি এখানকার কেরানীগঞ্জ? হ্যাঁ, দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছি। আমার কাছে কিন্তু টাকা-পয়সা ছিল না। পাঁচ থেকে সাত টাকা কি দশ টাকা আছে। তাও খুচরা টাকা আরকি। আটা আনা, ৪ আনা এরকম। দৌড়াইতে গিয়া আমার পকেটের থেকে ওইগুলো পড়ে গেছে। পয়সা পড়তেছে যে এটাও

দেখতেছিলাম। তো আমি চিন্তা করলাম কী যে খাব। কোথাও গিয়ে যে খাইতে হবে। আবার ফিরে এসে 'টুকুয়া' কয়েক টাকা পাইছি। এটারে হাতে নিয়ে দৌড়িয়েছি।

দৌড়াতে দৌড়াতে আর এক মসজিদে গিয়ে উঠেছি। মসজিদে উঠার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পরে দেখি এখানকার অনেক হিন্দু হাতে শাখা-বালা আছে, ওরা সবাই মসজিদে এসে ঢুকেছে। এটা আটিবাজারে? না জিঞ্জিরায়। আমি চিন্তা করলাম যে এখন যদি আর্মি এখানে আসে, তাহলে কাউরে ছাড়বে না। আর ওদের তো এক্কেরে ট্রেড মার্ক দেখাই যায় যে হিন্দু। তো আমি চিন্তা করলাম তাহলে এক কাজ করি। দেখি অন্য কোথাও যাওয়া যায় কি না। তো ওইখান থেকে বাইরে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে আসলাম। আসার পর ঐ যে আমার এক বন্ধু যার মামাতো ভাইয়ের বাসায় আসছি, ওর মামু আবার ঢাকা থেকে একটা নৌকা নিয়ে এপার আসছে। আমারে বললেন, "ভাতিজা কী হইছে?" আমি কইলাম, "আমি তো দৌড়াইয়া ঐখান থ্যাইকা আইসা পড়েছি ওদেরকে মসজিদের ভিতরে রাইখা। এখন ওরা কোথায় আছে আমি বলতে পারব না।" তিনি বলেন তো কী করবা তুমি?

আমি বলি চলেন আপনি লগেই যাই। ওনি বললেন না। তুমি এক কাজ করো তুমি নৌকাটা নিয়া ওইপারে যাও। তুমি চালাইতে পারো? আমি কই হ্যাঁ পারি। কিন্তু আমি পারি না। উনারে বলেছি যে পারি। বললেন তুমি এই নৌকা নিয়ে চইলা যাও।

ওই পারে চইলা যাও। আমি নৌকার ভেতরে উঠেছি। নৌকা এদিকে চালাই ওইদিকে যায়। ঐদিকে চালাই এদিকে যায়। মানে অনেক কষ্ট করে আর কি এই পারে আসছি। এপারে এসে দেখি একটা নৌকার ভেতরে টমেটো ভরা। আর নৌকায় যে লোকটা ছিল, ওই লোকটা এমনভাবে পড়ে রয়েছে যে মাথাটা পানির নিচে। ওর পুরো শরীরটা পানির উপরে। তারে মেরে ফেলেছে আরকি। ওই যে গানবোট দিয়া গেছে তখন মেরে ফেলেছে। ওরে দেইখা আবার শরীর কেঁপে উঠেছিল।

নদীর পাড়টা অনেক উঁচু ছিল। ঐপাড়ে উঠে আমি লালবাগে। এখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। নৌকা দিয়ে এসে পার হয়ে হেঁটে লালবাগে আসি। ওদের কাছে

যাওয়ার পরে ওরা বলে “চিন্তা করো না, ওরা এক থেকে দুই ঘণ্টা থেকে চলে যাবে।” তখন দিনের বারোটা বাজে। আমি কাঁদছিলাম বলে “কাইন্দো না” হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়ে নাস্তা পরোটা এবং চা খাইলাম। প্রায় একটা দেড়টার দিকে বলল চলো দেখি, হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে গিয়ে দেখি মানুষ আসা-যাওয়া করছে। ওইপার থেকেও আসছে। এদিক থেকেও অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে যারা যাইতে চাচ্ছে। আমি একটা নৌকায় চড়ছি। চইড়া অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি। নদীর মাঝখান অব্দি গিয়েছি। দেখি ওই দিক থেকে একটা গানবোট আসছে। আমি ভয়ে ঝাপ দিয়েছিলাম নদীর ভেতরে। পরে আবার সাঁতরাইয়ে ঐ পাড়ে আসছি। তখন আমি সাঁতার জানি। আসার পর বন্ধু (শাহজাহান ঢাকাইয়া লোক) বলে তোমাকে তো নৌকায় তুলে দিলাম ওইপারে যাওয়ার জন্য, আমি বললাম ওই গানবোট গেছে। আমি ভাবলাম গুলিটুলি করে কি না। এজন্য নৌকা থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়েছি। বলে কিছু হবে না। আরেকটা নৌকার ভেতর উঠায় দিয়েছে।

নৌকা দিয়ে ওই পাড়ে যাই। যাওয়ার পর দেখি আমার মা আর ওরা সব ওই বাসায় গেছে। যাওয়ার পর ওদেরকে নিয়ে এসে পরলাম আবার এই আজিমপুর কোয়ার্টারে। ৬ থেকে ৭ দিন পরে। তারপর মাকে বললাম কী করবা? বললাম বরিশাল দিকে যাই। মা কয় কীভাবে যাই? আমি বললাম বাহিরে যাই। তারপর নদীর পাড় গেলে দেখা যাইবো কী করা যায়। চিন্তা করছি। জিনিসপত্র সবকিছু মা গোছায়া নিয়েছে। আমাদেরই এক স্টাফ বলেন কাইল আমাদেরকে বেতন দিবে। আমি বললাম বেতন দিবে যেহেতু নিয়েই যাই। পরদিন রেজিস্টারের কাছে আসছি। দেখি রেজিস্টার আসে নাই। পরে চলে গিয়েছে। আমি ভাবলাম দূর বেতন দিব না। এমনিতেই চলে যাই বলে কালকের দিন থেকে আমরাও একসাথে যাব। ওই দিনেও রয়ে গেলাম। এটা তিন থেকে চার তারিখের দিকের কথা। পরের দিন এসে ঠিক বেতন পাইছি। ঐ সময় আমার বেতন ছিল ৫২টাকা। অন্যান্য অ্যালাউন্স নিয়ে ৭১ টাকার মতো। এই টাকাটা নিয়ে বাসায় গিয়েছি। মাকে গিয়ে বললাম মা আমার কাছে তো এ টাকাটা আছে। চলো আমরা চলে যাই। কাপড়-চোপড় গোছাইয়া নাও। আর কইলাম তুমি থাকো। আমি একটু লালবাগ থেকে আসি। আমাদের অনেক বন্ধুই ছিল লালবাগে।

যাওয়ার পর আমারে বলল কী করবা, এসে পর আমাদের বাসায়। আমি বললাম আসব না। ঢাকায় আর থাকব না। বরিশাল চলে যাব ওদেরকে নিয়ে। বরিশাল আমাদের বাড়ি আছে। বলে, তোমার কাছে টাকা আছে? আমি বললাম আছে। আজকে বেতন পাইছি ৭০ টাকার মতন আছে। পরে ও (বন্ধু আব্দুল মালেক) আমারে ১০০ টাকার মতন দিলো। ঐ সময় ১০০ টাকা অনেক টাকা। ঐ ১০০ টাকা নিয়ে বললাম যদি মরে যাই? কয় দূর তুমি যাও তো, ওদেরকে নিয়া যাও। পরে ভাবলাম আমার আরেক বন্ধু থাকে শিকশা বাজার, ওর সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। সকালে তো চলে যাব। ওর ঐখানে গেছি পরে কয় ওদেরকে নিয়ে যাব, এত দূরের রাস্তা, টাকা-পয়সা দরকার ছিল। তোমার কাছে টাকা আছে? আমি বললাম হ আমার কাছে ৭০ টাকা আছে। আর শাহজাহান উনি আমারে ১০০ টাকা দিয়েছে। কয় এই টাকায় তোমার কিছু হইব? আমি বলি হবে। ও তখন কয় আমার থেকেও ১০০ টাকা নাও। আমার কলিজাটা অনেক বড়ো হয়ে গেল।

পরের দিন সকালবেলা ভোরে ওদেরকে নিয়ে সদরঘাটে গিয়েছি। গিয়ে দেখি লঞ্চ-টঞ্চ কিছু নাই। পরে হাঁটা শুরু করেছি। পরে হাঁটতে হাঁটতে একদিন লেগেছে সদরঘাট থেকে মুন্সিগঞ্জ যাইতে। মানে ভোর ছয়টা থেকে নিয়ে রাত ৯টা বাজছে মুন্সিগঞ্জ গিয়ে উঠতে। ঐখানে যাওয়ার পরে এত বৃষ্টি। ওইখানের এক লোক এক স্কুলে আমাদের জায়গা দিয়েছিল বৃষ্টির জন্য। চার দিক দিয়া পানি পড়তেছে, বসার জায়গা নাই। তারপরও ওদেরকে নিয়া কোনোরকমে ভেতর গিয়ে বসেছি। টাকা তো আছে, কিন্তু খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। পরে বাইরোইছি ঐখান থেইক্যা। হাঁটতে হাঁটতে একখানে গেছি। গিয়ে দেখি আটার রুটি বানাচ্ছে আর ভাজি। পরে ঐখানে অনেক লোক দাঁড়ায় রয়েছে। পরে অনেক কষ্ট করে পাঁচটা না ছয়টা রুটি পেয়েছি ভাগে। এগুলো আর ভাজি নিয়ে এসে খেয়েছি। আর পানি ছিল নদীর পানি, ঐটাও খেয়েছি। খেয়ে চিন্তা করি কী করব। আমরা মানুষ ছিলাম সাতজন। আমাদের বরিশালের আরও দুই থেকে তিনটা গ্রুপ আছে। কারো তিনজন বা চারজন করে মানুষ। হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে গিয়া নৌকাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করি যাবে কি না। একজন ৪০০ টাকা বলে। আমার কাছে তো এত টাকা নাই। হাঁটি আর এরে তারে জিগাই। পরে একজন বলল আমি তো ঐ দিকেই যাব। গেলে আমার সাথে চলেন। বলি কত টাকা দিব? বলে ১০০ টাকা দিয়েন। আমি ভাবলাম ১০০ টাকায় যাওয়া যায়। পরে ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে গেলাম। কলাভবন থেকে ডিন অফিস যতোটুকু, ততটুকু দূরে স্কুলঘর থেকে নদীর পাড়।

জিনিসপত্র নিয়ে যখন বাহির হই, তখন আমাদের ঐদিকের লোকজন বলছে আমরাও যাব। তারা কইল আমরা যেই নৌকা ঠিক করেছি ওইটা দিয়াই যাইমু। নৌকাওয়ালার সাথে কথা কইয়া ঠিক হলো ২০০ টাকায় চারটা ফ্যামিলিকে নিয়ে যাইব। গয়না নৌকা তো তাই অনেক বড়ো। নৌকা করে কাটপট্টি গেছি প্রথমে। এটা মুন্সীগঞ্জে থেকে দূরে ফরিদপুরের মধ্যে। ঐখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে রাস্তায় ডাকাতে ধরছে। পরে ঐদিকে অনেকে লঞ্চওয়ালা ছিল, যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে। লঞ্চ নিয়ে ঘুরে এসে ওদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। তাই আর আক্রমণ করতে পারেনি। ঐখানে গিয়ে পৌঁছাইয়া গ্রামের হোটেলে ভাত, ডাল, আলু ভর্তা দিয়ে খেয়ে ঐখান থেকে যাই হিজলা। ঐখান থাইকা হাইটা বাড়িতে চলে গেছি। বাড়িতে আমি একমাস ছিলাম। একমাস পর আমাদের সাথে আরো স্টাফ ছিল, যারা বলছে আমরা যদি চাকরিতে জয়েন না করি তাহলে বহিষ্কার করবে। তারা হলো মকবুল আহমেদ, শাহেদ আলী, আরেকজনের নাম মনে নাই। একজন রেজিস্টার অফিসের পিয়ন ছিল আর একজন ছিল ডিসপাসে মানে চিঠির কাছে। আরেকজনের মনে নাই।

বাসায় কাজের বুয়া রাখছি আমরা চারজন মিলে। বুয়াকে চারজনে মিলে মাসে ৩০ টাকা দিয়ে দিতাম। ও আমাদেরকে দুইবেলা রান্না করে দিত। ক্যাম্পাসে তেমন ছাত্র ছিল না তখন। ক্যাম্পাসের টুকটাক স্টাফরা ছিল।

শিক্ষকরা বলতে প্রক্টর স্যার ছিলেন। প্রক্টর ছিলেন তখন মোহর আলী স্যার। ক্যাম্পাসের মেইন গেট ঐখান থেইকা বাউন্ডারি দিয়া ঐপাশ পুরাটা একটা মহল্লার ভেতরে ছিল। এইখানে অনেকগুলো ঘর ছিল, আর সামনে দোতলা একটা বাড়ি ছিল। এখানে একটা লাইব্রেরি ছিল।

এই তিন ফ্যামিলি আর আমার ফ্যামিলি এই চারটা ফ্যামিলি ছিলাম। বাকিদের দেশে রাইখা আমরা ঢাকায় যাইতে চাইলাম। আমি এক মণ দশ সের চাল কিনলাম ২০ টাকা দিয়ে। মাকে এগুলো কিনে দিয়ে আরও যা টাকা ছিল, তা নিয়ে আমি ১০ থেকে ২০ টাকা নিয়ে ওদের সাথে ঢাকায় চলে আসি। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে জয়েন করি। আমি প্রক্টরের আন্ডারে ছিলাম। এসে দেখি কেউ নাই। অফিস বন্ধ। রেজিস্ট্রারের কাছে গেলে বলেন ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে জয়েন করতে। তেমন ডিউটি নাই। সকালে আইসা হাজিরা দিতাম। দুইটা পর্যন্ত থাইকা চলে যেতাম। তখন আজিমপুর কোয়ার্টারে একাই থাকতাম। একদিন লাইব্রেরির কয়জন

স্টাফ এখানে গিয়ে থাকতে চায়। পরে ওরা চারজন স্টাফ, যারা চাকরি করতো, তারা আমার কোয়ার্টারে রাত্রে গিয়ে গিয়ে থাকত।

পুরো ক্যাম্পাস ফাঁকা ছিল। সারাদিন ওই দুজন-চারজন করে আসত। চারিদিকে আর্মি থাকত। আর্মি চেক করতো আইডি-কার্ড আছে কি না। আমাদের ইউনিভার্সিটির কার্ড ছিল। এটা দিয়া আমরা আসা-যাওয়া করতাম।

এটা রমনা লাইব্রেরী ছিল। ওদের এখন লাইব্রেরিটি নিউমার্কেটে আছে। এটা স্বাধীনতার পরে কামাল ভাই আমাকে বলেছিল।

বিজয়ের সময় আমরা ঘর থেকে বের হয়ে পলাশীতে এসেছিলাম। পরে ট্রাকে চড়ে মোহাম্মদপুরে গিয়েছি। ঐখানে বিহারিরা গোলাগুলি করেছিল। তবে এখানে অনেকক্ষণ থেকে আমরা চলে আসি। তারপর আসি মিরপুর দশ নাম্বারের দিকে। এইখানে দেখি গোলাগুলি হচ্ছিল। এইখানে সুভাষকে বলি চল চলে যাই। সে বলে একটু এক নাম্বার হয়ে যাই। আমি বললাম এদিক দিয়ে যাই। পরে এসে নিউ মার্কেটের দিকে গিয়েছিলাম আমরা।

তখন তো ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে দুই থেকে চারজন প্রয়োজনে আসত। পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল অনেক পরে।

প্রশ্নকর্তা: তখন ক্যাম্পাস খোলা ছিল?

আমির হোসেন: কলাভবনে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। পরীক্ষার হলে যাওয়ার সিঁড়িতে দুইখানে ককটেলের মতো কি যেন বেঁধে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি প্রক্টর স্যারকে বললে স্যার ঐখানে কি জানি দেখা যায় সিঁড়ির মধ্যে। তিনি আর্মিদের খবর দিয়েছিলেন। পরে আর্মিরা এসেছিল। আমাদের কোয়ারটেকার ছিল দলিল উদ্দিন তিনি তো রোকেয়া হলে ট্রাঙ্ক কাপড় চুরি করে নিয়েছিল। সেই দলিল উদ্দিনকে খবর দেওয়া হয়েছিল। উনি আবার আর্মিদের নিয়ে এসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পথে সুতা দিয়ে বেঁধে মাঝখানে দুইটা ডিব্বার মতো রেখে দিয়েছিল। দলিল উদ্দিন আর্মির লোক ছিল। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেছিল। কিন্তু এটি কোনো একটা বোমা ছিল না। আসলে এটি টেপ দিয়ে পেঁচানো ছিল। খুলে দেখি এর ভিতরে বালু। এর কারণ ছিল যাতে পরীক্ষা দিতে কেউ না আসে।

১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তো ভয়ে আসি না। আমরা শুনেছি ডাক্তারকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মর্তুজা স্যার, মনির চৌধুরী এইসব নাম শুনেছি। আমাদের কিছু করার নাই। লাইব্রেরিতে এক বিহারি চাকরি করতো। ওর বাসায় গিয়ে আমরা আলাপ করতাম।

আমরা ঠিকমতো বেতন পেতাম। স্বাধীনতা আগ পর্যন্ত বেতন পেতাম আমরা যারা জয়েন করেছিলাম তারা। যারা জয়েন করেনি তারা একসাথে বেতন পেয়েছিল। আমি যখন আজিমপুরে থাকি, তখন একটা স্টাফ, রেজিস্টরের পিয়ন ছিল নাম ভুলে গেছি, উনি মারা গিয়েছেন। আমাকে ও বলল শিববাড়িতে আজকে রেইড দিবে গোপালকে ধরার জন্য। আমি বললাম গোপালকে ধরার জন্য রেইড দিবে। তখন আমি সাইকেল চালাতাম। এটি আমার কাছে আটটার দিকে বলেছিল। পরে আমি চিন্তা করলাম গোপালকে ধরে নিয়ে যাবে। গোপাল আবার শিববাড়িতে শাহেদ আলীর বাড়িতে থাকে। পরে আমি সাইকেল নিয়ে আসি। আমি বললাম শিববাড়িতে রেইড দিবে। তুই আমার সাথে চল। সাইকেলে করে ওরে নিয়ে গেছি আজিমপুরে। পরে আবার চিন্তা করি শিববাড়িতে এসেছিলাম, কেউ মনে হয় বলে দিতে পারে। আমার ঠিকানা খুঁজে বের করবে। পরে ওরে নিয়ে চলে গেলাম শাহসাব বাড়িতে।

ঐখানে ব্যাচেলাররা থাকত। সেখানে আমার কিছু পরিচিত লোক ছিল। ওকে ওইখানে রেখেছিলাম। পরে ওকে টাকা দিয়েছিলাম। কত টাকা দিয়েছি খেয়াল নাই। ঐখানে কয়েকদিন ছিল। থাকার পরে ওকে খুঁজে পাই নাই। না বলে চলে গেল। পরে আবার ঠিকই শিববাড়িতে রেইড দিয়েছে। এই গণ্ডগোলের ভেতরে ও আবার কলাভবনে এসে পড়েছিল। আমি আবার কমনরুমেও চাকরি করি। আমি তাকে বলেছিলাম কেন তুই এখানে? কেন আছোস? গোপাল বলল, আমার কাজ আছে। আমি বললাম মেইন গেটে বোম ফোটছে। এখানে বোম ফোটে। তুই এখান থেকে চলে যা। আমি আবার কমনরুমে চায়ের দোকান করি। মেয়েরা কিছু আসে। চায়ের মাধ্যমে কিছু আয় হতো। কিছুক্ষণের মাঝে আরেকটা বোম ফোটে। চারিদিকে পুলিশ, আর্মি ঘেরাও করে রাখছে। আমি ওরে তিন-চার কাপ চা বানিয়ে দিয়েছি। বললাম সাংবাদিকতা বিভাগে দিয়া আয়।

এসময় সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন আতিকুজ্জামান স্যার। ভাবলাম যে আমি বলে দিব আমার দোকানে কাজ করে। ওর আইডি-কার্ড নাই। আমার

আইডি-কার্ড আছে। পরে বললাম তুই চলে যা। আমাকে বিপদে ফালাইস না। পরে ও চলে যায়। এর ভেতরে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

প্রতি মাসে টাকা পাঠাতাম। আমি আর যাইনি। আমি ওর কাছে পুরো টাকা দিয়ে দিতাম। আমি চা বিক্রির টাকা দিয়ে চলতাম। সারা দিনে আট আনা, ১২ আনা হতো। বেয়াই প্রতি মাসে টাকা দিয়ে আসত। আমার মা ছিল। আমাদের গ্রামে আক্রমণ হয় নাই। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুভাষ বেঁচে আছে, আজিমপুরে থাকে।

স্বাধীনের তিন মাস আগে পরিবারের সাথে দেখা হয়েছিল। বেয়াই বলল দেশে অনেক অসুবিধা মানে আমাদের দেশে। সপ্তাহে দুদিন হাট বসতো। হাট থেকে বাজার-সদায় করে আনার লোকজন ছিল না। ওদের অনেক কষ্ট হয়। এক কাজ করো, তুমি ওদের নিয়ে আসো। মার কাছে চিঠি লিখেছিলাম তখন। যেদিন আমার মা আসে আমরা কোয়ার্টারে থাকতাম। কিছুদিন পরে গোলাগুলি হচ্ছিল। তাকিয়ে দেখলাম মাথার উপরে শুধু বাতি জ্বলছে। আমি বললাম মা এতদিন আল্লায় বাঁচিয়ে রাখছে। এখন আর বাঁচব না। স্বাধীনের দু-তিন দিন আগে নিয়ে ভারতের প্লেন এসেছিল। রাতে প্রায়ই গুলি করতো। মা বলল, আমাদের যাওয়ার জায়গা নাই, মরলে মরুম। এখানেই আমরা ছিলাম। স্বাধীন হওয়ার পর মোহাম্মদপুর ঘুরে আসলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় খুলল। সবাই আসা যাওয়া শুরু করল।

৩। **মনির হোসেন বাচ্চু** (স্থানঃ কারাস ভবন, তারিখঃ ১২/১১/২০২৩, সময়ঃ দুপুরঃ ২টা)

আমার যখন ১০ থেকে ১২ বছর বয়স ছিল, তখন পুরান ঢাকা আমার পরিচিত একজন, হাফসু নাম, তিনি আমাকে এনে মধুর ক্যান্টিনে কাজ দিয়ে দেয়। আমার বাবা কৃষি কাজ করতেন মুন্সীগঞ্জে। আমরা খুব ছোটো থাকতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন কলেরা হয়ে। আমার মা মারা যাওয়ার পর আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এখন আট থেকে নয় ভাই-বোন।

মধুর ক্যান্টিনে কাজের আগে আমি স্যান্ডেলের ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম হাজারীবাগে। তখন ক্যাম্পাসের দিকে আসতাম মাঝেমাঝে। এখানে আগে অনেক গাছপালা ছিল। জাম গাছ, অর্জুন গাছ। আমার বোনের ভাসুর ডিন অফিসে চাকরি করতো। গোয়ালা পদ ছিল, তার ছাত্রদেরকে পানি খাওয়ানো কাজ ছিল। তিনি

আমাকে ক্যাম্পাসে কাজের জন্য নিয়ে আসেন। এনএসএফের আমলে ক্যাম্পাসে তো তখন অনেক মারপিট হতো। বড়ো বড়ো রাম দা, হকিস্টিক, কিরিজ এগুলো নিয়ে আসত। ঐ সময় ঘোড়ার রেস হতো রোববার। মধুদা'কে রোজ আমাদের মধ্য থেকেই কেউ একজন বাসায় এগিয়ে দিয়ে আসত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের দিন ২৪ থেকে ২৫ মার্চ আমি সাথে গিয়েছিলাম। শিববাড়ির প্রথম বিল্ডিংটার দুতলায় থাকতেন ওনি। শেরাটনের ওখানে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য ছিল। মধুদা'কে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি ও আমার সাথে যারা কাজ করতো তারা ১০ থেকে ১৫ জন রাতে ক্যান্টিনে শুয়ে আছি। প্রায় বারোটার দিকেই শুরু হয়ে যায় আক্রমণ। একেকজন একেকদিকে পালিয়ে যেতে লাগল। যে যেদিকে পারছিল, ছুটছিল। আমি গিয়েছিলাম নিপা বিল্ডিং- এ আশ্রয় নিতে। ঐখান থেকে পরে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে গিয়েছিলাম। ওটার সামনের গেট বন্ধ ছিল। তাই পেছনের গেট দিয়ে প্রবেশ করি। আমার মনে হয়েছিল যে, এখানে তো সবাই বিদেশি। বিদেশিগো কেউ মারতে পারবো না। ঐখানে কাটাবনের সব লোক আইসা আশ্রয় নিয়েছিল। আমি বাথরুমের সামনে একটু জায়গাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

দুইটার দিকে শুনি কি যে মধুদা ও তার ফ্যামিলিকে মাইরা ফালাইছে। আজান দিচ্ছে এমন সময় আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি মধুদা ও তার বাসার খবর জানার জন্য। রাস্তায় দিয়ে মিলিটারিদের গাড়ি চলাচল করছিল একটু পরপর। আমি কোনোক্রমে রমনা রেসকোর্স ময়দান হয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে বাংলা একাডেমি দিয়ে উনার বাসায় পৌঁছাই। গিয়ে দেখি সবাইকে মেরে ফেলেছে। আর মধুদা'কে পাইনি সেখানে। শুনেছি তাকে না কি রাতে নিয়ে গেছে জগন্নাথ হলে। মধুদা'র মেয়ের রানু। তার বুকে একটা গুলি এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়েছিল। আর আরেকটা গুলি গালের চোয়ালে লেগেছিল। ওকে আমি আর শিববাড়ির কয়েকজন মিলে চট বস্তার/ টিনের মধ্যে নিয়ে ইমার্জেন্সি বিভাগে নিয়ে যাই। রানু সম্ভবত তখন ১৪/১৫ বছর বয়সী ছিল।

রানুকে হাসপাতালে ভর্তি করে গিয়েছিলাম শাঁখারীবাজারে মধুদা'র বড়ো মেয়ের বাসায়। তাদেরকে গিয়ে খবর দিলাম যে বাসার সবাইকে মেরে ফেলেছে। মধুদা'কে যখন নিয়ে যায় তখন না কি এমন প্যাঁছায়া ধরছে যে নিতে দিবে না। তখন তারে বেয়নেট দিয়ে দুই সাইড (হাত) থেকে কেটে ফেলে দেয়। মধুদার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট ছিলেন। মধুদা'র বড়ো মেয়ের পরিবার তখন তাদের ব্যাগপত্র গুছিয়ে

চুনকুইট্টা চলে যায়। আমিও তাদের সাথে চুনকুইট্টা পর্যন্ত গিয়েছিলাম তাদের বাড়ি চিনে আসার জন্য। তাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিয়েই আমি ফেরত এসেছিলাম হাসপাতলে। আর বাসায় মধুদা'র ছোটো যে ছেলে-মেয়ে (পিকন ছিল সবচেয়ে ছোটো) ওদেরকে হীরালাল নামে একজন, যিনি মধুদার সাথে কাজ করতেন, তিনি তার কাছে বাচ্চাদেরকে রেখেছিলেন। হাসপাতালে থাকতে শুনেছিলাম যে, আহত যত লোক ছিল, যাদের গুলি লেগেছিল, তাদেরকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবে। যাতে করে সাংবাদিকরা কিছু দেখাতে না পারে। এই কথা শুনে মেডিক্যালের সকলে পালিয়ে যেতে লাগল। তাই আমরাও বের হয়ে পড়ি সেখান থেকে। তারপর রানুকে নিয়ে চুনকুইট্টা ওর বোনের বাড়িতে নিয়ে যাই। তখন চুনকুইট্টা-এর বোনের বাসায় রেখে এসেছি। মেয়েটাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম, একজনের থেকে কয়েকটা টাকা নিছিলাম, রিকসা দিয়ে চকবাজারের সাথের ওয়াইজঘাট সেখানে গিয়েছিলাম তখন এক টাকা বা ১২ আনা দিয়ে।

তারপর নৌকা দিয়া, তারপর হেঁটে হেঁটে গেলাম। মেয়েটা একসময় পানি খেতে চেয়েছিল। তাই এক বাসা থেকে ছোটো একটা বদনা দিয়ে পানি দেই খেতে। এটাই খাওয়াই তখন। এটা নিয়া ওদের সাথে এক হয়ে গেল। পরে শুনলাম হীরালাল ওদেরকে নিয়ে গেছে।

আবার আসলাম। এখানে আসার পর দেখি লাশ আছে। ঘর তারা তালা মারা। আমি ও হীরালাল পোলাপান ওদেরকে অর্থাৎ বড়ো বোন অনিমাদি তার স্বামী ও ছেলে (অনিমা দি'র পরিবার) ছিল, মধুদা'র আরো মেয়ে ছিল প্রতিভা রাণী, রানু দে তাদেরকে নিয়ে নৌকা দিয়ে শ্রীনগরে যাই। কিছু রাস্তা গুণ টেনে, বৈঠা দিয়া খুব দ্রুত দেওয়া যায় না, তাই কাধে করে গুণ টেনে দ্রুত যাই। এভাবে ভেঙে ভেঙে যাই।

মেডিকেলে রিলিজ লাগত না তখন। ভর্তি করারতেই কিছু লাগত না তখন। বাহির হইতেও লাগে না। চিকিৎসা পেলে নিজেই চলে যাওয়া যেত। কোনোরকমে চিকিৎসা পেয়েছিলেন। ব্যান্ডেজ করা বা এরকম কিছু। যে গুলিটা খেয়েছিল তা তারা বলেনি যে ভেতরে আছে। দেশে নিয়ে বের করা হয়েছিল। গুলিটা ভেতরে ছিল বুঝা যায়নি। দেশের হাসপাতালে থাকার সময় বুঝা গিয়েছিল। দেশে, মানে শ্রীনগরের হাসপাতালে যখন বুঝতে পারে গুলি ভেতরে আছে, তখন গাল কেটে

গুলি বের করে। আরেকটা গুলি তখন বুক ছেদ করে পেছনের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

প্রশ্নকারী: শ্রীনগর কীভাবে ছিলেন? কাপড়-চোপড় সাথে কিছু নিয়ে যেতে পেরেছিলেন না কি একই কাপড়ে ছিলেন?

মনির হোসেন: শ্রীনগরে কিছুদিন ছিলাম। ঐখানে ওদের একটা চৌচালা বাড়ি ছিল। টপ বারান্দা। চারটা খোপ ছিল। ভেতরে একটা, সামনে বারান্দায় দুইটা, আরেকটা কেবিন। চারটা রুম ছিল ঐ ঘরটায়। পরের দিনই আবার ঢাকায় আসি। ওরা বলে দিচ্ছিল কোথায় কি আছে।

ওই কাপড়-চোপড় ও কিছু স্বর্ণ পাইছিলাম। ওগুলো নিয়ে আবার চলে যাই শ্রীনগর। তখন মুমিন কোম্পানির বাস চলত জিঞ্জিরা দিয়ে। ইটের সিলিং ছিল। হর্ন বাজাত পোঁ পোঁ করে। ঐ বাসে করে সৈয়দপুর যেতাম। তারপর ভেঙে ভেঙে শ্রীনগর গেলাম। আবার আরো কিছু নেওয়ার কথা বলে। তখন আবার গিয়ে কাসার জিনিস, পিতলের জিনিস তখন তিন টাকা সের ছিল। এগুলো তখন শ্রীনগর ওদের বাসায় নেই। খালি কলসি এগুলো নিয়ে শ্রীনগরে বিক্রি করেছি তাদের চলার জন্য। এগুলো বিক্রির টাকাতেই খেত তখন। আবার অন্য কিছু নিতে পাঠাত। এভাবে দুই থেকে এক দিন পরপরই কিছু নিতে যেতাম। শেষে দুই মণের একটা চালের বস্তা ছিল। চালের বস্তা যখন নিলো তখন রুমে তিনটা লাশ। পায়ের গোড়ালি অবধি ঢুকে গিয়েছিল রক্তের মধ্যে। আমি মুখে কাপড় বেঁধে, চাবি দিয়ে ঢুকি। তিনজনের দেহ ছিল। মধুদা'র ছেলের বউকে যখন ধরতে যায়, তখন ছেলেটা পাকের ঘর থেকে এগিয়ে আসছিল।

তারে তখন গুলি করে। উপুর হয়ে পড়েছিল। আর তার বউকে ওরা বার করে নিয়ে টেনে-হিঁচড়ে বারান্দায় ফেলে রাখে। মধুদা'র বডি প্রথম দিনই নিয়ে গিয়েছিল। মধুদা'র বউ ছিল বারান্দায়। আর ছেলের বউ পাশের রুমে সকালবেলা যে গোসল করেছিল সে কাপড় চিপে রেখেছিল। সে ওখানে চুপটি মেরে বসে ছিল। সে বসা অবস্থায়ই আস্তে আস্তে মারা গিয়েছিল। তার গায়ে হাত দেইনি। মধুদা'র ছেলের যে গুলি লেগেছিল, তারে হাত উঠিয়ে দেখি। তখন অনেক ভালো সাহস ছিল। নাক বেঁধে রুমে ঢুকে ভেতর থেকে জিনিস নিতাম। আবার নেয়া শেষে তালা মেরে রেখে দিতাম।

তখন ধরা পড়িনি। আর্মিরা আশে পাশে থাকলে সরে থাকতাম। আর্মিরা ঐদিকে খুব একটা যেত না। ক্যান্টিন থেকে যখন মালামাল নিছি, ১০ নাম্বার কড়াই দুইটা যেটায় ছানা পাক করতের, সন্দেশের এটাও ১০০ কাপ হয় এমন কেতলি, চায়ের কাপ এগুলো ক্যান্টিন থেকে নিয়ে তাদের এক ভাগনা ছিল ওলাই করে নাম, রেজিস্টার ভবনে পিয়নের চাকরি করতো, তার ঐখানে রাখতাম। একদিন যখন ঐদিক দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি আর্ট কলেজ থেকে হরিণ, দুম্বা সব আইনা মিলিটারি এখানে খেত। আর্ট কলেজে হরিণ, দুম্বা পালতো। আমি এই যে ওদের বাসায় খেতাম। এখানে আসলে কিছু খেয়ে নিতাম আবার শ্রীনগরে চলে যেতাম। একদিন পরপর দিনে এসে দিনেই চলে যেতাম। রাতে থাকতাম শ্রীনগরে। একসাথেই থাকতাম। তখন জাতের ভেদাভেদ ছিল না।

তারপর একদিন আইসা দেহি মধুদা'র বউয়ের পেটটা ফেইটা একটা বাচ্চা এতহানি বাইর হইয়া রইছে। গুলি খাওয়া মানুষ কিন্তু কালো হইয়া যায়। রং কালো হইয়া আছে। দুইদিন পর আইসা শুনি ইউনিভার্সিটি থেকে, সিটি কর্পোরেশন থাইকা লোক আইসা পুরা ঘর পরিষ্কার করেছে। যত লাশ আছে এগুলো পরিষ্কার করছে ও ধোয়া-মুছা করাইছে। এর পরেরদিন এসে দুই মণ চালের বস্তা ছিল এটা নিয়েছি। এসে দেখি দরজার তালা ভেঙে লাশ নিয়ে গেছে। চালের বস্তা নিচ্ছি, এ চালের বস্তা আমতলা নিলাম মাথায় করে। সেখান থেকে রিক্সায় উঠলাম, রিক্সা দিয়ে চকবাজারের কাছে ওয়াইজঘাট গেলাম।

এখান থেকে নৌকায় উঠলাম। নৌকা থেকে মাথায় নিয়ে বাসে উঠলাম। সৈয়দপুর বাস থেকে আবার আরেক নৌকায় উঠলাম মাথায় করে। সেখান থেকে শ্রীনগর গেলাম। শ্রীনগর থেকে মাথায় করে বাড়িতে গেলাম। তবে কয়েকদিন খাওয়ার পর সে চাল আর খাওয়া যাচ্ছিল না কারণ রক্ত শুষে চলে গিয়েছিল ভেতরে। এটা খাওয়া যায়নি তাই বিক্রি করে দিয়েছিল। আবার একদিন শুনি মিলিটারি আমতলা জ্বালাতে জ্বালাতে শ্রীনগরের দিকে আসছে, শ্রীনগরও জ্বালাবে।

তখন ওদেরকে বাঁচাতে কেরাই নৌকা আনতে গেলাম। এদিকে তারা আমার জন্য অপেক্ষা না করে বোনের জামাইয়ের এক ভাই ছিল শ্রীনগরের ভেতরে সুবোইধ্যা, ওখানে চলে গেল। আমি ফিরে এসে ওদের পাই না। আমার কাছে টাকা নেই। নৌকাওয়ালাকে কী দিব এখন। তখন নৌকাওয়ালাকে ৪-৫ আটি পাটখড়ি হমড়াইল আর কিছু চলা/লাঠি দিয়ে দিয়েছি। বললাম যে যাদের জন্য এনেছিলাম

তারা চলে গিয়েছে। নৌকাওয়ালা চলে গেলেন। আরেকজনের থেকে শুনলাম ওরা না কি শামসুদ্দি হয়ে ভাগ্যকুল গেছে। তখন আষাঢ়ে নতুন পানি এসেছিল। ভাগ্যকুলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। কোনো জায়গায় অল্প পানি, কোনো জায়গায় কোমর পানি। এরকম ছিল ভাগ্যকুল। সেখানে গিয়ে শুনে ওরা ওখানে যায়নি। তখন ওখান থেকে ফিরে আসি। এসে শুনি ওরা গিয়েছে ওদের ভাইয়ের বাসায়। ওর আবার এক চাচাতো ভাই আসছে, বোনের এক দেওর হয় এসে আবার আমারে নিয়ে গেছে ওদের বাসায়। তালতলী জ্বালানোর পর শ্রীনগর আর আসেনি মিলিটারি। আবার ফেরত আসে সবাই শ্রীনগরে। আসার পর আবার দুই থেকে তিন দিন থাকলাম। আরেকদিন শুনি কে জানি আসব। ওদেরকে অন্য বাড়িতে রেখে আমি আটার রুটি বানাচ্ছিলাম। ওরা জানত যে এটা মধুদা'র বাড়ি। যদি আসে তাই রাতে আঠার রুটি বানাচ্ছি। পুরা বাড়ি নিস্তব্ধ। রুটি বানাই আর চুলার আগুনের দিকে তাকাই।

ঝিঁঝি পোকা ডাকছে ঐদিকে। হিন্দু বাড়িতে এক গোয়াল-ঘরে ওদেরকে জায়গা দেই এবং রুটি বানিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে একদিন থেকে পরের দিন সকালে আবার চলে আসে মধুদা'র বাড়িতে। মুক্তিযোদ্ধাদের যখন ট্রেনিং হয় তখন মধুর ক্যান্টিন থেকে গুড়, পরোটা, ডিম, এগুলো মাথায় করে নিয়ে মসজিদের গেটের সামনে যে ট্রেনিং হচ্ছিল সেখানে নিয়ে যাই। এগুলো যুদ্ধের আগে করেছি। যুদ্ধ শুরু হয়নি তখনও। মধুদা'র ক্যান্টিনে এটা অর্ডার দিত। কোনোদিন ছোলা, পরোটা, কলা, ডিম এগুলো যতজনের নাম বলে যেত, ততজনের জন্য নিতাম। মসজিদের গেটটা দিয়ে পার হয়ে রেসকোর্স ময়দানে যখন ট্রেনিং আরম্ভ হয়, তখন ৩০ থেকে ৪০ জনের খাবার নিয়ে যাই চাভারি দিয়ে পোটলা বেঁধে।

বাচ্চু যে মাস থেকে যুদ্ধ লেগেছিল। আমরা প্রথমদিকে বেশিদিন ছিলাম না। যুদ্ধের ২-১ দিন ছিলাম। হয়তো আমরা একদিন দু'দিন পর থেকে যাওয়া শুরু করেছিলাম। রুটি বানিয়ে খাওয়াইছিলাম। তারপর ভাবল ভারত চলে গেল। ওদেরকে নিয়ে মধুদ'ার বড়ো মেয়ে, এক ছেলে (অনিমা দিদি), দুদুদা ওদের নিয়ে চললাম। ওর আর একটা বেয়াই ছিল। বোনের বড়ো ভাই। ওর ছোটো বোন টুলি। সে বলে আমার তো মেয়ে নাই ও আমার কাছে থাকব। আরেকদিন দেখতে গিয়েছি। এত ঝড়-তুফান। রাতে মসজিদে থেকেছি। সেখানে না কি জিন পরি আছে। গায়ে একটি লুঙ্গি গামছা পরে মসজিদের এক কোণে চুপ করে বসেছিলাম।

আমি ভয়ে চোখ খুলি না। আমি একা ছিলাম। পরে আমরা শ্রীনগরে গিয়েছি। শ্রীনগর থেকে তালতলা পর্যন্ত তার মাঝে আমার ভাই ব্রাদারদের সাথে দেখা হয়েছিল। ওরা তো আমাকে যেতে দিবে না। ওরা যাতে আমাকে না দেখতে পায় তাই আমি পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। ওদেরকে কে বাঁচায়?

এজন্য আমার বাবা-মা, চাচাতো ভাইদের সাথে দেখা করিনি। ওরা তো আমাকে যেতে দেবে না। ওরা বলে "তুই মুসলমান মানুষ হিন্দুদের সাথে যাবি?" এরকম মন্তব্য অনেকেই করতো। গুদারা পার হতে হয়েছিল। তখন পায়ে হাঁটা শুরু করেছিলাম। পাটের অনেক বড়ো বড়ো গোডাউন ছিল। এরপর পার হয়ে আমরা মদনগঞ্জ যাই। মদনগঞ্জ থেকে রিক্সা দিয়ে পার হয়ে উজানচর যাই। উজানচরে আমরা আবার দুই থেকে তিনদিন ছিলাম। শিববাড়ির ব্রজানন্দের সাথে দেখা হয়েছিল। তারা সুপারির ব্যবসা করতো।

বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সে বলল "আমার বাড়ি কেউ ধ্বংস করতে পারব না।" কিন্তু তার জায়গাসহ সবকিছু তছনছ করে ভেঙে নিয়েছিল। লুটতরাজ যারা করে তারা নিয়ে গেছে। আমি এগুলো তাকে বলেছিলাম। তখন আমরা ভাত খাইতাম। কাপড়ের মতো ঢিলা করে চুবিয়ে সিদ্ধ করে সরিষার তেল দিয়ে খেতাম, ভর্তা দিয়ে খেতাম। আমাদের সাথে কোনো পাতিল ছিল না। তারপর যখন রাস্তা পরিষ্কার, তখন নগদ মাটির হাড়ি কিনে আনতাম। বদি বাজার থেকে প্রতি মানুষ ১৫০ টাকা করে নিত। আমরা দুজন মুসলমান সেজে বললাম, আমরা যাব না। আমাদের সাথে মানুষ যারা আছে ওদের পরিবারের সব মানুষদের মেরে ফেলেছে। এগুলো বলেছিলাম পয়সা কম দেওয়ার জন্য। ওইপার গিয়ে রাস্তায় আমরা একটিন মুড়ি পাই। কারা জানি নিতে পারছিল না। আমার মাথায় একটি ব্যাগ। কাঁধে আরেকটি ব্যাগ। বাবুল ওরা ঠিকমতো হাঁটতে পারতো না। ওরা আমার কাঁধে ছিল। কাঁধে ঝুলে থাকত। ওইপার গিয়ে বড়ো বড়ো দুইটা কাঁঠাল কিনলাম। তা আমরা মুড়ি দিয়ে খাইতে শুরু করছি।

এ সময় এক মহিলা এসে বলে দাদা মুড়ির টিনটা আমার। তখন আমরা বেশি অর্ধেক মুড়ি রেখে বাকিগুলো দিয়ে দেই। বর্ডার পার হয়ে যাই সাথে অরুণের বেয়াই।

তারপর নেতাদের সাথে দেখা হয়। তাদের নাম মনে নাই। তখন ওরা যখন শুনল বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। বেশিরভাগ লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। যখন তারা বুঝতে পারল মধুদা'র পরিবার, তখন তারা অধিক গুরুত্ব দিলো। ওরে যদি রেখে যায় আমরা কাকে নিয়ে থাকব। ও আপনাদের সাথে যাবে। এখন আমার আফসোস হয়। যুদ্ধে যেতে পারিনি।

এখান থেকে ট্রাকে চলে গেছে আসামে। আগরতলা থেকে ট্রাকে করে একশ মাইল গেছি। ওইখান থেকে ভাগে ভাগে ট্রেনে গিয়েছি লামডিং-এ আমরা দুদিন নিরামিষ খেয়েছি। ঐখানে খাবার দিয়েছে। পিতলের বালতি ছিল। পিতলের বালতিতে লাউ, কুমড়া পাঁচ তরকারি দিয়ে নিরামিষ ভাত দিত। পেট ভরুক না ভরুক, এইভাবে খেয়ে আমরা আবার কলকাতা রওনা দিয়েছি। কলকাতা গিয়ে আমরা তার যে মেয়ে জামাই ছিলেন তার এক মামা ছিল বেলগুড়িয়া। নাম হলো বিধুভিষণ দে। সেখানে আমরা কিছুদিন রয়ে গেলাম। তার মামা ছিল কাপড়ের ব্যবসায়ী। তার তিনটা তিনতলা বাড়ি ছিল। তার মামার বাড়িতে রইলাম। তারপর তার দুই মাসি থাকত টালিগঞ্জে। তার বাড়ি চলে গেলাম। ঐখানে বেশ কিছুদিন থেকে গেলাম। মধুদা'র মেয়ের জামাই বলল "তুমি চাকর মানুষ। আমরাই খাটে বসি না। আমার মামার সাথে তুমি বসে একসাথে খাও।" এসব বলার পরে খুব কষ্ট লাগল। তখন আমার নিজের ১০০ টাকা ওদের কাছে ছিল। পরে আমাকে ১০০ টাকার যে নোট দিলো এটা পরে আর চলে না। পাকিস্তানি জিন্নাহর নোট। পরে ভাবলাম দেশে চলে যামু।

রানুর ছোটো বোন দুর্গা। ওরা রেশন পেতো। বড়ো বড়ো মুসুরির ডাল, আবার আঠার পোয়া-রুটি। ওরা যখন ধর্মের কথা বলল, তখন আমি বললাম আমার টাকা দিয়ে দাও। আমি চলে যাব। তখন ১০০ টাকা দিয়ে দিলো। তখন প্রতিভা দিদি বলল "তুই কই যাবি? যাইস না।" আমি বললাম, "আমি চলে যাব।" ওর মাসির বাড়ি টালিগঞ্জ এসে পড়লাম। ট্রামে চলতাম। ট্রামে চড়ে মাসির বাড়ি চলে গেলাম। মেসো বলল, "তুমি যাইও না। তুমি আমার সাথে থাকবে। আমার সাথে ব্যবসা করবা।" পরে ওর লগে থেকে গেলাম।

বাচ্চু: টালিগঞ্জ। তখন বলল "তোমার তো এখন আর থাকা চলে না।" আমার মামা, তার সাথে ফুটপাতে ব্যবসা করতাম। সবচেয়ে ভালো কমলা ছিল ৫০ টাকা সো। আমি কিনতাম আর বেচতাম। মধুদা'র পোলাপান বলত, "আমার মাসি

আমাদের জন্য খাবার রাখে না। তার জন্য খাবার রাখে।" তারা হিংসা করতো। তারপর দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

প্রশ্ন: তখন বিধুভূষণ দে'র বোনের যে মামা কাপড়ের দোকানদার, সে বলল, "তুমি ওদের নাও। তুমি নিতে পারো। ওদের শুধু খাওয়া-দাওয়া করাবে। ব্যবসা আমার।" তারপর দেশে নিয়ে আসি।

সদরঘাটের ওখানে কাঠের টার্মিনালে নেমে আমরা কলাভবনের সামনের দেলোয়ারের পানের দোকানে আসি। তখন এত এত দোকান ক্যাম্পাসে ছিল না। লাইব্রেরির কোনায় দুটি দোকান ছিল। আগের ছাত্ররা এই দোকানগুলোতে দুপুরের খাবার খাইত। দেলোয়ারের দোকানে আসার পরে ওখান থেকে আমাদেরকে পরামর্শ দিলো ইকবাল হলে যেতে। ইকবাল হলে তখন রব ভাই, মাখন ভাইরা ছিলেন। মাখন ভাইদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। তাদের ভালো-মন্দ আমরা দেখতাম। আমাদের ভালো-মন্দ তারা দেখত। ইকবাল হল থেকে আমাদেরকে বলল কেষ্ঠ দাস তাদের এক দাদু তারা তখন নীলক্ষেত কোয়ার্টারে থাকত। তার উপর থাকত বিহারিরা। বিহারিরা সরকারি চাকরি করত। তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। তখন সেখানে একটা বাসা খালি পড়েছিল। সেখানে কেষ্ট দাসের বাসায় এক-দুই দিন ছিলাম আমরা। তারপর বিহারিদের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে গোপাল, আমির হোসেনসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে চার তলায় তাদের ঘরের তালা ভেঙে আমরা সেখানে থাকার ব্যবস্থা করি। এখানে থাকার পর থেকে আমাদেরকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্রনেতারাও কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে অর্থ সহযোগিতা করেছিল।

একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে, মানুষজন টাকা-পয়সা দিলে সেগুলো মধুদা'র পরিবার আমার হাতে দিত না বা টাকা পয়সা কেউ দিচ্ছে এমন সময় আমাকে তারা সাথে রাখত না। আমি মধুদা'র পরিবারের সম্পদ, জিনিসপত্র, গণহত্যার দিনের পরে যখন বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করেছি বা বিক্রি করেছি, তখন সব কিছুর হিসাব-নিকাশ ঠিকঠাক করে রাখতাম। কেন মধুদা'র পরিবারের প্রতি আমার এত টান ছিল সে বিষয়ে আমার কাছে সঠিক কোনো উত্তর নেই।

আমরা সবাই মিলে নীলক্ষেত কোয়ার্টারে থাকা শুরু করলাম। এখন দোকান করব কি করে সেই চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। একদিন কলাভবনে এসে শুনি যে, এদিকে

একটি মিটিং আছে। ছাত্র ইউনিয়নের সেলিম ভাইয়ের সাথে তখন আমার দেখা হয়েছিল। সেলিম ভাই, মাহফুজা আপা, মালেকা আপা ইনাদের সাথে আমার ভালো খাতির ছিল। আমি তো আবার ছাত্রীদের কমনরুমে দোকানদারি করতাম। ক্যান্টিন থেকে খাবার এনে এখানে বেঁচতাম। বেঁচে আবার হিসেব করে টাকা হিসাব করে দিতাম যে কত টাকার খাবার আনছি আর কত টাকার বেঁচে ছিলাম। এই মিটিংয়ের আগে সেলিম ভাই আমাকে বলল যে, “কলাভবনের সামনের গেটে না বসে ঐ ভাঙ্গাটার মধ্যে গিয়া বস গা।” তখন আমি প্রতিভা দিদির কাছ থেকে এক টাকা না দুই টাকা আনছি। এনে কিছু চা পাতি, কিছু চিনি, একটা দুধের ডিব্বা কিনে আনছি। তখন এটা দুধের ডিব্বার দাম ১৮ আনা বা তারও কম আছিল বোধহয়। এখন যে ক্যান্টিন সেখানে ইট দিয়ে চুলা বানিয়েছিলাম। আম গাছের ঠালা মরা ছিল, গোবরের ঘুইটা এগুলো দিয়ে খড়ির কাজ করে চুলা জ্বালাইছি। বিভিন্ন জায়গায় রাখা ক্যান্টিন-এর কাপ-প্লেট এগুলো সব সংগ্রহ করে আনছি। এনে ক্যান্টিন চালু করেছি ছোটো করে। দেখি অনেক মানুষ ক্যান্টিনে আসতেছে। সবাই বলছিল “মধুর ক্যান্টিন চালু হয়েছে। মধুর ক্যান্টিন চালু হয়েছে।” লোকজনের আগমন বা সাড়া দেখে মধুদা’র মেয়ে প্রতিভা রাণী তখন দোকানটি তুলে ধরল। পরে বিল্ডিংটা সংস্কার করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই।

মধুর ক্যান্টিন থেকে কমনরুমে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব নিলেন কবে?

১৯৭৫ সালে। তখন আমার নিজের একটি ভবিষ্যতে চিন্তা এসেছে যে, এদের পেছনে আর কত থাকব। আমারও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। মধুর ক্যান্টিনে কাজ করেছে এমন দুই-চার জন হয়তো চাকরি পায় নাই। বাকি সবাই ১৫ থেকে ২০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি করছে।

অন্যরা আগেই চাকরিতে ঢুকেছিল। কিন্তু তখন আমি নিজের স্বার্থটা এত বেশি বুঝতে পারি নাই যে আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। পরে বাদল ভাই আমাকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারের কাছে নিয়ে গেছে। ঐসময় আমি কমন-রুমে চেয়ার টেবিল সাজানো শুরু করেছি যে, চাকরি তো আমার হবে। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাড়িঘর ইত্যাদির বিষয়ে। পরে ট্রেজারের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছি। তখনকার চাকরিতে এখনকার সময়ের মতো কিছু ধাপ ছিল না।

আমার মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা আরেকটি বিয়ে করেছিল। যে কারণে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে এসেছিলাম আমি। আমি ১৯৭৬ সালে বিয়ে করেছিলাম। যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৬ থেকে ১৭ বছর। যে কারণে দুই মণ চালের বস্তা বহন করার শক্তি রাখতাম। এখন আমার এক ছেলে আছে। সে এখন আউটসোর্সিং-এর কাজ করে। চাকরি করার সময় আমি শিববাড়িতে কোয়ার্টারে ছিলাম। ছেলেটির চাকরি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারি নাই। স্বাধীনতার পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অবস্থান নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য রুটি তৈরির কাজও করেছি।

৪। রাজকুমারী দেবী, (স্থান জগন্নাথ হল, তারিখঃ ২০/০৯/১৯৯৭। দুপুর ১:৩৮)

প্রশ্নকর্তাঃ যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন?

রাজকুমারী দেবীঃ জগন্নাথ হলে।

প্রশ্নকর্তাঃ কী দেখছেন বলে যান।

রাজকুমারী দেবীঃ জগন্নাথ হলে আমি- ওর বাবা দেরি করে আসলো।

প্রশ্নকর্তাঃ উনার নাম কী ছিল? উনি কী করতেন?

রাজকুমারী দেবীঃ উনি অফিসে চাকরি করতেন, মধুদা'র ক্যান্টিনে।

প্রশ্নকর্তাঃ বলে যান।

রাজকুমারী দেবীঃ আমি বললাম, "তুমি এত দেরি করে আসলা, বাজার-টাজার তো করলা না, দেশে তো খুব হাউকাউ আছে।" আর বলো না, মধুদা'র সাথে দেখা হয়ে গেল। দুই থেকে চার কথা হতে হতে একটু দেরি হয়ে গেছে, তো মধুদাও বাড়িতে গেলেন, আমিও এদিকে আসলাম। আমি বললাম, এবার আর যাবা-টাবা না, না? কেন আলু সিদ্ধ কর, আলু সিদ্ধ আর ভাত আমরা খাইতেও পারি নাই, রান্না করে যেই আমরা খাইতে যাইতেছি একটা বোমার শব্দ পাওয়া যায় এখানে।

প্রশ্নকর্তাঃ ২৫ তারিখের রাতে?

রাজকুমারী দেবী: ২৫ তারিখের রাত। বাচ্চা তিন, দুই ছেলে আমার আর মেয়েটা ছোটো, কোলে ছিল।

প্রশ্নকর্তা: দুই ছেলের বয়স কত?

রাজকুমারী দেবী: বড়ো ছেলের বয়স ছিল ১২ আর ছোটো ছেলের বয়স ছিল নয়বছর। আর মেয়েটার বয়স তিন বছর। আমি বললাম যে, "এটা কি বোমের শব্দ ছিল? তখন গড়গড় করে কি?" ওর বাবা কয়, "চুপ করো" গড়গড় করে কি? এই কথা কওয়ার লগে লগে মনে হয় আমাগোর হাত থেকে থাল-বাসন উড়ে যায় বাতাসের মতন আর অন্ধকার হয়ে গেল নিমিষে, শব্দ নাই। এই শব্দের পর শব্দ, শব্দের পর শব্দ। ওর বাবা বলল, "আরি! এত এক যুদ্ধের মতন দেখা যায়। বাচ্চা নামাও, বাচ্চা নামাও।" বাচ্চা চৌকির উপর ছিল। তিনটা বাচ্চা নিয়ে আমরা না আর আমার শাশুড়ি ছিলেন। পরে কয় মাটিতে শুয়ে পড়, মাটিতে শুয়ে পড়। কিন্তু মাটিতে এতটুকু বাচ্চা নিয়ে ভিতরে যাইতা শুয়ে আছি। কিন্তু বুক আর দেওয়ার মতো কিছু নাই। মাটিতে থাকতে চায় না বুক। মাটি ধরতে চায় না। বাচ্চাগুলি কয়, "মা আমরা উড়ে যাইতেছি।" আমি কই, চুপ কর। প্রশ্নকর্তা: আপনারা ঘরের ভিতরেই?

রাজকুমারী দেবী: ঘরের ভেতরে আমরা। বাইর হতে পারি নাই। হেরা বাইর হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাইর হইতে পারি নাই।

প্রশ্নকর্তা: ঘরটা কোথায় ছিল?

রাজকুমারী দেবী: ঘরটা এই কোনায় ছিল। যে কোনার কথা উনি বলছেন, সে কোনায় আমাদের বাসা ছিল।

প্রশ্নকর্তা: এখনকার গ্যালারি পেছনে?

রাজকুমারী দেবী: হ্যাঁ, এখনকার গ্যালারির পেছনে। গ্যালারি তো ছিলই না। এই মন্দিরও ছিল না। তখন ওর বাবা কয়, "কথা বলবা না।" আমি খুব ভয় পাইতাছিলাম। আমার চেয়ে উনি ভয় পান কেন জানি। আমি কই কি হইতাছে এটা বলতে পারো না? কয় বলব কী, আমি কী জানি? তখন অনেকক্ষণ পরে গুলি বারুদের উপর দিয়াই আমাদেরকে বলতাছে, "দরজা খুলো, না হলে ভেঙে ফেলব। আর খারাপ খারাপ বকা দিতাছে।

প্রশ্নকর্তা: কী ধরনের গালিগালাজ করতো? মনে আছে?

রাজকুমারী দেবী: মাদারচোতরা দরজা খোলো, নাহলে দরজা ভেঙে খুলতে পারলে তোমাদেরকে বুঝাবো যে, তোমরা মাঠে প্যারেড করছিলা কি না? তখন আমরা কই, "এরে বাবা। এরা কী কয়?"

প্রশ্নকর্তা: আগে যে মাঠে প্যারেড হতো সেগুলো দেখেছিলেন?

রাজকুমারী দেবী: হ্যাঁ আমরা দেখতাম। কিন্তু ঐসব ঐসময়।

প্রশ্নকর্তা: ছাত্ররা প্যারেড করতো?

রাজকুমারী দেবী: না, ছাত্ররা প্যারেড করতো না। টিএসসি থেকে লোক আসতো। বাইরে থেকে লোক আসতো। আমরা বুঝতাম না তো, এসব কী। এখন না চালাক হইতে হইতে লোকে বুঝতে পারে। আগে তো মানুষ এত বুঝতো না। পরে ঢুকলো। ঢুইকা না- ওর বাবা ক্যান জানি ভয় পাইতাছে, মারবো দেখেই না কি? কই, তুমি তিনটা বাচ্চা নিয়ে দাঁড়ায় থাকবা চুপ কইরা। ওরা বলবো যা যা চুপ করে শুনবা, কথা বলবা না। আর উনি করছে কি, একটা আলমারি ছিল। আলমারির ভেতরে গেছে গিয়া পেছনে আলমারি ধাক্কা দেওয়াতেন ফাঁক হওয়ানে ব্যাস উনি ভেতরে গেছে গিয়া। আমার বাচ্চাগুলোরে বলছি, তোরা ওই আলমারি দিকে চাবি না। তাহলে ওরা সন্দেহ করব। তোর বাবা তো আলমারির ভেতরে। এখন কয় ওই তোমাগো পুরুষ কই, তোমাগো পুরুষ কই? ব্যাস আমার ভাসুর একটু বোকা টাইপের ছিলেন।

প্রশ্নকর্তা: উনার কী নাম ছিল?

রাজকুমারী দেবী: কয়, এই মাদারচত, যাও পিছনের মাঠে। পরে ভাসুরপুত্র ছোটো ছেলে ওরেও নিয়ে গেছে। আমাগোরে বলে, "এই পানিগুলিতে কী দিছো? খাওয়ার পানি আছে? এই পানিতে কী দিছো?" আমি বলি, কী দিব? কী দেওয়ার আছে? কয়, এর মতো বিষ দাও নাই তো? আমি বলি, কার জন্য বিষ দিব? কয়, আইচ্ছা এদিক আস। তারপর এইখানে বন্দুক ধরল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বুকে বন্দুক ধরল?

রাজকুমারী দেবী: বুকে ধরল একটা, পিছনে ধরল। তিনটা মিলিটারি বলে, “চলো আমার সঙ্গে।” আমি না বুদ্ধি কইরা বাচ্চা তিনটারে ধরলাম। নিয়ে যাইতাছে তিনটা বাচ্চারে একেকটারে কাপড় নিয়া যাকগা। ওর বাবা তো কথাও কয় না ভিতরে। তখন কী মনে করল ও ঘরের থেইকা নিচে নামাইয়া উঠানে আনল।

উঠানে নামাইয়া কয়কি, “যাও মাদারচোতকা বাচ্চা লোগ, আন্দার চলে যাও। আবার আসতেছি আমরা।” তখন যদি উনি বইলা থাকে যে, যাও গা তোমরা ভেতরে, আমি আবার আসতেছি, আমার জানি ভেতরে কেমন একটা ভয় করল। এবার আমি থাকতে পারতাছি না। পাও দুইটা কাঁপে আর শরীর কাঁপে। তখন বাচ্চা আমার সঙ্গে আছে কি না আমার হুশ নাই। আমি বাচ্চাদেরকে বলছি হুশ থাকতে যে তোরা আমার কাপড় ছাড়িস না। আমার কিন্তু কিরকম খারাপ লাগে। কাপড় ছাড়বি না। তখন বাচ্চার তিনটা ঐ পিচ্চিটারে আমি কোলে নিয়া নিলাম, মেয়েটারে, আর দুই ছেলে দুইপাশ ধরলো এমনি করে। এবার আমি এক ঘর থাইকা আরেক ঘরে যাই। আরেক ঘরে ঢুকে আরেক ঘরে যাই। অনেকগুলি ঘর তো। আমি কোনখানে যাই? সবার তো এক গতি। তখন আমরা সব মহিলারা বুদ্ধি করে করলাম কি, এখানে একটা বুদ্ধ নাম করে একটা সুইপার ছিল। উনি কইলো “তোমরা সব মহিলারা একখানে হও। এক কাজ করব।”

প্রশ্নকর্তা: এটা কয়টার দিকে? রাত্রের বেলায়?

রাজকুমারী দেবী: হ্যাঁ, রাত্রে। প্রায় তখন একটা কি দুইটা। এত কি হুঁশ থাকে, অন্ধকারেই। লাইট ওরা ভাইঙ্গা ফালাইছে। কিন্তু পরে কয় তোমরা সব মহিলারা এখানে বইসা পড়। যা হইবার একটাই তো উপায় আছে যে মরা নাহলে......। কয়, “ওই মাদারচতরা, তোমাগো মুজিবরে উল্টাইয়া দিয়া আসছি, তোমাগো মুজিব বাপ লাগে, উল্টাইয়া দিয়া আসছি কিন্তু।”

আমরা তো বলি নাই উল্টাইয়া দিয়ে আসো আর নাই দিয়ে আসো। পরে আমরা বইসা আছি। তারপরে এপথে ওপথে আইসা পরলো আরেক দল। আইসা না, কিছু কয় না। খালি ঘুরতাছে। আসপাশ দিয়া দেখে। অনেকগুলো লোক জমা হয়ে গেছে। অনেক প্রায় শয়ের মতো হয়ে গেছে। মেয়েলোক, বাচ্চা, ২/১ জন পুরুষ।

প্রশ্নকর্তা: পুরুষ আছেনি?

রাজকুমারী দেবী: তখন ছিল। পুরুষ তো মারল ভোরের দিকে। ওর বাবা কিন্তু আর বাইর হয় না। ঐ ভেতরেই আছে। ব্যাস শুরু করল ওই কোনার থেকে আগুন দেয়া শুরু করল। ঐ কোনার থেকে কি জানি একটা পাউডারের মতো একটা মারে নিজে নিজে আগুন ধরে যায়। তারপর সুধীর বাবুর ছোট্ট একটা ক্যান্টিন ছিল ঐ ক্যান্টিনে দিলো আগুন। তারপর তখন আমরা কইলাম, "আহহা! আরতো বাঁচার উপায় নাই। তোর বাবারেও বাইর হইতে হইবো। ঘরে তো আগুন দেয়।" তখন ওর বাবা করল কি আইসা না দাঁড়াইয়া গেছে। তখন আমি বললাম যে, "ভোর হয়ে আইতাছে। তো তুমি এক কাজ করো না বাথরুম এখনো আছে, বললাম যে বাথরুমে তিন থেকে চারজন লোক দেখা যায় চালের উপর উঠছে। তুমি পারো না চালের উপর উঠতে?" কয়, "না আমি তো পারি না। আমার শরীর কাপে।" আর স্বাস্থ্যবান ছিলেন উনি। কয় আমার শরীর কাঁপে। তাহলে এক কাজ করো তুমি বাথরুমে একটা পট নিয়ে বইসা থাকো। ছিটকিরি মাইরা দাও, আমরা আশেপাশে থাকি। কিছু হলে বলুম। উনি ঢুকলেন বদলা নিয়ে, কলও আছে ভেতরে। কিন্তু বদনাটা রাইখা বললেন, নাহ, বাথরুমে বসা যায় না। ভালোও লাগে না। তোমাদের এখানে দাঁড়াই। তখন ভোর হইয়া আসতেছে।

একজন আরেকজনকে দেখতে পায় আর কি এমন ভোর হইয়া আসতাছে। তখন চোখ মেলে দেখি যে, এই এসেম্বলির কাছে লাশ, এই জায়গায় লাশ, ক্যান্টিন ছিল আগের ব্যাংকের কাছে ওখানে লাশ। মাঠে লাশ।

প্রশ্নকর্তা: রাতে বুঝেন নাই?

রাজকুমারী দেবী: রাতে বুঝতে পারতাছি না। তখন ওরা করলো কি, এদিক থাইকা কতগুলো ছেলে ধইরা শংকর, শিবু আরো অনেক ছেলে ধইরা পরে এদিক দিয়া নিয়ে আসলো। ব্যাস আইয়াই করলো কি আমার ছেলের বাবার ঘাড়ে হাত দিয়া থাপ্পড় দিয়া বলল "মাদারচোত আযাও।" তখন আমি বললাম যে, এই কই নিয়া যায়। কই নিয়া যায় তোমারে? কয় চুপ করো তো। তুমি বেশি কথা কও। তাই আমি কিছু কই না। আনতে আনতে করল কি এই জায়গায় আনলো। আইনাই দেখি কি লাশগুলি টোকানো ধরছে, কয় মারতাছে ওরা, পারে না লাশ তুলতে। কারণ রক্তে ভিজা, আমাদের লোকরেই বাড়ি দেয়।

বন্দুকটা উল্টায় বাড়ি দিতেছে, এটাও আমরা দেখতাছি। লাশ আনল। আইনা এখানে লাইন করল। শুয়াইতেই আছে মূর্তির মতো। শুয়াইতে আছে, শুয়াইতেই আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ কীরকমের কত লাশ হবে?

রাজকুমারী দেবীঃ আমার চোখে তো ভাসে শত শত। তখনও আমার স্বামী মরে নাই। আমি তো মনে করছি আমার স্বামী তো বাঁচাই আছে। লাশ ই-করার পর হয়তো ছাইড়া দিতে পারে। তখন মনে হয় শ-তিনেকের মতো। মধুদা'রে কিন্তু নিজের বাড়িতে মাইরা আমাদের লোকদের দিয়া টানাইয়া আনতাছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি সেটা দেখেছেন?

রাজকুমারী দেবীঃ আমি দাঁড়াইয়া দেখতাছি আর আস্তে আস্তে বলি ও বিন্দুর বাপ এদিকে চলে আসো না। লাশটা ই কার(?)

কয় "দেখতাছো" ইশারা করে।

প্রশ্নকর্তাঃ বিন্দুর বাপ কে?

রাজকুমারী দেবীঃ আমার ছেলের বাবা। এমনি ইশারা করে। মধুদা'রে আমাগো তিন থেকে চারজন শোয়াইলো তারমধ্যে।

প্রশ্নকর্তাঃ কারা কারা আনছিল মনে আছে?

রাজকুমারী দেবীঃ ঐ মিলিটারি ৬ জন লোক, লগে সাতজন লোক, লগে যেমন থাকে আর আমার বড়ো কর্তা, আরোও পাঁচ থেকে ছয়জন লোক। একটা লাশ তুলতে তখন অনেক ভয় লাগে, ওদের পায়ের উপর দিয়া। তারপরে অনেকক্ষণ পরে দেখি যে আনতে পারে না।

একটা বড়ো পুরান বাড়ি ছিল ঐ বাড়ি থাইকা হেচড়াইয়া নিয়ে আসতেছে। পইরা পইরা যায় লাশ। আবার বাড়ি দেয়। আবার তুলে। আনতে আনতে বেচারারা রাখল। তারপর দেখি যে আমাগো লোক মাঠ দিয়া ঐদিকে যায়। তারপরে আমি বলি, "আয় হায়। এইবার কই নিয়ে যায়।" আমরা সবাই বলতাছি, যাদের স্বামীদের ছাদের উপর তুললো।

প্রশ্নকর্তা: এই বিল্ডিংটার ছাদে?

রাজকুমারী দেবী: এই ছাদে তুলল। মন্দিরটার পাশে যে বিল্ডিংটা আছে? জগন্নাথ হল। ছেলেদের রাইখা মারছে যে, ওরা দৌড়াইয়া যাইয়া ঢুকল যে ট্যাংকির ভেতরে, জলের ভেতরে ওটার ভেতরেও মারছে কিন্তু।

প্রশ্নকর্তা: বুঝা গেল ক্যামনে?

রাজকুমারী দেবী: যখন আমাদের লোক নিয়া ছাদে তুলল, ছাদের থেকে যখন আমাদের লুকিয়ে ট্যাংকিরে বাইর করায়, ভিজা।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন?

রাজকুমারী দেবী: হ্যাঁ। আমরা দেখতে পাচ্ছি। তখন আমরার ভেতরে সাহস হয়ে গেছে। কিছুদূর আগাইয়া আসতেছি। কিন্তু আমাদেরকে আর মারে না। তখন দেখি যে উপর থেকে লাশ দেখা যাইতেছে। কয়, "ফেলো"। ওরা ফেলতেছে।

আচ্ছা এটা কি ছাদ থেকে নিচে একেবারে ফেলছিল?

হ্যাঁ। ওদেরকে বলে, 'ফেলো।' ওরা ফেলে, আবার নিচে আসে। আবার টানে। আবার এখানে শোয়ায়।

এরকম করতে করতে যখন লাশ পূর্ণ হয়ে গেছে তখন আমাদের লোক সবাইরে পায়ের নিচে দিয়া শেষ হয় ছিল উপরে যে লাশ পায়ের নিচ দিয়া, কয়, আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে যে এমনে নিয়া লাইন কর। তা আমরা দেখতে পাই। তখন আমাদের ভেতর একটা রাধব নাম কইয়া একটা ছেলে বুদ্ধুর ছেলে, ও কয়, "ব্যাস কর এত মার দিয়া।" তো মার দিয়া কি? মার দিয়া মারতাইছে শালা, মনে করে ওদেরকে মারে। তখন আমাদের লোককে আমাদের সামনে গুলি করল। গুলি করল ওরা সব লাশের উপরে লাশ হইয়া গেল। তখন ও (ওনার স্বামী) নড়ে।

প্রশ্নকর্তা: তখন ওদের মারা দেখে আপনারা কাঁদেননি?

রাজকুমারী দেবী: না, না। চিৎকার দিছি।... ওরি বাবারে, মারে, এত মাইরা ফেলতেছে রে সব লোক ....

প্রশ্নকর্তা: কীভাবে মারতো?

রাজকুমারী দেবী: গুলি কইরা। তিন কোনায় দাঁড়াইতো।

প্রশ্নকর্তা: কীভাবে দাঁড়াতো?

রাজকুমারী দেবী: এই কোনায় একটা, মধ্যে একটা। ঐ কোনায় একটা। তিনজন একসাথে গুলি করতো। পরে আর কিছু মিলিটারি দাঁড়ানো। পরে যখন ওদেরকে ফেলল লাশের উপরে, ওরা নড়াচড়া করে, তাজা শরীর তো, নড়াচড়া করে না?

তখন ফিইরা ওরা আবার গুলি করলো। সোজা লাশের উপরে দিয়া গুলি করতাছে, আমরা দেখতেছি। তখন ওরা যাওয়ার সময়, গাড়ি ওইখান দিয়া ছাইড়া দিছে। পরে আমার ভাসুর (ঐ যে বললাম বোকা) আর আমার কাকি-শাশুড়ি, মেয়ে একটা ডাকতাম কাকি, কয় "নড়াচড়া করে, চলো লাশ নিয়ে আসি গা।" তখন আমরাও বললাম "চলেন আমরাও যাই।" তখন ওরা আসলো লাশের কাছে। ও বলে "আমারে তুলো।"

প্রশ্নকর্তা: কাকে কে তুলে?

রাজকুমারী দেবী: তখন আমার স্বামীরে আমার ভাসুর কাঁধে আর পা-হাত রক্তে লাল। পিছলায়া পড়ে যাচ্ছে। লাশ বড়ো, পারে না ভাসুর। কাকি শাশুড়ি পারে না। নিজের শাশুড়িও পারে না। নিজের শাশুড়ি একটু রোগা ছিলেন।

প্রশ্নকর্তা: আপনিও ধরছিলেন?

রাজকুমারী দেবী: না। আমি আগে ছিলাম। আমারে আমার ভাসুর আছে কই তুমি আগে যাও। আমি আর ভাসুরের কথা মানি নাই। আমি একটা ঠ্যাং ধরে নিয়ে যাইতেছি। বাসায় যাইতে পারলে আবার হয়তো বাঁইচাও যাইতে পারে। নিয়া আর বাসায় যাইতে পারি নাই। একজনের বাড়ি কাছে এসে পড়লো সে জায়গাতে আমার স্বামীরে শোনানো হলো।

প্রশ্নকর্তা: বাড়িটা কোথায়?

রাজকুমারী দেবী: এই যে পাশে এখানেই। সুইপারের বাড়ি ছিল। মঞ্জুর বাড়ি। তখন ঐ জায়গাতেই রাখা হলো আমার স্বামীরে। তখন উনারে উনি খালি বলে আমারে, "তুমি এক কাজ করো আমারে একটু জল খাওয়াতে পারো।" আমি কইছি, হ্যাঁ, জল আছে। মঞ্জুদের বাসায় তো জল আছে। আমি করলাম কি, খালি

জল দিই। আর জল যাই কই? কিন্তু জল যাই কই আমিও বুঝি না আমার স্বামীও বোঝে না। আমার এই পর্যন্ত আগে রক্ত ভরলো।

প্রশ্নকর্তা: মানে গোড়ালি পর্যন্ত?

রাজকুমারী দেবী: হুম। তারপর এই পর্যন্ত। স্বামী কয় রক্ত আসে কই থাইকা? কিন্তু বুঝতে পারি না। এই পর্যন্ত যখন রক্ত হয়ে গেছে আমি কইছি রক্ত আসে কই থাইকা?

যে মঞ্জুদের বালিশ, একা আমি দিলাম দিয়া ঐটার উপর উঠলাম। মেয়ে তো আমারে ছাড়ে না। খালি কয়, "বাবারে ফেলে দিয়ে আসো মাগো।" তখন ওর বাবা কয়, "যাও মেয়েটারে নিয়া মার কাছে দিয়ে আসো।" তখন আমি বললাম যে, "মার কাছে দিতে গেলে তুমি এখানে একলা থাকবা।" তখন আমি হাত দিয়া দেখি যে এত বড়ো ভোগলা। পেছনে, এই জায়গা মাংস এত নড়বড় করে। দুই হাতের কনুইয়ের নিচে মাংস।

এই জায়গা দিয়া দিছে তো গুলিটা এই দিক দিয়ে বাইর হইছে(অন্য কণ্ঠ)।

প্রশ্নকর্তা: মানে কোমর দিয়ে? এই জায়গাতে গুলি দেওয়া হয়েছে না?

রাজকুমারী দেবী: ঐ যে বললাম- বুকের দিকে মারছে?

হুম, পিছনে এত বড়ো ভোগলা। তারপরে ভোগলার মতো মাংস নাই বলতে। হাতের মাংস দেখি ঝুলে। "এই দিয়ে শেষ না। আমার পাও খুলে দেখো?" লুঙ্গি সরায় দেখি পায়ের মাংস এত নাই। তখন আমি মনে করলাম, উনি তো আর বাঁচবো না।

প্রশ্নকর্তা: উরুর দিকে কোনো মাংস নাই?

রাজকুমারী দেবী: না। এই পাশে নাই। এই পাশে নাই। হাতে নাই। পেটে পিছনটা নাই। সামনের খুব ভালো দেখা যাচ্ছে, অথচ এত বড়ো বড়ো ছিদ্র তখন মেয়েটারে কয় "এত কান্নাকাটি করে, মায়ের কাছে দিয়ে আসো।" মায়ের কাছে দিয়া আমি আসতে না আসতে দেখি কি উনি শক্ত হয়ে গেছেন কেন জানি। কথাও নাই। ঐ যে জল খাওয়াও বলতেন, ঐ জল খাওয়া নাই।

৫। আলী আক্কাস ও আব্দুল জব্বার (স্থান: কমার্স ফ্যাকাল্টির পিছনে, তারিখ: ৭-৯-১৯৯৭, সময়: দুপুর ৩:১২)

আলী আক্কাস: আমারে তো মাইরা ফেলাইতে লইছিলো। হেসে কয় তোর মাইয়া গোর দে... আর মনে নাই। শনিবার নয়টার সময় আমার দেশে গেছিলাম। সদর ঢুইকা দেখি মাইয়া দুইটা কোলাকুলি কইরা পইড়া আছে। এখন গেটটা আছে যে সেখানে দেওয়াল ভাইঙ্গা সেখান দিয়া ইহা করছে।

প্রশ্নকর্তা: ঘটনাগুলো বলেন? কত তারিখে এটা ঘটেছিল?

আলী আক্কাস: এটা ২৫শে মার্চের পরে শুক্রবারে। আমি আসলাম, আমি এসে দেখলাম যে শুক্রবারে; আমি আসলাম অনেক কষ্ট কইরা, ও সময়ে একটু নীরব ছিল। আমার তখন গরু ছিল। গিয়ে দেখি গরুগুলো আছে। ঘরে গিয়া দেখি আমার মাইয়া দুটি কোলাকুলি কইরা মুরায়ে শুইয়া মরা হইয়া আছে।

প্রশ্নকর্তা: তাদের গায়ে কি পোশাক ছিল?

আলী আক্কাস: না, পোশাক ছিল। প্যান্ট পরা ছিল। কোলাকুলি করে এক কোণে শুয়ে আছে। মইরা গেছে। সেখানে নতুন মশারি টাঙানো ছিল। তারপর যেখানে ভাঙ্গসে, সেখানে গেলাম। সে সময় আমার তো একটা ছোট্ট বাচ্চা ছিল দেড় বছরের আর সাড়ে তিন বছরের একটা। তারপর দাওয়ায় গিয়া খালেকের দরজা ধাক্কা দিয়া দেখি খালেকের বউ কান্না কইরা কইতাছে, আমারে বাঁচান। তখন তার ছোটো বাচ্চাটা আমি কোলে লইলাম।

আমি বাচ্চাটা লইলাম তারপর শামসুন্নাহার হলের যে নতুন একটা ইয়াটা আছে সেখানে থাইয়া যে দুধের পট নিয়ে দুধ দোয়াইছি। কারণ তা নাহলে আমারাও বাঁচতাম না আর বাচ্চাটাও বাঁচতো না।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি তখন শামসুন নাহার হলের দারোয়ান ছিলেন?

আলী আক্কাস: না, আমি রোকেয়া হলে দারোয়ান ছিলাম। তখনও শামসুন্নাহার হলের কাজে চলছে। তারপর এখানে কইছিলাম থাকেন আপনি। তারপর হলে গেলাম। সেখানে জাহানারা আপা ছিল। হাউজ-টিউটর ছিল দুইজন, আরো মাইয়ারা ছিল সাতজন। তখন তিনতলা হয় নাই। তখন আমারে ফাইট করতে

হয়েছিল। তখন ফাইট না করলে আমারে মাইরা ফেলতো। পাকিস্তানি আর্মি গেছে-আসছে। আবারও শেষবার যখন তারা ঢুকছে দরজা ভাইঙ্গা, এখনো দক্ষিণ দিকের যে দরজাটা ভাইঙ্গা ঘরে ঢুকছিল তা ভাঙ্গাই আছে। আমাগোর এখানে মাতারিরা আছিলো তিনজন।

হাউজ টিউটর সামেরা আপা আছিল। জাহানারা আপা আছিলো সুপারিনটেনডেন্ট।

প্রশ্নকর্তা: ঘটনাটা তো ২৫শে মার্চে?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ছেলে-মেয়ে ছিল?

আলী আক্কাস: আমার তিন মাইয়া, দুই ছেলে আছিলো। আর আমার পরিবার আছিলো। আর একটা ছেলে আছিলো। ঐ ছেলে পাশের রুমে আছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার রুমটা কোথায় ছিল?

রুমটা ঐ শামসুন্নাহার হলের দক্ষিণ পাড়ে যে পুশকুনি আছিল, ঐ পুশকুনির দক্ষিণ পাড়ে ব্যাকটিরে সিঙ্গেল রুম দিছিল। যখন আমরা ট্রেনিং নিতাম ১০ থেকে ১৫ জন ছিলাম। তখন আমরা জোয়ান ছিলাম। তখন ঐ এখন গাড়ি চালায় উদুদ মিঞা সেও আছিলো। আমার পরিবার আমার রুমে আছিলো।

প্রশ্নকর্তা: যখন ট্রেনিং হচ্ছিল আপনি ট্রেনিং নিতেন?

আলী আক্কাস: আমি এক একদিন গেছিলাম। জগন্নাথ হলে, তারপর মধুদাকে দিনে ৯.০০ টার সময় মারছে। তাদের সব দিনের বেলায়।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনাদের কখন?

আলী আক্কাস: আমাদের রাত পৌনে একটায়। পঁচিশে মার্চের পরে।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তখন আপনার পরিবারের সঙ্গে ছিলেন?

আলী আক্কাস: না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিবারকে কীভাবে মারে দেখেছেন?

আলী আক্কাস: না, আমি দেখি নাই। গুলি করে মারছে। ঘরের থেকেই, মশারির বাইরে থেকে গুলি করে মারছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিবারের সবাই কোথায় ছিল?

আলী আক্কাস: সবাই, আমার পরিবারের, পরিবার দুইটা ছেলেও ঘরে ছিল।

প্রশ্নকর্তা: সবাইকে মেরে ফেলেছে?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ, সবাইকে মারছে।

প্রশ্নকর্তা: কী অবস্থায় লাশগুলো ছিল?

আলী আক্কাস: লাশগুলি.....দুইজন পোলাপান কোলাকুলি পইরা রইছিল

প্রশ্নকর্তা: ২৬শে মার্চের পরে কী দেখলেন?

আলী আক্কাস: ২৬শে মার্চে শুক্রবার আছিলো। আমার হারুন যে বাচ্চাটা সে আছিল। সে আমারে ধাবকা দিয়ে বললো আমারে বাঁচান। ২৭শে মার্চে, শনিবার দেশে গেলাম। মুন্সীগঞ্জে বাড়ি। ভাই ছিল সেখানে।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় কি মুন্সীগঞ্জেই ছিলেন?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ। দেশে গেছিলাম গা। আমার বাড়ি ছিল মতলব।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যাওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কী অবস্থা দেখেছেন? অর্থাৎ ২৫ এবং ২৬শে মার্চে?

আলী আক্কাস: তখন তো অনেক ঠাণ্ডা। কোনো সাড়া-শব্দ নাই। কোনো কথাবার্তা নাই। কোনো যোগাযোগ নাই।

প্রশ্নকর্তা: রাস্তাঘাটে লাশ পড়েছিল না?

আলী আক্কাস: লাশ পইড়া ছিল। এখানে পইড়া রয়েছে। ঐখানে পইড়া রইছে। আমরা তো আর সেই দিকে চাই না। আমরা বরাবর চইলা গ্যাছিগা।

প্রশ্নকর্তা: লাশগুলো কী অবস্থায় দেখেছেন?

আলী আক্কাস: লাশগুলো তো আগে মাইরা থুইছে। মাইরা থুইয়া পরে গাইরা দিছে। আমার পরিবারের সবাইরে তো গাইরা থুইছে। আমার পরিবারের লাশ তো শামসুন নাহার গেটের ঐদিকে গাইরা দিছিল। তারপর যখন লাশ উঠাইছিল, তখন শাড়ি পাওয়া গেছিল। আর একজনের ঘড়ি পাওয়া গেছিল। আমাদের একজনের স্টাফের ভাই আছিল দোকানদার, তার পরনে ঘড়ি আছিল। ঘড়িটা পাওয়া গেছিল। আবার হাতে চুড়ি আছিল মইনুদ্দিনের বউয়ের সেটাও পাওয়া গেছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তাহলে বাসায় গিয়ে আপনার ফ্যামিলির কারোর লাশ দেখেননি?

আলী আক্কাস: লাশ মানে আমার বাচ্চা দুইটার, ছোটো বাচ্চাটা আর মাঝারো মাইয়াটার।

প্রশ্নকর্তা: বাকিগুলো নিয়ে গেছিলো?

হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ছেলে-মেয়ে ছিল?

আলী আক্কাস: আমার দুই ছেলে, তিন মেয়ে আর পরিবার আর পাশের ঘরে আর একটা ছেলে আছিলো।

প্রশ্নকর্তা: তাদেরকে কীভাবে মেরেছে?

আলী আক্কাস: গুলি কইরা।

প্রশ্নকর্তা: মানে উনারা মশারির ভেতরে ছিল?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ, মশারির মধ্যে ছিল। নতুন মশারি ছিল। মশারি পুরাটা ছিইড়া গেছিল। শুধু মশারির এক কোনাটা আছিল। আর সব ছুইটা গেছিল।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে গুলি তো বাইরে থেকে করেছিল?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ, মানে বাইরে থেকেও না। দরজা থেকে গুলিটা করছিল। ভেতরে যাওয়া লাগে নাই। আমার মনে হয় দুইটা বাচ্চা বাইছা ছিল। কোলাকুলি হইয়া আছিন এক কোণে। পশ্চিম পাশ হইয়া। কয়েকজনের ভালোই বাঁইচা

রইছিল। মঈনুদ্দিনের পোলা মুহসিন, কইছে থাক ওরে মারিস না। তারপর বাচ্চাটাকে মারে নাই। পরে আমি শাশুড়ির কথায় শালিকে বিয়া করছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনার শাশুড়ি কোথায় ছিল?

দেশে ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনি যখন মুন্সীগঞ্জে যান তখন পথে কী দেখেন?

আলী আক্কাস: কত মানুষ সাহায্য করছে কত মানুষরে। আবার কত মানুষ মরা। অনেকদিন কিছু খাইতে পারি নাই এই দেইখা। তারপর মুন্সিগঞ্জে দেখলাম পথে আওয়ামী লীগের নেতারা বক্তৃতা দিতেছে।

প্রশ্নকর্তা: তারপর দুই মাস থেকে আবার ঢাকায় ফিরে আসলেন?

জি।

প্রশ্নকর্তা: তখনকার কী অবস্থা ছিল?

আলী আক্কাস: তখন রাস্তায় মুক্তিযোদ্ধাদের দেখছি। মিলিটারি আছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তখন কোথায় এসেছিলেন, এখানে তখন আবার জয়েন করেছিলেন?

আলী আক্কাস: হ্যাঁ। আমার সে অবস্থা হয়েছিল চাকরি ভালো লাগতো না। মাথা ঘুরাইত। চুপ মেরে বইসা থাকতাম।

প্রশ্নকর্তা: তখন আপনার বেতন কত ছিল?

আলী আক্কাস: ৬৭ টাকা। তারপর যুদ্ধের সময় ডাকাতি হইল।

প্রশ্নকর্তা: ডাকাতি কোথায় হলো?

ডাকাতি হলো রোকেয়া হলে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কবেকার ঘটনা?

এটা সেপ্টেম্বর মাসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাকাতি কারা করেছিল?

এটা তো কইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ তারপর?

আলী আক্কাসঃ আমার চোখ বাইন্ধা রইছিল। এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ সুপারিনটেনডেন্ট আছিন, জাহানারা আপা থাকতো। যা যা ভেতরে জিনিস আছিল সব লুইটা নিছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ধর্ষণের কি দৃশ্য দেখেছিলেন?

না, ধর্ষণ দেখি নাই। যুদ্ধের সময়ে আমি থাকতাম কলোনির ভেতরে প্রভোস্টের কাছে। তারপর আবার ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ গেছিলাম গা।

প্রশ্নকর্তাঃ এটা কোন মাসে?

এটা ডিসেম্বর মাসে।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন আপনি দেশে?

হ্যাঁ, তখন আমি মতলবে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি ঢাকায় আসছেন কবে?

ঢাকায় আসছি স্বাধীন হবার দু'একদিন পরেই।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে যখন স্বাধীনতা হয়, তখন আপনি মতলবে ছিলেন। কেমন লেগেছে?

ভালো লাগছে। ভালো লাগতো। এখনো আমার মাইয়াগোর কথা মনে পড়ে। আমার শরীর জ্বলে। সব কথা মনে পড়ে যায়।

আগের দিন রাতে তাদের কাপড়-চোপড় কিনে দিয়েছিলাম। তখন তাদের চলে যেতে কইছিলাম। আমি পরিবারকে বললাম আমি তো পুরান ঢাকার সব অলিগলি চিনি। তুমি তো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দৌড়াতে পারবা না। সে কইলো না, আপনারে ছাড়া যামু না। মরলে একসাথেই মরতে হইবো।

প্রশ্নকর্তা: ছেলেমেয়েদের বয়স কত ছিল?

বড়ো মেয়ের সাড়ে এগারো। মেঝোর সাড়ে তিন আর ছোটোটার দেড় বছর।

প্রশ্নকর্তা: জড়াজড়ি করে ছিল কারা?

ছোটোটা আর মাঝো মেয়ে দুইটা। একটার বয়স আছিল দেড় বছর আর সাড়ে তিন বছরেরটা।

প্রশ্নকর্তা: কার কী নাম ছিল?

ছোট মেয়ের নাম পারভিন, মাঝারো মেয়ের নাম হলো নুরুন্নাহার, এক বছরেরটার নাম হল রাশেদা। বড়ো ছেলে জাহাঙ্গীর আর ছোটো ছেলের নাম আছিল আলমগীর।

প্রশ্নকর্তা: দ্বিতীয় বিয়েটা কবে করেছিলেন, যুদ্ধের সময়ই?

যুদ্ধের সময় না। যুদ্ধের পরে। যে-সময় যুদ্ধ শেষ হইছে, আমার শ্বশুর বাড়ি গেছি তখন বিয়ে পড়ায় দিছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ছেলে-মেয়েদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তাদের লাশ নষ্ট হয় নাই?

শরীরে তেল ঠিক ঠিক ছিল। চেহারা বুঝা যায় না।

প্রশ্নকর্তা: কী অবস্থায় ছিল তাদের মৃতদেহ?

তাদের হাড্ডি হুড্ডি বাইর হইয়া গিছিল।

জব্বার মিয়া: আসলে মহিলার চুল খুব লম্বা ছিল এবং উনার ওয়াইফ খুব রূপসী ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার নাম?

আমার নাম আব্দুল জব্বার। আমি ডাকসুতে চাকরি করতাম। আমি ঢাকায় ছিলাম না। তবে আমি যখন ডাকসুতে চাকরি করতাম তখন তো ডাকসুর ভিপি ছিল আ.স.ম আব্দুর রব। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ৭০-এর শেষে যে আন্দোলন, যে যুদ্ধ, সে

সময় উনি ছিলেন ভিপি আর কুদ্দুস মাখন ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। মোশারফ সিদ্দিক ভাই ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি। শাহ আলম সিরাজ উনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যুদ্ধের সময় এখানে কোথায় ছিলেন?

আমি যুদ্ধের সময় ঠিক ঢাকায় ছিলাম না। ২৫শে মার্চের যে গণ্ডগোল হওয়ার কথাটা মানে এইটাই তখন আমাদের নেতৃবৃন্দরা জহুরুল হক হলে একত্রে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষণাবেক্ষণ রাখতেন। এখানে আমাদের কার্যক্রম চলত। এই হিসেবে ওনারা ২৫শে মার্চের রাত্রে ঠিক ৭:৩০টার সময় আবদুর রব ভাই বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে যাবা? না এককভাবে যাবা? তখন আমি বুঝতে পারি নাই এত বড়ো ঘটনা ঘটবে। আমাকে রব ভাই বলার পর আমি বললাম, রব ভাই এটা কী বললেন? আমি কোথায় যাব আর আপনারাই কোথায় যাবেন? বললেন আমরা নদীর ওপারে চলে যাব। তাহলে আমি আপনাদের সাথে চলে যাব। রব ভাই বললেন যে, ঢাকায় একটা বিরাট গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আমারা নদীর ওপাড়ে চলে যাব। এই কথা বলার পর আমরা মানে মিয়াজ ভাই, শাজাহান ভাই, কুদ্দুস ভাই এবং রব ভাই আমরা সবাই চলে গেলাম নদীর ওপার। নদীর ওপার জিঞ্জিরা, চুনকুট্টা নামে একটা গ্রাম আছে। এক মসজিদে রাতটা কাটালাম। তার পরদিন সকালে সবাই মিলে চা-নাস্তা, পানি খেয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কে কে ছিলেন?

শাজাহান সিরাজ ভাই, কুদ্দুস ভাই এবং গোলাম আলম সিদ্দিক ভাই, আ.স.ম আব্দুর রব।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর একবার কোথায় গিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে বলেন?

আমরা জহুরুল হক হল থেকে বেবি টেক্সি করে ইমামগঞ্জে গিয়ে নদী পার হয়ে জিন্‌জিরা (জিঞ্জিরা) বাজারের ওপর সাইডে একটা গ্রাম আছে চুনকুইট্টা, তো চুনকুইট্টাতে রাতে মসজিদে আমরা অবস্থান নিলাম। অবশ্য ঠিক মসজিদে না। সেখানে একজন ব্যবসায়িক লোক উনার নামটা আমার মনে নাই, উনার বাড়িতে রাত্রে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে উনার বাড়িতে ছিলাম। গোলাম কুদ্দুস ভাই,

শাহজাহান ভাই, সিরাজ ভাই আবার চলে গেলেন। আমাকে বললেন, আমরা সীমান্তের অপর পারে চলে যাব। জব্বার তুমি আমাদের সাথে যাবা কি না?

আমি রব ভাইকে বললাম, রব ভাই এই মুহূর্তে তো আমার যাওয়া সম্ভব না। যেহেতু আমার আব্বা আম্মা আছে তারা তো চিন্তা ভাবনা করবে। আমি এখন মুন্সীগঞ্জের চরে গিয়ে নদী পেরিয়ে তারপর আমার বাড়ি চলে গেলাম মতলব। আমিও মতলব থানার বাসিন্দা। আমার গ্রামের নাম বেলতী ঘুতরা। আমি দেশের বাড়িতে চলে গেলাম। দেশের বাড়ি গিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস আমি কিন্তু ঢাকা যাতায়াত করতাম। তখন সিগারেটের ব্যবসা করতাম। আর ঢাকার কিছু খবর, যোগাযোগ, মুক্তি বাহিনীর সাথে আমাদের ছিল।

এটি কীভাবে ছিল?

এটা ছিল যে, আমরা ঢাকায় যে সিগারেট নিয়ে যেতাম, সিগারেট নিয়ে গেলে আমরা নৌকাযোগে এখান থেকে নদী পার হয়ে মুন্সিগঞ্জ যেতাম। মুন্সিগঞ্জ থেকে আমরা নৌকা নিতাম। নৌকা নিয়া আমরা যেতাম। তখন নৌকাযোগে মুক্তিবাহিনীর সাথে আমাদের সাথে অনেক সময়ই পাশাপাশি দেখা হতো। তখন আমরা ওখান থেকে খবর নিতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সময় যুদ্ধ চলাকালীন সময় আসছিলাম।

সেই সময় কিভাবে খবরগুলো দিতেন কী লিখতেন?

মানে লেখতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুক জায়গায় একজনকে হত্যা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ রেজিস্টার বিল্ডিংয়ের মধ্যে আমার চোখে দেখাই পাঁচটা লাশ পরা অবস্থায় ছিল।

কীরকম অবস্থায় ছিল?

মানে চারটা ছিল পুরুষ। অন্য একটা ছিল মহিলা। মানে কাপড় পরা অবশ্য ছিল। সেখানে মানে শকুন, কাক, কুকুর এগুলো তাদের মাংসটা টাইনা টাইনা খাইতেছে। খুব দুর্গন্ধ হচ্ছে। তারপর দেখতে গেলাম যে পরিচিত কি না, আরকি চেহারা চেনা যায় কি না আর কাগজে আমরা সামান্য লিখে নিতাম আর পাক-বাহিনীরা কোথায় কোথায় অবস্থান করছে সব সদরঘাট টার্মিনালে যাত্রাবাড়ীর

চৌরাস্তায় বাসের থেকে নামায়েই করতো। এগুলো আমরা কাগজে লিখে সংগ্রহ করে নিতাম।

এখানে কোথায় কী ধরনের টর্চার বা কী ধরনের অত্যাচার করতো সেগুলো আমরা সংগ্রহ করতাম।

তখন কি যখন আপনাদের নৌকায় দেখা হতো খবরগুলো দিয়ে দিতেন?

হ্যাঁ। আর কিভাবে দিতেন খবর? আমাদের ছোট্ট একটা পরিচয় পত্র দিয়েছিল। ওরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ও যোগাযোগ রাখার জন্য উনাদেরকে আমরা এই কার্ড সরবরাহ করেছি। আমাদের যেমন আপনারা একটা নৌকায় আছেন। আমাদের একটা নৌকা থেকে আমাদের চার্জ করলো আমরা কী? তখন আমরা ঐ কার্ড শো করলেই বুঝতে পারতো যে হা ঠিক আছে। এই ধরনের যোগাযোগ আমরা রাখতাম।

আর কী করতেন?

আর তো সিগারেট নিয়ে ব্যবসা করতাম।

সিগারেটের মধ্য কোনো খবর লেখা থাকতো না?

না, সিগারেট নিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় বিক্রি করে আবার আমরা ঢাকায় চলে আসতাম। ঢাকায় আমরা মানে দু একদিন একবার থাকতাম। থাকতাম মৌলভীবাজার। সিগারেটের যে মালিক তার বাসায় অবস্থান নিতাম। আর একদিন ঘুরে ঘুরে আমরা খবর নিতাম।

খবরগুলো কি আপনারা দেখে দেখে জোগাড় করতেন?

জি, দেখে দেখে। যেখানে দেখেছি বাঙালি বেশি সেখানে গিয়ে জানতাম কোথায় কী ঘটছে বা অত্যাচার চলছে। সেই সমস্ত আমাদের দেওয়া যাবে কিনা। অনেক পরিচিত লোকজন তাদের কাছেও যেতাম। যেমন রায়বাজার থেকে খবর সংগ্রহ করেছি। রায়বাজারে এক হিন্দু সম্প্রদায়ের দারোগা আছিলো। ঐখানে আবার মুসলমান বিরাট একজন মাতব্বররা আছিলো পঞ্চায়েতি বিচারক। ওনার নাম হলো মোহাম্মদ ঈসমাইল। উনি বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। ওখান থেকে আমরা খবর পেতাম। কী কী খবর পেয়েছিলেন? হিন্দু সম্প্রদায়ের সুন্দরী মেয়েদের তারা

অপহরণ করেছিল। অনেকের বাড়ি-ঘর লুট করেছে। অনেককে ব্রাশ ফায়ার করে মারছে। এসব খবর আমরা পাইছি।

এসব ঘটনা কি আপনি দেখেছেন?

না। এই রায় বাজারের ঘটনা আমি দেখি নাই। কিন্তু ইসমাইল ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা খবরটা সংগ্রহ করতাম। তারপর মুন্সিগঞ্জ থেকে নৌকায় উঠতাম। তারপর নৌকা দেখলেই তারা আওগায় আসতো। দেখতো এই নৌকায় কে....

দূরের থেকে সিগন্যাল দিত যে আপনারা কারা? তারপর হয়তো আমরা বলতাম আমরা পাবলিক। কোথা থেকে? ঢাকা থেকে। তখন বলতো দাঁড়ান আপনাদের নৌকা চেক করা হবে। তারপর তারা আসতো। জিজ্ঞেস করতো যে আমাদের মাল লুটের কি না। তখন আমরা বলতাম, না, আমাদের মাল লুটের না। আমাদের ক্যাশম্যামো আছে। আপনারা কোথায় নিবেন? অমুক জায়গায়।

এই প্রশ্ন কারা করতো?

নৌকার লোকেরা।

তখন আমরা জিজ্ঞেস করতাম আপনারা কারা।

তখন তারা বলতো আমরা আপনাদের মতই। তখন বলতাম, না আপনারা বলেন আপনারা কারা?

কারণ আমরা মুক্তিযোদ্ধার সহমর্মিতা কামনা করি। আমরা কিছু খবরা-খবর সংগ্রহ নেই। যখন তারা বুঝতো তখন তারা বলতো আপনাদের পরিচয়পত্র দেন। তখন পরিচয়পত্র আমরা শো করতাম। মুক্তিযোদ্ধারা যে কার্ড দিত তা আমরা পকেটে রাখতাম। আর তারপর তা পকেট থেকে বাইর কইরা তা দেখাইতাম। তখন তারা বলতো ঠিক আছে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনাদের চেক করেনি?

হ্যাঁ, করেছে।

তখন কী করতেন?

পাকিস্তানি সৈন্যরা চেক করলে তো নৌকা চেক করছে।

তারা এভাবে সমস্ত বডিটা চেক করেছে।

আপনাদের যখন প্রশ্ন করতো, কী বলতেন?

আমরা বলছিলাম।

আপনাদের সাথে কয়জন ছিল?

আমরা সিগারেটের ব্যবসায় জড়িত ছিলাম চারজন। আমর বড়ো ভাই আছিল দেলোয়ার হোসেন। উনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। আর ছোটো ভাই ইন্টারমিডিয়েট পড়াতো এবং তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিল। আর আবার বড়ো ভাই সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাকরি করতেন। উনি এখান থেকে যুদ্ধ চলাকালে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা মেডিক্যালে থাকতেন। উনার নাম আব্দুর খালেক। উনি সর্বজন যোগাযোগে থাকতেন। মাল আনা-নেওয়া সবকিছু উনি রাখতেন।

এই কাজে আপনাদের কোনো ট্রেনিং দিয়েছিল?

না। আমাদের এই কাজে এমন কোনো ট্রেনিং দেয় নাই। তবে একজন মুক্তিযোদ্ধারাই, কমান্ডার উসমান গনি, উনি আমাদেরকে বলতো, আপনারা কোথাও যদি এমন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে যান, তা আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন ক্রোলিং জিনিসটা। যে ক্রোলিং জিনিসটা আছে এই জিনিসটার সব তিনি আমাদেরকে নিজে করায়েছে। এই দেখেন, আমার হাতে দাগ আছে দুইটা।

আমাদেরকে ঘটনাটা বলেন?

সেই ঘটনাটা হলো, যেদিন আসি, এটা হলো ২৬শে এপ্রিল আসি ঢাকায়। আসি আমার বড়ো ভাইয়ের কাছে। আইসা এইভাবে বেশ কিছুদিন মেডিক্যালে অবস্থান নিলাম। জুন মাসে হঠাৎ সিগারেটের ব্যবসা শুরু করলাম। করার পরে অগাস্ট কি সেপ্টেম্বরে পুরা ট্রেনিং রইলাম। উসমান গণির এক হিন্দু বন্ধু ছিল, উনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

আমাদের মুসলমান মেয়ে বিয়ে করে সেই আমাদেরকে আইসাই আমাদেরকে বলল, উনার একটা সেক্টর ছিল খিজিরপুরে। খিজিরপুর নৌকায়। ঐ সেক্টরে উনি

কমান্ডার। তা আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরত্ব না। মাইল দেড় মাইল হবে। তখন জঙ্গলে আমাদের ডাকল, বলল, তোমরা যুবকেরা কিছু আসো। বলল, "দেখো তোমরা যেহেতু ঢাকায় যাওয়া-আসা করতেছো, তোমরা যেকোনো সময় পাকবাহিনীদের সামনে পড়ে যাও বা দূরের থেকে দেখতেছো, তখন তাদের থেকে তোমাদের জান বাঁচানোর জন্য তোমরা কীভাবে বাঁচাবা?" হাঁটু এবং দুহাতের কনুই দিয়ে উনি নিজে দেখায়েছেন যে আমি যেভাবে করি তোমরা ঠিক সেভাবে করবা। এখন তারপর তোমরা একটা ভালো স্থানে আশ্রয় নিতে পারবা। এইভাবে আমি একবারেই এই সবগুলো শিখেছিলাম। এটা হলো ষাট মাইল বরাবর যখন তারা লুকায়েছিল। জাহাজে, মানে যাইতেছিল জলপথে তখন ফায়ার করতেছিল। তখন ক্রোলিং করে ইয়ে করে ইয়ে করেছি। এরকম দু-তিন আমরা করেছি। মানে ওরকম দুই তিন স্বর্ণ পাইছিলাম। ঐ জায়গা এমন একটা জায়গা যে ইটা, কতা ছড়িয়ে ছিল।

আপনারা কয়জন ছিলেন?

আমরা তিনজন ছিলাম। সিগারেট নিয়ে আইতাম যাইতাম আমরা তিনজন। আর এখান থেকে আমার বড়ো ভাই এগুলো সবকিছু সংগ্রহ করতো।

মালসুদ্ধ গিয়েছিলেন?

মাল ফেলে দিয়েছিলাম। তখন মাল ছিল না। জান বাঁচানো তো ফরজ। এভাবেই আমাদের দিন কেটেছে। ১৬ই ডিসেম্বরে আমাদের একটা বাজার আছে। বাজারের নাম নারায়ণপুর। তখন রাত্র ১১:০০ টার সময় বাইরে.... দুইটার সময় বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে শোনালো যে, বাংলাদেশ স্বাধীন। পাকিস্তান বাহিনী সেরেন্ডার। তারপর আমাদের সকলেই দেশের থ্যাইকা ঢাকায় এসে পড়লাম। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো।

কেমন লাগলো যখন শুনেছেন? তখন তো আনন্দ। এমন আনন্দ যে বাংলাদেশে মনে হয় যে, আবার নতুন করে জন্ম নিলাম আরকি।

কী করেছিলেন এসে?

আইসাই ঢাকার বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে দেখেছি। পুরান টাউনে কিছু চিকন চিকন গলিতে লাশ পড়া অবস্থায় ছিল। এগুলো কিছু নয়া ভান্ডারী, কিছু পাঞ্জাবি।

তাদের লাশ কী অবস্থায় দেখেছেন?

এগুলো মানে রক্তমাখা পড়ে আছে। কোনো লোকজন নাই। কেউ দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায়।

বাঙালিদের এখানে কোনো লাশ দেখেছেন?

এখানে তো রেজিস্টার বিল্ডিং-এর মাঠটায় তিনটা পুরুষ, একটা মেয়ের লাশ আমি দেখেছি।

আর অন্য কোনো লাশ দেখেননি?

আর অন্য কোনো লাশ আমার চোখে পড়েনি। তবে যেদিনকায় তারা মরে সেদিনকায় লাশগুলো টাইনা আর্মি একটা গর্ত করে মাটি-চাপা দিয়েছিলাম। সেটা মাঝে মাঝে আমরা দেখতে যাইতাম।

আচ্ছা আপনি তো ২৫শে মার্চ রাতে এখানে ছিলেন না?

না। ২৫শে মার্চে ছিলাম না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ঢাকায় আসছি মধুদা, নিশিনাথ বাবুকে যখন পাকবাহিনী মারলো, তখন উনাদেরকে জগন্নাথ হলে যে একটা ফাঁকা মাঠে মাটিচাপা দিয়েছিল সেটা দেখতে যেতাম। দেখতে কোনো মানা ছিল না। তখন আইন বা পুলিশ এমন কোনোই ছিল না। আর তখন যদি তাদের সাথে দেখা হয়ে যেত তখন তারা জিগাইতো তোমরা কি বাঙালি? হিন্দু না মুসলিম? এটা জিগাইতো উর্দুতে। তো আমরা উর্দুতে বলতাম আমরা মুসলিম।

এটি কি স্বাধীনতার পরে?

না। এটা যুদ্ধ চলাকালীন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সেখানে যেতে দিতো?

হ্যাঁ। আমরা সিগারেটের জন্য আসতাম। আর সামনে পড়ে যেতাম। পড়ে গেলে আমরা যেমন দাড়ি রেখে দিছি। তখন দাড়ি রাখছিলাম। আমরা ঐ রকম ছিলাম।

আচ্ছা, তখন লাশগুলো এখানে কেমন অবস্থায় দেখেছেন?

মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমধ্যে বসতাম। দেখতাম। মেডিক্যালে আছিলাম। মাঝেমধ্যে ওসমান তারপর সামাদ মিঞা ওদের সাথে যেতাম। ওরা কিছু তখন ভার্সিটির স্টাফ আছিল। ওরা মাইজভান্ডারি।

ওরা কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতো?

হ্যাঁ। আমাদের অনেক সময় সাহায্য করতো। বলতো ভাই পাকবাহিনীরা আসবে। তোমাদের দেখলে হয়তো গাড়িতে উঠায় নিয়ে যেতে পারে। অথবা তারা ফায়ার করতে পারে। তোমরা একটু সাবধানে থেকো। আমাদের সামনে যদি তোমাদের গুলি করে মেরে ফেলে তাহলে কি আমরা আর বেঁচে থাকতে পারি। এ ধরনের কথাবার্তা বলতো।

তারা কি আপনাদের আশ্রয় দিয়েছিল? মানে কোনো দরকার হলে?

না। কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হইলো তখন স্বাধীনতার পরে ওসমান ও সামাদ তাদেরকে রাজাকার বলে আখ্যায়িত করেছিল।

তারা কি রাজাকার ছিলেন না?

না। তখন আমরা যে আসা-যাওয়ার ভূমিকা দেখেছি সেখানে তাদেরকে আমরা কোনো সময় এ ধরনের দেখি নাই। তারা অনেক সময় আমাদেরকে সাহায্য করেছে। এবং দেশ স্বাধীনের পর তাদের উপর যে নির্যাতন করেছে সেখানে কিন্তু আমরা তার প্রতিবাদ করেছি।

তারপর তাদের কি মেরে ফেলেছে?

না।

তারা কি বেঁচে আছে?

না। তারা মারা গেছে। সামাদ ভাই মারা গেছে।

অপরপিট না। এগুলো আমাদের চোখে পড়ে নাই। আর এগুলো আমরা দেখি নাই। আমরা মেইন টাউনে এবং সূত্রাপুর, রায়বাজার এ সমস্ত বাজারে যাওয়া-আসা করতাম। এই ধরনের কোনো অপকাণ্ড কাজ চোখে পরেনি। এখন তো একাত্তরের

অনেক কথা ভুলে গেছি। এখন তো মনে পরে না। আবার অনেক সময় হঠাৎ করেই মনে উঠে যায়। এই ধরনের আরকি। অনেক সময় সবই মনে উঠে যায়।

৭ ও ৮। মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন (পিতা: শহিদ আহাম্মদ আলী ফরাজী) ও দিলীপ কুমার দাস (পিতা: শহিদ সুনীল চন্দ্র দাস) (স্থান: কারাস ভবন, তারিখ: ৫/১১/২০২৩, সময়: সকাল ১১:০০ টা)

সাক্ষাৎকার: মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অবদান।

প্রশ্ন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কাজ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা জানি, ছাত্রদের কথা জানি, কিন্তু কর্মচারী, তাদের কথা এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণায় দেখিনি। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লেখা হয়েছে। ছাত্র অবস্থায় ক্যাসেট, অডিও, রেকর্ড প্রায়ই সব হারিয়ে গিয়েছে। আমরা সাজিয়ে-গুছিয়ে করার চেষ্টা করছি। ভাগ্য ভালো এই ছেলে-মেয়েরা আগ্রহ নিয়ে কাজ শুরু করছে। কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার না। আমরা কতগুলো বিষয় জানতে চাইব।

মোশারফ: (বিভিন্ন তালিকা দিচ্ছেন)। ৯৬ সালে রোকেয়া হলে আগে আমাদের ক্রেস্ট দিয়েছিল। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৫১ জনের তালিকা। তৎকালীন প্রভোস্ট ৭১ সালের স্মরণিকা সংস্কারের কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম তালিকা প্রণয়ন করে তখন ১৫১ জন। পরে ১৯৩ জন হয়। তার পরিবারের তিন ভাই তিন বোন মা-সহ সাতজন। তার বাবা বেতন পেতো ১০০ টাকা। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে দিবাগত রাত ২৬শে মার্চ মারা যান রাত বারোটার পর। শহিদ পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরা কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে কিছু পায়নি। তারা অন্তত চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিক।

বাবার হাত ধরে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনছি।

বাবা আখতার ইমাম এর কাছে গেলে তারা বাবা বলল "ছেলেটা কান্নাকাটি করছে। আমারে ছুটি দেন।" আখতার ইমাম বলেন আমরা যদি বেঁচে থাকি। মানুষের কাছে এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে কিছু একটা ঘটবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ঢাকা শহরের লোক কমা শুরু করে। ছাত্রছাত্রী কমা শুরু করে। মার্চের ভাষণের পর জগন্নাথ হল, ছাত্র , শিক্ষক, কর্মচারীর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল।

সকালবেলা তার বাবা নাস্তা খেয়ে বলল ম্যাডাম আমাদের ছুটি দেননি। তার ছেলেকে খালুর কাছে রেখে তিনি বলেন আমার কোনো আপত্তি নাই। আপনি ওকে নিয়ে যান। গ্যান্ডারিয়া রেলস্টেশন থেকে তিনি আবার ফিরে আসেন। তিনি একাই গ্রামের বাড়ি চলে যান। ২৫ তারিখ সকালবেলা গ্রামের বাড়ি যেতে সন্ধ্যা হয়। তখন তার মা অবাক হয়ে যায় যে, ঢাকা থেকে কীভাবে একা একা আসলো! তিনি বলেন, ম্যাডাম ছুটি দেয়নি। গ্রামের বাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়। ঢাকা থেকে একা কীভাবে আসলে। তিন ভাইবোন তার। ছোটো বোনের বয়স দেড় বছর। তার মা বলল , ঢাকার কী অবস্থা? সকালবেলা গোলাগুলির শব্দ। আমার চাচা আব্দুস সামাদকে মা বলেন "ওর বাবাকে ঢাকা রেখে আসছে। আপনি ঢাকার দিকে অগ্রসর হন।" তখন তার চাচার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তার চাচার সাথে ঢাকায় আসেন ২৬ তারিখ।

২৭ তারিখ স্টাফ কোয়ার্টারে এসে দেখি লাশ মাটিচাপা দেওয়া। কারো হাত-পা দেখা যায়, কারো চুল দেখা যায়, শরীরের রক্ত ফ্লোরে ছিল। এই অবস্থা দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তিনি তখন দেখেন নদীর পাড় দিয়ে মানুষ বের হচ্ছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে। ২৭ তারিখ সকালবেলা একটা লোক দৌড়াদৌড়ি করছে তিনি ঐ লোককে জিজ্ঞেস করলেন "আমার আব্বা কই?" তিনি বলেন, "উনাকে মেরে ফেলেছে।" তিনি এ বলে চলে যান। তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। তিনি তার বাবার দাফনের সুযোগের আশা করছিল। কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। তিনি ২৭ তারিখ সকালবেলা তার চাচাসহ গ্রামের বাড়িতে চলে যান। তখন রোকেয়া হলে ৪৫ জন কর্মচারী ছিলেন। তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলা হয়েছে। নমি রায়ের পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। মহসিনের মা-সহ নেছারউদ্দিন সবাইকে। লাশগুলোর মধ্যে তার বাবাকে তিনি চিহ্নিত করতে পারেননি।

প্রশ্ন: জগন্নাথ হলসহ অন্যান্য হলে গিয়েছিলেন কি না?

স্বাধীনতার পর রোকেয়া হল কর্তৃপক্ষ লাশগুলোর কঙ্কাল বের করে। জগন্নাথ হলে জিসিদেবকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। টিএসসিতেও অনেককে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। অনেকগুলো গর্ত করেছিল।

প্রশ্ন: যুদ্ধের সময় নয়মাসে আবার আপনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন কি না? ঐখানকার কী অবস্থা ছিল?

মোশারফ: বাড়িতে যখন যাই তখন আর্মিরা নদী পার হয়ে গ্রামের মাঝখানে ঢুকে। আমি আমার বড়ো ভাইসহ ঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে ছিলাম। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে। তারা মেঘনা নদী পার হয়ে যায়। যারা লোকাল মুক্তিযোদ্ধা তাদের ধরার জন্য আর্মিরা বাড়ি বাড়ি খুঁজছিল। কিন্তু পায়নি, তারা পানিতে লুকিয়ে ছিল। আর্মিরা তারপর চলে গেল। আমরা তখন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন খাবার পাঠাতাম।

প্রশ্ন: আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা কী ছিল?

মোশারফ: আমার আব্বা যাওয়ার সময় ষাট টাকা দিয়েছিল। মশারি, চাদর সাথে দিয়েছিল। কিছু জমি ছিল। যুদ্ধের পরবর্তীতে আশেপাশের মানুষের জীবিকা নির্বাহের সময় অন্যের জমিতে কাজ করা, ঘর মোছা করে দেয়া সবকিছুই আমরা করেছি।

প্রশ্ন: যুদ্ধের সময়?

মোশারফ: মানুষ মানুষকে সাহায্য করতো। টাকা থাকলে এক টাকা দিয়ে সাহায্য করতো।

প্রশ্ন: বিজয়ের খবর কখন পেলেন?

মোশারফ: যুদ্ধের সময় যারা আসা যাওয়ার মাঝে ছিল তাদের কাছ থেকে শুনেছি।

আব্দুল খালেক প্রাণে বেঁচে যায়। তনু মিয়া, তনু মিয়ার স্ত্রী, এক সন্তান আখতার ইমামের বাসায় চলে আসে। যারাই আখতার ইমামের বাসায় চলে এসেছিল, তারাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। যারা আসতে পারেননি তারাই মারা যায়। গিয়াসউদ্দিন ড্রামে ও খাটের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। পরদিন সকালবেলা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। আব্দুল মতিন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী প্রকৌশলী। পাশের গ্রামের একজন ঠিকাদার এখানে ছিলেন। স্বাধীনতার পর আমরা সামান্য পেনশনের ভাতা পেতাম।

প্রশ্ন: আপনাদের ভাই-বোন কে কোন অবস্থায় আছে?

মোশারফ: বর্তমান অবস্থান সর্বশেষ বোন মারা যায়। বড়ো ভাই বেকার। মা তার স্বামীর স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পাননি।

প্রশ্ন: আপনি যে শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতির কথা বললেন এ বিষয়ে কিছু বলুন।

মোশারফ: আমি এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কাগজগুলো হাতে পেয়েছি। আমি মানুষের ঘরে ঘরে গিয়েছি।

প্রশ্ন: সমিতির কার্যাবলি কী?

মোশারফ: এটি আসলে সবাইকে একত্রিত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই আশায় যে, পরবর্তীতে আমরা যদি কোনো দাবি-দাওয়া তাহলে যেন সবাইকে সাথে পাই।

প্রশ্ন: কোনো রুম পেয়েছিলেন?

মোশারফ: রুম চেয়েছি, কিন্তু পাইনি।

প্রশ্ন: এটির গঠন-কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারি, সদস্য কতজন আছে?

মোশারফ: সব মিলে ৭৬ জন। প্রতি ঘরে একজন হলে ৩২ জন।

প্রশ্ন: সেখানে শুধু কর্মচারী না সবাই?

মোশারফ: সবাই। আমরা যে তাদের ডাকব তারা কি আশায় আসবে? তারা একটি ফুল দেবে তাতেই শেষ। বিভিন্নজন বিভিন্ন জায়গায় থাকে। যদি আমাদের অন্তত একটি স্মারকলিপি দিতো তাহলে মনের ভেতর আত্মতৃপ্তি থাকতো।

প্রশ্ন: আমরা বিভিন্নজনের বাসায় যাব। যেমন নরসিংদী। আমরা আপনাদের বাসায় যাব।

মোশারফ: যেমন মোহসীন কোনো সাক্ষাৎকার দিতে চায় না। ঘরেও না বাইরেও না। গিয়াস উদ্দিন আমার আব্বার সাথে চাকরি করতেন। তিনি রোকেয়া হলের ২৫শে মার্চ ঘটনার সাক্ষী। তার রোকেয়া হলের সাক্ষাৎকার আছে। গিয়াসউদ্দিনের ছেলে বর্তমানে লিফটম্যান।

প্রশ্নকর্তা: কতগুলো কমিটি হয়েছে?

মোশারফ: এ পর্যন্ত তিনটি কমিটি ছিল। ১৯৮৯ থেকে আরম্ভ।

প্রশ্ন: আপনার কি মনে আছে কারা কারা কমিটিতে আছে?

মোশারফ: অনেকে মারা গেছে। মাসুদ মারা গেছে। মনিরুজ্জামান মরে গেছে। পত্রিকায় শহিদ পরিবার সংগ্রাম পরিষদ এসেছে।

প্রশ্ন: যুদ্ধের সময় অবস্থা কেমন ছিল?

দিলীপ: ১৯৭১ সালে আমার বাবা যখন শহিদ হন পাকবাহিনীর হাতে, তখন আমরা এক ভাই, এক বোন ছিলাম। আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। আমাদের বাসা ছিল জগন্নাথ হলের দিকে। আমার বাবা নাইট ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ডিউটিরত অবস্থায় ছিল। এর পাশে ছিল অ্যাসেম্বলি হল। প্রথমত পাকবাহিনী ঢুকেছে জগন্নাথ হলের পূর্ব দিকের ওয়াল ভেঙে। মেইন গেট দিয়ে ঢুকে যাকে চোখের সামনে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। যে যে লাশগুলো এলোপাতাড়ি ছিল, এই লাশগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসে। জগন্নাথ হলে মাঠের উত্তর পাশে যারা জীবিত ছিল তাদের ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলেছিল। উত্তর পাশে মাঠের কোনায় এনে বসিয়ে রাখে। মা বলল, ২৬ তারিখ সকালবেলা ঢাকা মেড্যিকল কলেজে চলে যায়। ঢাকা মেডিকেল হয়ে জিঞ্জিরায় এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ঐ বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর আমাদের অনেক কথা হয়। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। সেখানে থেকে আমাদেরকে ২০ কি.মি হেঁটে যেতে হয়। অনেকদিন আমরা না খেয়ে ছিলাম। কারো বাড়িতে গিয়ে চিড়া মুড়ি চেয়ে খেতে হয়েছে। আমরা ছয় মাস এরকম ছিলাম। তারা তিন মাস সাহায্য করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাড়ি ফিরে আসি। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলেছিল। আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চলার কোনো পথ ছিল না। জায়গা-জমি ছিল না। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে সাহায্য নিয়ে খেতে হয়েছে। তখন বঙ্গবন্ধু ২০০০ টাকা দিয়েছিল। বাবা চাকরিরসূত্রে ৫০ টাকা দিতো প্রতি মাসে। চাকরি হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐটা দিয়েই চলতে হতো। ১৯৮৮ সালে চাকরি হয়। তখন বেতন ছিল ৫২০ টাকা। এর চেয়ে বেশি বলতে পারি না। আমি মার কাছ থেকে শুনেছি।

প্রশ্ন: বিজয় যখন লাভ করি আমরা তখনকার মুহূর্তের কথা বলুন?

মোশারফ: তখন একদিকে আনন্দ। অন্যদিকে অশ্রু। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। পাকবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেল। বাবা আজ বেঁচে থাকলে হয়তো খুব খুশি হতেন।

প্রশ্ন: আপনারা যে শহিদ পরিবারের সদস্য এই হিসেবে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কী?

মোশারফ: ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার বাবা জীবন দিয়েছেন। সে হিসেবে গর্ব হয়। বলতে পারি আমার বাবা দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন।

প্রশ্ন: আপনার বাবার কোনো ছবি, স্মৃতিচিহ্ন আছে?

মোশারফ: ছবি ছিল। কিন্তু রতনলাল স্যারকে দিয়েছিলাম। পরে আর ফেরত পাইনি।

প্রশ্ন: আপনাকে চাকরি দিয়েছিল শহিদ পরিবার হিসেবে?

মোশারফ: তখন আমি গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিতাম। সাথে ব্যাগ নিয়ে যেতাম। মুক্তির দিন হাতে পতাকা ছিল। পতাকা নিয়ে দৌড় দিয়েছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। গর্ব করে বলতে পারি আমি শহিদের সন্তান। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কি পেয়েছি না পেয়েছি এটা বড়ো বিষয় না। ৭২ সালে ঢাকায় আসছি।

দিলীপ: আমার ঢাকায় জন্ম। জিঞ্জিরা, মুন্সিগঞ্জ। ছয় মাস ধরে ঘোরাঘুরি করেছি। এইবারে ওই বাড়ি থেকেছি অনেক কষ্ট করেছেন আমার মা।

প্রশ্ন: ৭২ সালে ঢাকায় ফিরে এসে আপনারা কোথায় ছিলেন?

মোশারফ: আমরা শিববাড়ি ছিলাম। আওয়ামীলীগ সরকার আসার পর উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন সুযোগ সুবিধা পাইনি। অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হই। এ কারণে শহিদ পরিবার কল্যাণ সমিতি করার চেষ্টা করি। আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো সনদ দেয়নি।

৯ ও ১০। হাজী মিন্নত আলী এবং মুর্শিদা বেগম (পিতা ও স্বামী: শহীদ মোঃ হাফিজ উদ্দিন

(স্থান: কারাস ভবন ও ফোন, তারিখ: ৫/১১/২০২৩, সময়: সকাল ১১:০০ টা)

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সালে যোগদান করেছিলেন?

মিন্নত আলীঃ আমার বাবা ১৯৬৯ সালে যোগদান করেছিলেন।

প্রশ্নকর্তাঃ ওনার পরিবারসহ আপনারা ঢাকায় থাকতেন?

মিন্নত আলীঃ না, আমি তো অনেক ছোটো। আমার বয়স তিন বছর হবে। আমার আম্মা দেশে থাকত। শুধু আমার বাবা থাকতো।

প্রশ্নকর্তাঃ ২৫শে মার্চ তখন উনি কোথায় ছিলেন?

মিন্নত আলীঃ আমি এতকিছু বলতে পারব না। আমি তখন বাড়িতে থাকতাম। মুরুব্বিদের মুখে, মামার মুখে যা শুনেছি। ২৫মার্চ রাতের কিছুদিন আগে আব্বা বাড়িতে আসছিলেন। বারবার আমার পরিবার না করছিলেন ঢাকায় না যাওয়ার জন্য যে দেশের পরিস্থিতি ভালো না। তারপরও আব্বা চলে গেলেন। এরপরে আর ফিরে আসলো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা কীভাবে খবর পেয়েছিলেন?

মিন্নতঃ আমরা খবর পেয়েছি আমার নানা থাকতো। মামার শ্বশুর উনি আব্বাকে চাকরি দিয়েছেন। উনিও রোকেয়া হলে চাকরি করতেন। উনিও মারা গেছেন। উনি আমার এক ভাই শাহজালালের আব্বা উনি খবর দিয়েছেন আমাদেরকে যে, আমার আব্বা মারা গিয়েছেন।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার নানার নাম কী বললেন?

মিন্নতঃ মোহাম্মদ কুদ্দুস মিয়া।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে যুদ্ধের সময় কি আপনারা ঢাকায় এসেছিলেন?

মিন্নতঃ না, যুদ্ধের সময় আমরা ঢাকায় যাইনি। আমার জেডো উনি যুদ্ধের মধ্যেও গিয়েছেন। উনি আমার আব্বার খোঁজ নিয়েছিলেন। তখন তো উনাদের আমরা লাশ চাইনি। আর হাড্ডি পেয়েছি। নজরুলের কবরের কাছে সমাধি দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ লাশ কীভাবে পেয়েছিলেন?

মিন্নত: লাশের কোনো চিহ্ন পাইনি। তবে যে রুমে মারা গিয়েছিলেন, ঐ রুম থেকে হাড্ডি নিয়ে আমরা নজরুলের খবরের পাশে খবর দেই।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কীভাবে হতো আপনারা জানতেন?

মিন্নত: টাকা-পয়সা তেমন ছিল না। আমার মা আমার মামা উনারা যেভাবে রাখছে। আমার মা নানাদের মাধ্যমে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মা কি জীবিত আছেন?

মিন্নত: মা জীবিত আছেন।

প্রশ্নকর্তা: উনি (মুর্শিদা বেগম) কি কথা বলার মতো শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন?...

প্রশ্নকর্তা: আপনার বিয়ে কবে হয়েছিল?

মুর্শিদা বেগম: সংগ্রামের ছয় বছর আগে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার ছেলে-মেয়ে?

মুর্শিদা বেগম: ছেলে আমার মিন্নত।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যুদ্ধের সময় আপনার আপনার স্বামী যে শহিদ হয়েছেন সেই খবর কীভাবে পেলেন?

মুরশিদা বেগম: আমার ভাসুরের মাধ্যমে খবর পেয়েছি এক সপ্তাহ পরে।

প্রশ্নকর্তা: উনি এক সপ্তাহ আগে এসেছিলেন?

মুর্শিদা বেগম: যুদ্ধের শনিবারে গিয়েছেন বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবারের দিন গিয়ে রাতে মারা গিয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় আপনার পরিবার নিয়ে আপনি কোথায় ছিলেন?

মুরশিদা বেগম: আমরা দেশে ছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনারা খাওয়া-দাওয়া, টাকা-পয়সা, পড়া, খরচ কীভাবে পেতেন? সংকট থাকার কথা।

মুর্শিদা বেগমঃ সে সময় আমার বাপের বাড়িতে থাকতে হতো। সংগ্রামের পরে ১১ মাসের মাথায় ১০০ টাকা করে বেতন দিত। বাপের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হতো। তিন বছরের মাথায় বাবা মারা যান। মা মারা গেছেন বাবার ১১ মাস পরে। তিন ভাই ছিল। কষ্ট করে চলতে হয়েছে। এখনো কষ্ট করতে হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তাঃ যুদ্ধের সময় কি আপনার স্বামী আপনার কাছে টাকা পয়সা রেখে গিয়েছিলেন? না কি ধার করে চলতে হয়েছে?

মুর্শিদা বেগমঃ বাবার বাড়ি আর শশুর বাড়িতে থাকতে হয়েছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

মুর্শিদা বেগমঃ ভৈরব। গ্রামের বাড়ি নন্দিয়া।

প্রশ্নকর্তাঃ পাকিস্তানিরা কি আপনার গ্রামের বাড়িতে আক্রমণ করেছিলেন?

উত্তরদাতা: আল্লায় দিলে আমাদের গ্রামে হামলা দেয়নি। আমাদের গ্রাম নদীর ওই পারে। এজন্য আক্রমণ করেনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ছেলে কবে নাগাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি পেয়েছেন?

মুর্শিদা বেগমঃ ২০০০ সালে চাকরি হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কেমন লাগে যে, আপনার স্বামী শহিদ হয়েছেন?

মুর্শিদা বেগমঃ কেমন লাগে আমারটা আমি বুঝছি। আপনারা কিছু বুঝবেন না। স্বামী মারা গেছেন। শুধু এই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে কি আপনার স্বামীর কোনো ছবি আছে?

মুর্শিদা বেগমঃ কোনো ছবি নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম আছে। সে সময় ছবি লাগতো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার স্বামী থাকতে ঢাকায় আসেননি?

মুর্শিদা বেগম: ঢাকা আগে আমি যাইনি। ১১ মাসের মাথায় আমাদেরকে ১০০ টাকা করে দেয়া হতো। কুদ্দুস মিয়া রোকেয়া হলের ছিল তিনি এসে আমাকে ১০০ টাকা দিতেন। এই টাকা আবার খালেদা জিয়া বন্ধ করে দেয়। এখন আমার সপ্তাহে ৫০০ টাকার ঔষধ প্রয়োজন হয়।

১১। সাক্ষাৎকার শিবেন্দ্রচন্দ্র দে (শিবু) (পিতা - শহিদ খগেন্দ্র চন্দ্র দে)

(স্থান: দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারিখ- ০৮-১১-২০২৩, সময়- বিকেল ৩.৪৫ মিনিট)

শিবু: আসলে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম বিষয়ে আমার তেমন একটা অভিজ্ঞতা নেই। তখন আমি খুবই ছোটো। সাত মাসের শিশু ছিলাম। মায়ের কাছ থেকে যা শোনা আরকি। প্রথমে তো আমি জানতামই না যে আমার বাবা নেই। বড়ো হয়ে দেখতাম ২৬মার্চ তারিখ আসলেই মা কান্না করতো। মাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম তুমি কান্না করো কেন? মা বলতেন, তোমার বাবা তো ঐ আকাশের তারা হয়ে গেছে আজকের দিনটাতে। সেইজন্য কান্না করি। তখন রূপকথার মতো মনে হতো আরকি। পরে যখন বুঝতে শিখছিলাম তখনও এভাবেই দিন কাটত। পরে একসময় আমার পিসি এসেছিল আমাদের বাড়িতে যখন আমরা জগন্নাথ হলে থাকতাম। তো যথারীতি মা সেই সময় ২৬মার্চে কান্না করছিল। তো জিজ্ঞেস করলাম তুমি আবার কেন কাঁদো? তখন পিসি বলেছিলেন যে, আজকের দিনে তোমার বাবা মারা গেছেন। আসলে ঐ সময়টাতেই আমি জানি যে, আমার বাবা শহিদ হয়েছিলেন। পিসি বললেন যে, "যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। ২৬ মার্চের ভোরবেলা তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছে পাকিস্তানিরা।"

পরে বড়ো হয়ে নিজেই বই থেকে পড়তে শুরু করলাম মুক্তিযুদ্ধটা কী, কেন, কীভাবে সংঘটিত হলো। তারপরে মার কাছে বিস্তারিত সমস্ত ঘটনা শুনলাম। ২৫ মার্চ রাতের বর্ণনা দিচ্ছিলেন আমার মা যে, ঐদিন রাতে পাকবাহিনীরা সমস্ত জগন্নাথ হল ঘিরে ফেললো। ঐদিন রাতে অনেক শিক্ষক ছাত্র-কর্মচারীদের নৃশংসভাবে মারা হয়। আমাদের কোয়ার্টার ছিল ইস্ট হাউজের পেছনে, যেখানে এখন রবীন্দ্রভবন হয়েছে। ওখানে টিনের ছাপড়াতে আমরা থাকতাম। হানাদার বাহিনীরা ওখানে হামলা করলো। হামলা করার পর যে যেভাবে পারলো মাঠে চলে

আসলো। তো আমার বাবা ও আমার বড়ো ভাই মতিলাল দে, ক্লাস নাইনে পড়ত, ওরা গোবর দিয়ে বানানো গৈঠার পেছনে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

মিলিটারি বলল যে, ঘরে কেউ থাকলে বেরিয়ে আসো। তা না হলে আমরা আগুন লাগিয়ে দিব। তখন ভয়ে তারা দুজনে অন্যান্যদের সাথে বের হয়ে আসলো। তাদেরকে রাতেই বের করে আনা হলো। জিসিদেবসহ যারা হত্যার শিকার হয়েছিলেন তাদের লাশ স্তূপ আকারে রাখা হয়েছিল বর্তমানের উপাসনালয়ের ওখানের পূর্ব পাশে। এগুলো সবই মায়ের কাছ থেকে শোনা। লাশগুলো যখন টানা হয়েছে তখন ভোর হয়ে গেছে। তখন এদেরকে আবার লাইন করে দাঁড় করানো হলো যারা লাশ টানার কাজ করছিল। আমার বাবা ছিল, ভাই ছিল ও অন্যান্য স্টাফরা। তখন পাকিস্তানি বাহিনী ক্রসফায়ার করল। তখন কেউ হয়তো মারা গেল কেউ আহত হয়েছিল। আমার বাবার হাতে এবং আমার ভাইয়ের সম্ভবত পায়ে গুলি লেগেছিল। তারা মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তখন আমার মায়ের কোলে ছিলাম। আমার আরেক ভাই রতন, তার বয়স তখন আড়াই বছর এবং আমার দিদির বয়স তখন ছয় বছর। মায়ের সামনেই বাবা ও মতি দাদাকে গুলি করা হয়েছিল। প্রথম ধাপে ওদেরকে মেরে পাকিস্তানিরা চলে গেল। তো আমার বাবা তখন জল খেতে চাইলে আমার বোন তখন তাকে জল খাইয়েছিল। এরপর আনুমানিক ঘণ্টা পরে পাকিস্তানিরা আবার ভেতরে আসে। তারা আমার দিদির জল খাওয়ানো দেখে রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিল।

তখন আমার বোন ভয়ে পালিয়ে গেল। ঐসময় ওরা আমার বাবা এবং ভাইকে আবার গুলি করে। পেটে গুলি লাগার পরে নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে গেল। তারা ওখানেই মারা যান। লাশ কিছুক্ষণ পড়েই ছিল। পরে ট্যাংক দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তাদেরকে কবর দিয়ে রেখেছিল। এরপর আমরা জগন্নাথ হল ছেড়ে চলে গেলাম শিববাড়িতে। শিববাড়ি থেকে তিন দিন হেঁটে নোয়াখালীতে চলে যাই। নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ফতেহজঙ্গপুর গ্রামে বাড়ি। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা লঞ্চে- যে যেভাবে পেরেছে গিয়েছে। এরপর বেশ কিছুদিন আমরা নোয়াখালীতেই ছিলাম। আসলে এটুকু আমি জানি। পরে মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।

আপনাদের অবরুদ্ধ জীবনের বর্ণনা কী শুনেছেন বলবেন?

আমরা পথে পথে যাওয়ার সময় কোনো খাবার পাচ্ছিলাম না। আমাকে কাঁচা বার্লি খাওয়ানো হয়েছিল। পথের মধ্যে আমাকে কোলে দেখে দুইবার দুই জায়গায় কিনে নিতেও চেয়েছিল মাকে এভাবে বলে যে, আপনার তো স্বামী নেই- এতগুলো ছেলে মেয়েকে কীভাবে বড়ো করবেন, তার থেকে আমাদের কাছে ছোটো ছেলেকে বিক্রি করে দেন। তখন আমার মা বলেছিলেন যে, না আমি তো আমার ছেলেকে বিক্রি করতে পারি না। মা তখন দ্রুত এ জায়গাগুলো ত্যাগ করেছেন যে যদি আমাকে কেউ নিয়ে যায়। আমরা আমাদের গ্রামে আমাদের বাড়িতেই গিয়েছিলাম। আমাদের দিদিমা সেখানে ছিলেন। আমাদের ধানের জমি ছিল সেখান থেকে কিছু আসতো। আর গ্রামে তো লতা-পাতা খেতে পাওয়াই যায়। এভাবেই আমাদের দিন কাটছিল। আমার মা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে চাকরি পান অফিস সহকারী হিসেবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে। আমরা আসলে যুদ্ধের পরে চলে যেতে চেয়েছিলাম ভারতে যেহেতু সেখানে আমার তিন মামা থাকতেন। কিন্তু আমাদের এখানকার পাড়া- প্রতিবেশীর পরামর্শ ও সহযোগিতায় আমরা দেশে থেকে যাই। তারাই মাকে চাকরি দিয়েছিলেন।

এই ইউল্যাব স্কুল থেকেই আমি, আমার বোন এসএসসি পাস করেছি। আমার ভাই ক্লাস এইট পর্যন্ত এই স্কুলে পড়েছে। পরে সে নীলক্ষেত স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে এখন টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় সুপারভাইজার হিসেবে আছে, রতন কুমার দে। আমরা এখন আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টারে থাকি। আমার মা ২০০৭ সালে মারা গিয়েছিলেন। তিনি আসলে যুদ্ধের কথাগুলো সহজে শেয়ার করতে পারেন না। আসলে স্বচক্ষে দেখা তো। তাঁর স্বামী এবং সন্তানদের এভাবে মৃত্যুটা তিনি মেনে নিতে পারেননি বা সহ্য করতে পারেননি। আমার মা অনেকদিন পাগলের মতো ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি যে, তার চুলগুলো সব দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। তাঁর চুল লম্বা লম্বা ছিল। অনেক গ্রামবাসী তাঁর কাছে 'জলপড়া' নিতে আসত যে সে বোধহয় সিদ্ধি জানে। পরে আমার দিদিমা বলল যে, এভাবে অনেকে বিরক্ত করতে থাকবে। তাই মায়ের চুলগুলো কেটে দিয়েছিলেন দিদিমা।

আমার মায়ের মৃত্যুর সময়ও কাঁচা চুল ছিল। শুধু দুই পাশে সাদা ছিল একটু।

শহিদ পরিবার হিসেবে কী পেয়েছেন আপনারা?

শহিদ পরিবার হিসেবে ১৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ইউনিটি দিত। ১৫০০৳ করে। পরে বোধহয় তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আমরা পেয়েছিলাম। এরপরে আমরা আর কোনো সুযোগ-সুবিধা পাইনি। বাসা যেটা ছিল সেটা মায়ের নামে। এখন সেটাতে ভাই থাকেন। তার নামে বাসা। চাকরি রিটায়ার্ড হয়ে গেলে বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

আপনার বাবা শহিদ হয়েছেন শোনার পর আপনার অনুভূতিটি কীরকম ছিল?

পিসির কাছে শোনার পরে আমিও কান্না করেছিলাম। মা আমাকে আগে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রাখত যে, আমি বড়ো হলে বাবা আসবে। তা আর হয়নি।

আপনি পড়াশোনা করেছেন কোথায়?

আমি ঢাকা কলেজ থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেছি। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদান করি। এখন ওভাবেই আছি। আমার দিদি বাসনা দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান থেকে মাস্টার্স করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি কানাডা চলে গেছেন। ভাই রতন চন্দ্র দে ফরেস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছেন। এখন টিএসসিতে কর্মরত।

এখনকার অনুভূতিটি কেমন আপনার?

আসলে বাবার আদর না পাওয়ার কারণে আমার এ বিষয়ে খুব বেশি গভীর অনুভূতি নেই। আমার মা আমাদেরকে এমনভাবে মানুষ করেছেন যে, বাবার অভাব বুঝতে পারিনি। তবে বাবার মৃত্যু বা শহিদ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমি গর্ববোধ করি।

আপনার শহিদ মতিলাল ভাই সম্পর্কে?

ও দেখতে শারীরিক গঠনে বেশ বড়ো ছিল। ক্লাস নাইনে পড়লেও ওকে অনেক বড়ো দেখাত। পাকিস্তানিদের কাছে না কি খবর ছিল যে, সে না কি প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত। সন্দেহ ছিল তার প্রতি। আর ২৫ মার্চ রাতে বা পরদিন সকালে তো নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। তাই তিনিও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তবে তিনি বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে যেতেন। তবে মায়ের কাছে তার সরাসরি যুক্ত থাকার ব্যাপারে কিছু শুনিনি। আমার বাবা, মা, বড়ো ভাইয়ের ছবি রতন কুমার দে'র বাসায় আছে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

পরিশিষ্ট: ৩

অনুলিখন: কুমিল্লায় সংঘটিত এফজিডি

স্থান: পিপুলিয়া, কুমিল্লা। তারিখ ৩০-১২-২০২৩, সময়: ১১:৩০

কাজী সামিও শীশ: আমরা এই মুহূর্তে কাজ করছি মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ভূমিকা নিয়ে। এখন আমরা জানতে চাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সেগুলো শুনতে এসেছি। তাছাড়াও আমাদের নিত্যদিনের সহজ-সরল বিষয়গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। খাওয়া-দাওয়া, দৈনন্দিন চলাফেরা এগুলো নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটা অবরুদ্ধ সময়ে আপনাদের জীবন কেমন ছিল সেগুলো আমরা শুনতে চাইবো।

আশফাক হোসেন: আমি একটু বলি, এখন যে একটা শান্তিপূর্ণ জীবন, যুদ্ধের সময় যারা যুদ্ধে যাননি তবে দেখেছেন যে শান্তিপূর্ণ ছিল না। হয়তো কোথাও মিলিটারি আসবে ভয় ছিল আবার কখনো লবণের ট্রাক আসার কথা থাকলেও লবণের ট্রাক আসে না এর ফলে হয়তো লবণের দাম বেড়ে গেছে। আবার দেখা যায় কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে কিন্তু বিক্রি করতে না পারায় পঁচে গিয়েছে অর্থাৎ তখন অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি ছিল সেই সময়টার কথা জানতে চাচ্ছি আমরা। আর আপনারা যারা যুদ্ধে ছিলেন তাদের কথাও জানবো কীভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছেন। আমরা জানতে চাচ্ছি আশেপাশের পরিস্থিতি কেমন ছিল, জীবন কেমন ছিল।

নাজিবুল ইসলাম: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রাথমিক কিছু কথা আমি সবার সুবিধার্থে বলছি। আমি ডঃ মুহাম্মদ নাজিবুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গ্রামীণ পর্যায়ে কিছু কাজ করার সুযোগ আমারও হয়েছিল। আমার গবেষণার মধ্যে এই অংশটাও আছে। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের বিকেলবেলা পিপুলিয়া হাইস্কুলের মাঠে যেখানে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম,আলী আকবর,অলি আহমেদ, আবু তাহের মজুমদার ও স্থানীয় কিছু নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি ছিল। ২৫শে মার্চ বিকেল বেলা যেটা ছিল বৃহস্পতিবার। সেখানে স্থানীয় যুবকদের মাধ্যমে সবাই উপস্থিত ছিলেন। যেখানে আপনাদের মহান

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের যে মানসিক প্রস্তুতি সেটা তখন এখানে হয়েছিল। আমরা দেখেছি যুদ্ধের কয়েক মাস পরে এখানে পিপুলিয়া দীঘির পাড়ে একটা ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল। পিপুলিয়া বাজারে যে মসজিদ তার সামনে মাওলানা হাফিজুর রহমান, মাকসুদ আলী,...,আশরাফ, মিলু মিয়া, হেমজয়া তাদেরকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি সিরাজুল ইসলাম, সুরুজ মিয়া, তেলেরকতা এবং নয়নছড়া গ্রামে তাদেরকে হত্যা করা হয়। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের বেশ কিছু বিরোধী শক্তিও তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর মধ্যে দুদুমিয়া এবং যদু মিয়া এরকম বেশ কিছু নাম। মোটামুটি সেই সময়টা পরিস্থিতি যা ছিল এখান থেকে স্থানীয় মুরুব্বিরা বলতে পারবে যে মুক্তিযুদ্ধের শেষ থেকে এসে সাতজন রাজাকারকে ডাকাতিয়া নদীর পাশে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা নতুন তথ্য হতে পারে। গ্রামের মুরুব্বি একজন পরবর্তীতে আমাকে খবরটি দেখিয়েছিলেন। সে সময়ের যে দৈনন্দিন জীবন সেটা এখন আমাদের মূল বিষয়।

প্রশ্ন: আপনাকে দিয়ে শুরু করি, ১৯৭১ সালে যে মুক্তিযুদ্ধ তার সাথে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর: হ্যা, ১৯৭১ সালে আমি সোনাগাছি স্কুলের এসএসসির ক্যান্ডিডেট ছিলাম।

প্রশ্ন: তখন বয়স কত ছিল?

উত্তর: ১৬/১৭ বছর। সংগ্রামের আগে তখন স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ভালো সংগঠন ছিল। তখন স্কুলের ছাত্র-সংসদ ছিল। আমি আবার সেটার ভিপি ছিলাম। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকতাম। ঐভাবে সংগ্রামে আমরা সোনাগাছি থেকে গিয়েছি। তখন মিলিটারি আসলে আমরা মিছিল করতে করতে যেতাম। তখন মিটিংগুলোতেও যাই।

প্রশ্ন: কোন মিটিংয়ে যেতেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন ডাকলে যাই তারপর সাত মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলো। নির্বাচনের পর ১৮ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যা বলতো আনঅফিসিয়ালি সাধারণ মানুষ সেটাই মেনে নিতো। তখন টেলিভিশন তেমন ছিল না। খুব কম ছিল। সোনাগাজী বাজারে শুধু একটা টেলিভিশন ছিল। তখন সোনাগাছি স্কুলে বোর্ডিংয়ে ছিলাম তাই সেখানে শুনতাম।

প্রশ্ন: তখন টেলিভিশনে দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো প্রচার করা হতো?

উত্তর: এতো বেশি কিছু প্রচার করা হতো না। অল্প কিছু প্রচার করতো। বাকি সব পত্রিকায় আসতো।

প্রশ্ন: সে সময় মিটিংয়ে বড়ো নেতারা আসতো?

উত্তর: সে সময়ের এক নেতা ছিল আজাদ নামে চৌদ্দগ্রামের তিনি আসতেন, কুমিল্লার ওমর ফারুক ভাই ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজের ভিপি, কুমিল্লার সংগঠনের যারা ছিলাম সব আন্দোলনে থাকতাম। ৭ মার্চের পর বঙ্গবন্ধু যেভাবে বলতো সেভাবেই সব হতো, অফিস-আদালত বন্ধ ছিল। এরপর ২৫শে মার্চের রাত স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রতিরোধ যুদ্ধে যেতে চাই আমরা। সোনাগাছি বাজারের ওখানে একটা ব্রিটিশ আমলের ব্রিজ আছে। সেখানে বড়ো একটা বটগাছ ছিল। তখন প্রতিরোধ যুদ্ধ বলতে অস্ত্র তেমন ছিল না, হাজার হাজার সাধারণ মানুষ একসাথে প্রতিরোধ করতাম পাঞ্জাবিরা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে চিটাগাং এর দিকে মুভ করতো। তাদেরকে প্রতিরোধ করতে বিশাল বট গাছ ছিল যেটাকে কাজে লাগালাম। এখন গাছ কাটতে টাকা লাগে, তখন হাজার হাজার মানুষ ছিল গাছ কাটার যন্ত্র নিয়ে হাজির হলো। তখন আমরাই গাছ কাটি প্রতিরোধ করার জন্য। অনেকটুকু রাস্তা বন্ধ করি। তখন আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। পাঞ্জাবিরা তখন পেছন থেকে আসছিল।

প্রশ্ন: পাঞ্জাবিরা এসেছিল পরে?

উত্তর: হ্যাঁ, এসেছিল।

প্রশ্নকর্তা: একটু থামাই, সেই সময় মানুষরা পাকবাহিনীর যোগাযোগ বন্ধ করতে গাছ কেটে ফেলে রাখে রাস্তায়?

উত্তর : সানমুড়ার পূর্ব দিকে সরে গেলাম। পাঞ্জাবিরা তখন সামনের দিক সরিয়ে চিটাগাঙের দিকে যায়। এর পরবর্তীতে বোর্ডিং থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম মা-বাবাকে না জানিয়ে, পরিবারকে না জানিয়ে আমরা স্বাধীনতার চেতনার জন্য ভারতে চলে যাই বর্ডার পার হয়ে। বাবা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিলেন। বোর্ডিং থেকেই চলে যাই।

প্রশ্ন: ইন্ডিয়া যেতে কত সময় লাগে তখন?

উত্তরঃ আড়াই কিলো। বর্ডার ক্রস করে কাঁঠালিয়াতে যাই। ওখানে একটা ইউথ ক্যাম্প ছিল ইন্ডিয়ার বর্ডারের পাশে।

প্রশ্নঃ ইয়ুথ ক্যাম্পের ইনচার্জে কে ছিল মনে আছে?

উত্তরঃ ইয়ুথ ক্যাম্পের চার্জে আমান চৌধুরী ছিল। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রী আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীর ভাতিজা ছিল।

প্রশ্নঃ সেই সময় ত্রিপুরা বলা হতো। কৃষক সমিতি প্রধান ছিল কংগ্রেসের আশরাফ উদ্দিন। আমান চৌধুরী তাহলে রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য...

উত্তরঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নঃ এই ক্যাম্পের নাম কী ছিল?

উত্তরঃ প্রথম তো ছিল কাঠালিয়া। পরে হয় বড়মুড়া ইউথ ক্যাম্প। ত্রিপুরা থেকে আখাউড়া হয়ে যেতে হতো, আড়াইমুড়া। তারপর ছিল বড়মুড়া। আমরা যখন বোর্ডিং থেকে যাই ট্রাকে করে আড়াইমুড়া দিয়ে বমি করতে করতে যাই। ক্যাম্পের আমার সিট ছিল বড়মুড়ায়।

উত্তরঃ আমি একটু যোগ করি। প্রথমে ক্যাম্প কাঠালিয়া ছিল। পরে স্থানান্তরিত হয় বড়মুড়ায়। কারণ কাঠালিয়ার ক্যাম্পটা ছিল পাকিস্তানিদের পাশে। তারা যখন বোম্বিং করে তখন প্রায় ক্যাম্পের কাছে পড়তো। তখন আমান ভাই ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করে ক্যাম্পটা বড়মুড়ায় স্থাপন করে। সেদিন আমি ছিলাম। হেঁটে ওইখানে যাই।

প্রশ্নঃ কতদূর ছিল ক্যাম্পটা?

উত্তরঃ চার-পাঁচ কিলো হবে। পাহাড়ি রাস্তা ছিল। যুদ্ধ হয়ে গেলে ওখানে চলে যাই আমার ভাই তখন থার্ড ইয়ারে ছিল, ইকোনমিক্স নিয়ে অনার্সে পড়তো। সে তখন যায়নি যুদ্ধে বরমুড়া থেকে। তখন ফার্স্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন মাওনা, আমরা ২০০ জন ছেলেকে নিয়ে দুই তিনটা ট্রাকে করে রওনা হয় বিকাল তিনটায়। ওই যে আঠারো মনে সেখানে একবার নিচে তাকালে মাথা ঘুরে এত নিচে, ওইদিকে পার হয়ে ধর্মনগর যাই। এর পশ্চিম দিকে আমরা ধর্মনগর যাই। সেখান থেকে

করিমগঞ্জে যাই যেখানে তলা গ্রাম বলে একটা জায়গা সেখানে ফার্স্ট বেঙ্গল এর যে হেডকোয়ার্টার ছিল ওইখানে আমাদের ট্রেনিং হয়।

প্রশ্ন: সেখানে দায়িত্বে কে ছিল?

উত্তর : অফিসার, চিটাগাংগের কর্নেল ছিল, ময়মনসিংহের হাবিলদার মেজর ছিল(নাম ভুলে গিয়েছি), সেখানে তিন থেকে চারটা ট্রেনিং হয় শর্ট কোর্স।

প্রশ্ন: কী কী শিখলেন?

উত্তর: আমরা শিখলাম ইনসিটো মাইন, এন্টি পার্সোনাল মাইন্ড, স্ট্যানগান, ক্যামোফ্লাজ এন্ড কনসিলমেন্ট।

প্রশ্ন: মাথার মধ্যে গাছের ডাল নিয়ে যে লুকিয়ে থাকা ওইটা ছিল?

উত্তর: এটা ছিল। অর্থাৎ যে জায়গায় অবস্থান করছে তার পরিবেশ অনুযায়ী থাকা। ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি থাকার জন্য ১৮ রাউন্ড লোড করতো। ২০ এর বেশি লোড করলে স্প্রিং লোজ হতো। এসএলআরটায় ব্রাশ হতো না। যেটা রাশিয়ান স্ট্যানগান সেটা ২৮ রাউন্ড লোড হতো, ব্রাশ করা যেত। এটা ৭৫ মাইল পর্যন্ত শত্রু মারা যেত। ইনসিটো মাইন যেটা ট্যাংক ধ্বংস করে সেটা তোদের মতো এটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও ব্রাস্ট হতো না। ৩ ফুট দূর থেকে লাফ দিয়ে পড়লে ব্লাস্ট হতো ওজনের উপর নির্ভর করত। হ্যান্ডলাইটে অনেক ইউজ করা যেতো।

প্রশ্ন: আপনি কোনটা ইউজ করেছিলেন?

উত্তর: আমরা কিছু গেরিলা যুদ্ধ করেছি, কিছু সরাসরি। আমি জকিগঞ্জ ও করিমগঞ্জে ছিলাম। এই দুটো একেবারে কাছে। জকিগঞ্জ থেকে ডাক দিলে করিমগঞ্জে শোনা যায়। এক সময় করিমগঞ্জের পার্ট ছিল জকিগঞ্জ। নদীর এপার ওপার। করিমগঞ্জে একরাত সিনেমাও দেখেছি। কানাইঘাটেও যেতাম। কানাইঘাটে আমরা ছিলাম ডিসেম্বরের ৯ তারিখ, যুদ্ধের একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে। ওই সময় সারের গোডাউনে এক রাত ছিলাম। ঐসময় সি আর দত্ত ছিলেন মানে চিত্তরঞ্জন। ঐখানে দুই তিন দিন থাকি। বাই রোড তো নাই, বিভিন্ন রোড হয়ে, ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে অনেক পথ ঘুরে ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ সিলেটের অব্দা রেস্ট হাউসে আসি।

প্রশ্ন: বাকি সময় কই ছিলেন?

উত্তর: কানাইঘাটেই তখন থাকি।

প্রশ্ন: লিডার কে ছিল তখন?

উত্তর: কর্নেল অলি তখন কমান্ডার ছিল। ক্যাপ্টেন ছিল তখন...

উত্তর: ওই সময় সমস্যা হয়েছে যেটা ইন্ডিয়া আর্মি তখন ফার্স্টবেঙ্গল এর সাথে যায় আগে যেখানে ছিল পাকিস্তানি অফিসাররা। ঐ অফিসারদের যখন সরিয়ে দেয় তখন আমাদের দেশের, লেফটেন্যান্ট সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, ফুল লেফটেন্যান্ট ও ক্যাপ্টেন তাদেরকে দায়িত্বগুলো দেয়। সব ক্যাম্পে তখন অফিসার দেয়নি।

প্রশ্ন: ২৫ তারিখ তো স্বাধীন তখন কী অবস্থা ছিল?

উত্তর: অবদা রেস্ট হাউসে দুই-তিনদিন ছিলাম। সার্কিট হাউজের উত্তর দিকে। ২৬শে মার্চ আমাদের ফোল্ডিং করায়। অলি ও আরো একজনের নাম মনে নেই তারা বলে যারা ছাত্র তাদের মধ্যে কেউ সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাইলে করতে পারো, নাহয় চলে যেতে পারো। যারা পুলিশ আছে তারা চাকরি করতে চাইলে করতে পারো নাহয় চলে যেতে পারো, বিভিন্ন বাহিনী ছিল ওখানে। তখন টাইপ করা একটা কাগজ দেয় আমাদের কাছে। আমরা বলি আমরা চলে যাব। আমরা স্টুডেন্ট, চাকরি করব না। ওখান থেকে রওনা হয়ে ২৯শে ডিসেম্বর কুমিল্লায় বোনজামাইয়ের বাসায় আসি। কিছু সময় গাড়িতে কিছু সময় হেঁটে আসি। তখন সারাপথ খাবার খেতে খেতে আসি। তখন আমাদের অনেক আদর।

প্রশ্ন: অস্ত্র সাথে ছিল তখন?

উত্তর: না, জমা দিয়ে এসেছি।

প্রশ্ন: খেতেন কী তখন? টাকা পেতেন কোথায়? মানুষ খাওয়াতো?

উত্তর: খাবারের কোনো অভাব ছিল না। মানুষেরাই দিতো। এভাবে চার পাঁচ দিনে কুমিল্লায় আসি।

প্রশ্ন: কতজন আসেন একসাথে?

উত্তর: আমরা সাত থেকে আট জন ছিলাম। কুমিল্লার ওহাব ভাই তো তখন নিজস্ব ক্যাম্প করে। সোনাগাছিতে ওনার আন্ডারে। উনার সাথে সবসময় ছিলাম। তখন সোনাগাছিতে আঞ্চলিক ছাত্রলীগের অফিস করি যার সভাপতি ছিলাম।

প্রশ্ন: পরীক্ষা পরে আর দিয়েছিলেন?

উত্তর: ১৯৭২ সালে কুমিল্লায় গিয়ে পরীক্ষা দেই ৩০০ নম্বরের। সোনাগাছিতে ৬৬ জন ছিলেন যার মধ্যে ২৬ জন সেন্টার করি। আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাই। ইন্টারমিডিয়েট করি ভিক্টোরিয়া থেকে পরে ডিগ্রিও করি এরপর আর লেখাপড়া করিনি। পরে মাদ্রাসায় চাকরি নিলাম। চাকরি, কিছু ব্যবসা ছিল। ২০০৫ সালে এক রাজনৈতিক এমপির জন্য চাকরিটা চলে গেল। মামলা দিয়েছিল, হাইকোর্টে এখনো মামলা চলছে। পাকিস্তান আমলে এমপিওভুক্ত হয় এটা। বাবা ১৯৯০ এ মারা যায়। বাবা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতো। সরকারি স্কুল ছিল সেই সুবাদে সব ভাই-বোন পড়াশোনা করি।

প্রশ্ন: যুদ্ধের সময়ের জীবনটা কেমন মনে হয়? হঠাৎ আসলো হঠাৎ চলে গেল এরকম কিছু ?

উত্তর: না, যুদ্ধের সময় অনেক পরিবর্তন এসেছে মনে। ওই সময় অনেক অভাব ছিল। ভাতের মাড় একজন আরেকজন থেকে নিতো। আরেকজনের জুতা পড়ে বেড়াতে যাই তখন।

প্রশ্ন: অভাব কেন ছিল বলতে পারবেন?

উত্তর: চাকরি খুব কম মানুষ করতো। সেনাবাহিনীতে খুব কম সুযোগ পেতো পাকিস্তান আমলে। প্রযুক্তির অভাব ছিল কৃষি কাজে। বন্যা হতো আবার খুব বেশি। এসব কারণে অভাব ছিল।

প্রশ্ন : যুদ্ধ কি আপনার জীবনে কোনো পরিবর্তন এনেছে?

উত্তর: হ্যা, যুদ্ধ অনেকভাবে পরিবর্তন এনেছে। একসময় মানুষের খাবারেরই অনেক অভাব ছিল। যুদ্ধের পর অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে ।

প্রশ্ন: কেন যুদ্ধে গিয়েছিলেন মনে আছে?

উত্তর: কোনো কিছু পাওয়ার আশায় যাইনি। কোনো কিছু দিবে এরকম কমিটমেন্ট তো ছিল না। টাকা বা কোনো কিছুর জন্য যাইনি। দেশপ্রেমে গিয়েছি। স্বাধীন দেশ হবে এজন্য গিয়েছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবুল মিয়া-কুমিল্লা

মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ উদ্দিন হেমজোড়ার নেতৃত্বে আমরা ভারতের জন্য রওনা হইলাম। ফরিদ উদ্দিন সাহেব কইলো, "আমরা যুবকরা যদি এখানে থাকি আমাদেরকে মেরে ফেলবে।" তখনও কুমিল্লায় পাঞ্জাবিরা এসে পৌঁছায়নি। আমরা ১২/১৪ মিলে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে হাঁইটা সোনামুরা পর্যন্ত পৌঁছাইলাম। প্রফেসর খুরশেদ আলম ও ঢাকার একজন ছাত্রনেতা নূরে আলম আমাদের সকলের নাম লিস্টে লিপিবদ্ধ করলো এরপরে হাতিমারা পাঠাইছে। এখান থেকে আমরা ভারতের মেজর শর্মার নেতৃত্বে ট্রেনিং নিলাম। এখানে খাওয়ার খুব কষ্ট ছিল। ৪০০/৫০০ফুট নিচে থেকে পানি আনতে হইতো। অ্যালুমিনিয়ামের, লোটা বলি আমরা বা ঘটি দিয়া এক ঘটি আনতাম। ঐটা দিয়াই খাওয়া, ওয়াশরুম সব করতে হইতো। দ্বিতীয়বার আনবার আর কোনো সুযোগ ছিল না। এই অবস্থার কথা যখন কালাম মজুমদার জানতে পারল তখন আলী শহরের মুক্তিযোদ্ধা দীন মহম্মদকে চিঠি লিখল। ঐ ক্যাম্পের ডাইরেক্টর ছিলেন সম্ভবত মরহুম আবুল খান। চিঠিতে লিখছিলেন, আমার পিপুলিয়ার লোকগুলোরে আমার কাছে ছেড়ে দেন। এরপর কালাম মজুমদারের বাড়ি যাওয়ার পর তিনি বললেন,"বাঁচলে একসাথে বাঁচবো, মরলে একসাথে মরবো, ছিন্নভিন্ন হয়ে কেউ দৌড়াদৌড়ি করবা না।" কালাম মজুমদারের নেতৃত্বেই আমরা আবার ভারতে চইলা যাই। প্রথমে কাঠালিয়া হয়ে এরপর বড়মুড়া। ফোর বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আব্দুল গফফার হাওলাদারের আসছিলেন ৫/৭ জন ছেলে নিতে। গাড়িতেই উঠিয়া আমাদের নিয়া গেল হাতিমারা। ঐখানেই ট্রেনিং হইতো আমাদের।

শালদা নদীর অপজিটে আমরা সেই জায়গাটিতে থাকতাম। ঐটার নাম ছিল কোনাবন্দ। এইখানে দেখবেন এখনও বুলেটের কত দাগ। আমাদেরকে ব্যাঙ্কারে রাইখা দিছে আর যারা আর্মি, পুলিশ রাতে তাদের এটাকে পাঠাইতো। এইখানে গেলেও তারা ৭/১০ জন গেছে। ২/১ জন ফিরছে কিছু ফিরে নাই, মারা গেছে।

এইরকম অনেক দুরবস্থা গেছে। এইভাবেই আমি একই জায়গার মাঝে পুরা যুদ্ধকালীন সময়টা ছিলাম। সেইদিন ভারত-ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো ঐ দিবাগত রাতে ভারতের সৈন্য যারা আছে আমাদের জিফেন্স টুইকা গেছে। কয় তোমরা পিছে যাও। পিছা বলতেই আমরা চইলা গেলাম। আমাদের কোনাবন্দ হেডকোর্য়াটারে। আমার চাচা হাবিলদার আনোয়ার আলী উনি কোয়ার্টার মাস্টার এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেন, ঐ দেখো পানির বোতল আছে ঐগুলা ট্রাকে উঠাও। তো ঐগুলো নিয়া আমরা উইঠা গেছি। কয়েকটা গাড়ি, গাড়ির সংখ্যা বলতে পারবো না। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে টানা ব্রিজ কইরা দিছে আমাদের গাড়িগুলা পার করার জন্য।

রাস্তার মধ্যে তারা বড়ো মই তার, যার কাছে যা আছে আমাদের দেশে মানববন্ধন যেমনে করে যার কাছে যা আছে তাই আমাদের ট্রাকের মধ্যে ফেলে। খাওয়ার কোনো অভাব নাই। তো আমাদেরকে তারা নিয়া গেলো বেলুনিয়ায়। বেলুনিয়া একটা BSF ক্যাম্প ভারতের ভেতরে। ঐ মহুরি নদীর হেইপার। আমরা যখন এইখানে গেছি- তো পাকিস্তানি বাহিনীরও তো গোয়েন্দা আছে তারা খবর দিছে যে ফোর বেঙ্গল আইতাছে। ফোর বেঙ্গল কিন্তু পাকিস্তানিদের জন্য বিশাল একটা আতঙ্কের নাম।

তো তারা এনতে ভাইগ্যা গেছে গা চট্টগ্রাম। তো আমরা ঐখানে যাইয়া কিছু ঘাট টাই করলাম রাতে অবস্থান করলাম আর দিনে যাইয়া রেকি করলাম দেখলাম কোনো ফোর্স নাই। ঐ কিছু মাইন টাইন পুইতা রাখছে তো মাইন ডিসপোজাল টিম আইসা সব করলো - আমাদের টেকনোলজি অভিজ্ঞতা নাই। পরের দিন রাত্রে আবার আমাদেরকে গাড়িত উঠাই দিলো। নিয়া গেলো হাটহাজারি নাজিরা এরিয়ায়। এখানে নেওয়ার পরে ভারতের সেনাবাহিনীর অফিসাররা আমাদেরকে সেক্টর কমান্ডারদের সাথে মিলে যুদ্ধের একটা টাইম ঠিক করলো। এখানে তো প্রায় ৪৫ হাজারের উপরে পাকিস্তানি একত্রিত। তো আমাদের অফিসাররা মিলে একটা প্ল্যান করলো। রাত ৪ টা থেকে সাড়ে ৪ টা হাওয়াই হামলা করবে।

বিমানে?

হ্যাঁ, বিমানে হামলা। ওপার সাড়ে চারটা থেকে ৫ টা আর্টিলিয়ারি বোর্ড ... .. আর অন্য সকল। এইতো বিশাল এরিয়া। আমি ছিলাম দক্ষিণ সাইডটাতে। ভাগ্যক্রমে

আমার ঐ চাচা হাবিলদার আনোয়ার আলী সাবও ঐ গ্রুপেই ছিল। ওখানে নিয়া, আমাদের আর্মির বাসায় বলে AP, OP . সাদা দস্তরখান বলি ওইটা মেইলা আমাদের বসাই দিছে, হাটুগেড়ে এই বসাই দিছে, বইসা রইছি। আমাদেরকে সিগনাল দিছে যখন রেড বাতি জ্বলবে, এখানে ফায়ারিং হবে, অনেক কিছু হবে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই। তোমরা যে যার যায়গাতে বইসা থাকবা। যখন রেড পিস্তল ফায়ার হবে, যখন পৃথিবীটা আলো হইয়া যাবে, তখন তোমরা গুলি করতে করতে সামনে অগ্রসর হইবা। পরে আমাদের তো নিয়া বসাই রাখছে। যখন রাত্রে ৪ টার সময় বিমান হামলা শুরু হইয়া গেছে আমরা তো বুঝতে পারছি এটা আমাদের তারা। সাড়ে চারটা পর্যন্ত এইটা করার পরে এদিকে গুলি হেদিকে গুলি তখনতো তুমুল যুদ্ধ।

তখন যুদ্ধটা কোথায় শুরু হলো?

এই হাটহাজারি নাজিরা এটাতো বিশাল এরিয়া। চট্টগ্রামেই। বিমান হামলা যখন হইয়া গেল, বিমানরা উচা কইরা চইলা গেলো। তখন টুইস্মটার, থ্রিইস্মটার, আর আর (RR) এইগুলা করলো ৫টা পর্যন্ত। তখন আকাশটা ফর্সা হইয়া আসছে। তখন আমরা গুলি করতে করতে - আমাদেরকে বলে দিছে এংগেল কইরা গুলি করবা, কারণ উপরে গুলি করলে তোমাদের ভাইয়েরা আছে তাদের গায়ে গুলি লাগতে পারে। তো আমরাও গুলি করতে করতে সামনের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকলাম। তারাও গুলি করতেছে। দুইপক্ষই গুলি। তবে তাদের শক্তি একটু দুর্বল হইয়া গেছে। এই হাওয়াই হামলা আর মর্টার হামলাই তারা আহত নিহত হইয়া গেছে অনেক। যখন আমরা ছাচ কইরা যাইতেছি তখন দক্ষিণ দিকের থেকে দেখা যায় তারা আইতেছে "সাব মেনে হ্যান্ডসাপ কিয়া" তখন ভারতীয় সৈন্যরা দৌড়াইয়া আমাদের সাইডে আইসা বলে ফায়ারিং অফ করো। হিন্দীতে বলে, উর্দুতে বলে, বাংলায় বলে- যে যেমনে পারে। "হাতিয়ার ছেড়ে ছো, হাতিয়ার ফেক দো, ফায়ার মাত কারো"-বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এই তখন আমাদেরকে স্টপ করাই দিলো। সারেন্ডার শুরু হয়ে গেলো। ভারতে সৈন্যরা আগেই রেডি কইরা রাখছে। এইখানে চেকপোস্ট এইখানে আইলে তারা অস্ত্র ফেলে দিবে আর সামনে গেলে আমাদের আর্মির কিছু গ্রাউন্ড শেক আছে, যেডির উপরে আমরা শুইতাম। স্বর্ণ-গয়না, টাকা-পয়সা, পিস্তল সব এখানে দিতেছে কিন্তু কই নিছে আমরা আর কইতে পারি নাই। সবগুলা ভারতে গেছে, কই নিছে কইতে পারি না।

প্রশ্ন: আনুমানিক কতজন পাকিস্তানি সৈন্য তখন আত্মসমর্পণ করছে?

উত্তর: ওরে আল্লাহ রে, ৪০ হাজারের উপরে তো জীবিতই পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন: আপনাদের এলাকায় কতজন ছিল?

প্রশ্ন: আনুমানিক একটা হিসাব। লাইনকে লাইন। এতো তো হিসাব করি নাই।

প্রশ্ন: আচ্ছা হাটহাজারির যুদ্ধ শেষ হয়ে আত্মসমপর্ণের পর আপনি কী করলেন?

্উত্তর: আমাদেরকে নিয়া গেল এবার হাটহাজারি বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তো ঐখানে নিয়া আমাদের রাখলো। ঐ যে আমরা বিলুনিয়া গেছি, বেলুনিয়া যাইতে আমাদের আর্মস .. .. এগুলা হারায়া গেলো এইখানে। বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পর আমার চাচা হাবিলদার আনোয়ার আলী কমান্ডিং অফিসারকে বলল ফোর বেঙ্গলে আমাদের কিছু মাল পাঠাইয়া দিছি এখন কী করা যায়। কয় তাইলে ২ জন লোক পাঠাই দেও ঐহানে। তো হাবিলদার সাহেব আইসা আমার আর আরেকজন ছিলো নায়েব নাম - আমাদের দুইজনকে পাঠাই দিলেন। তো আমরা চইলা গেছি ফেনী। অস্ত্রসস্ত্র সবই আছে। কে জানি কইছিল আলিয়া মাদ্রাসায় গিয়া রিপোর্ট করো ঐখানে আর্মস .. .. থাকবে হেগুলির দায়িত্বে থাকবা। তো হেইখানে তো রাস্তাঘাট নাই, কতক্ষণ হাইটা, কতক্ষণ বাসে, রিকশায় এই অবস্থা কইরা যখন ফেনীর দক্ষিণ সাইতে আইছি।

প্রশ্ন: কত সময় লাগলো? এক দিন?

উত্তর: পুরা দিনই লাগেছে। সন্ধ্যা টাইমে আইয়া ..

প্রশ্ন: তখন কি সারেন্ডার হয়ে গেছে?

উত্তর: সব শেষ তখন।

আমরা যখন ফেনীর দক্ষিণ সাইডে আসতেছি এক ভদ্রলোক জিপ নিয়া ঘুরতেছে। আমরা খাকি পোশাক দেইখা ডাক দিছে। বলে “আপনারা কোথায় যাবেন?” আমরা বলি, “আলিয়া মাদ্রাসা”। তারপর বলে “গাড়িত উঠেন”। তো এই গাড়িতে কইরা আমাদের মাদ্রাসায় নিয়া আসলো। ওসি সাহবেকে কল করছে পুলিশ আইছে। পুলিশে পাহাড়া দেয় মালগুলা। তো আমাদের দুইজনের থাকা-খাওয়ার একটা

ব্যবস্থা কইরা দিছে। কইছে চাইল, ডাউল কিছুই লাগবে না। টাইমে টাইমে খানা আসবে। আমরা এখানেই রইলাম। এখানে থাকতেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, ঘোষণা হইছে। শহরে আনন্দ মিছিল করে। আমরা তো আর যাইতে পারি না। অনেক পরে বঙ্গবন্ধু আইসা পরছে দেশে, আমরা ওখানেই। পরে থানাতে যাইয়া ওসি সাবরে ধরলাম যে আমাদের গাড়িতে উঠাইয়া দেন, আমরা চইলা যাবো।

উনি ২টা খালি ট্রাক ব্যবস্থা কইরা দিছে। এটিতে আর্মস এনিমেশন একটা গাড়িতে উঠাইলাম। আর চাল, ডাল, ৬টা চেয়ার, একটা আলমারি এগুলা উঠাইলাম একটা গাড়িতে। এইডি নিয়া তখন ক্ষেতে দিয়া গাড়ি চলে ঐ যে ব্রীজ ভাইঙ্গা ফালাইছে। পরে আমাদের এই পিপুলিয়া নিয়া আসছে। তারপর আমাদের গ্রামবাসীরা সব মালগুলা নামাইলো। পরে কইছি যে হাবিলদার সাবের বাড়িতে নিয়া যামু, আমার বাড়িতে দরকার নাই। তো হাবিলদার সাবের বাড়িতে নামাই দিয়া আর্মস সেনিমেশন গুলা আর্মি ক্যাম্পে জমা দিছি। এরপরে প্রথমে ঢাকা গেছি, এরপর ঐখান থেকে জয়দেবপুর গিয়া অস্ত্র জমা দিছি।

আমি আর আসি নাই। আমি ঐখানেই চাকরি করছি। সার্জেন্ট পর্যন্ত হইছি।

কাজী আব্দুল ওয়াহাব- কুমিল্লা

প্রশ্ন: আপনার যুদ্ধের কাহিনীটি আমাদেরকে বলুন।

কাজী আব্দুল ওয়াহাবঃ যুদ্ধ তো যুদ্ধই। আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার কথা ছিল না। আমরা ছিলাম ছাত্র মানুষ। আমরা ছিলাম পরীক্ষার্থী। আমরা দুজন ক্লাসমেট এবং প্রতিবেশীও (আগের ব্যক্তিও)। বাংলাদেশের যুদ্ধটা আসলে ভিন্নতর। যুদ্ধ বলতে, একদেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ যখন হয়; এক দেশের সৈন্যের সাথে অন্যদেশের সৈন্যের যুদ্ধ হয়। কিন্তু এখানে আমাদের বাংলাদেশে যে যুদ্ধ হয়েছে সেটি গণযুদ্ধ। এই গণযুদ্ধের মধ্যে আমরা জনসাধারণ: মা-বোন, মহিলা-পুরুষ, শ্রমিক-ছাত্র, যারা সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে (ভেগে) এসেছে তারাসহ সবাই জড়িত। সেনাবাহিনীতে আক্রমণ করেছে, পুলিশ বাহিনীতে আক্রমণ করেছে, তৎকালীন ইপিআর ব্যারাকে হামলা করেছে, ছাত্রদের ব্যারাকে হামলা করেছে।

সেইসব হামলা থেকে যারা বেঁচে (বাঁইচা) এসেছে তারা এলাকায় ট্রেইনিং শুরু করল।

২৫শে মার্চ আমিসহ এখানকার ছাত্রসমাজ এলাকার জনসাধারণকে নিয়ে বটগাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছিলাম। এই কাজে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে যেটা বলা বাহুল্য। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে তারা সেদিন এসেছিল (আইছে)। কারণ ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন যে, যার হাতে যাই কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। তো এই হিসেবেই ২৫ মার্চে যায়া (গিয়ে) আমরা আঁচ করতে পারছি যে আজকে রাত্রে একটা আক্রমণ হতে পারে। তখন তো আর মোবাইল ছিল না; তবুও দলীয় নেতারা আক্রমণ হতে পারে এমন একটি আভাস পৌঁছিয়েছিল। তা আমরা ছাত্রসমাজ খুব সোচ্চার ছিলাম আরকি। বটের গাছ দিয়ে শুধু নয়, ইট আইনা (এনে) সেই ইট দিয়েও আমরা স্টাইক কইরা লাইছি (করে) ছিলাম রাস্তায়। এজন্য তাদের (পাকিস্তানি মিলিটারির) সামনে এগিয়ে যেতে বেশি সময় লেগেছিল। অর্থাৎ অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ আমরা করলাম তাদের সাথে।

২৫ মার্চের পরে যুদ্ধ লেগে গেল। আমাদের তো অস্ত্রশস্ত্র নাই। একটা কথা আছে না, "ডাল নাই তলোয়ার নাই নিধুরাম সরদার; টাকা নাই পয়সা নাই গজব আলী মোদ্দার"। আমাদের তখন এই অবস্থা; আমরা ছাত্র মানুষ। বন্দুক ধরতে জানি না; ট্রেনিং জানি না। তখন আমার মনে হলো পাকিস্তানিরা কীভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বিভীষিকাময় একটা অবস্থা, একটা মায়ের, একটা মেয়ের; মহিলাদের ওপরে তারা যে আক্রোশটা করল: কী বলব আর। পরের কথাটা আগে বলতেছি যে:- আমি বর্তমানে সদর দক্ষিণ উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডারের দায়িত্বে আছি। আমার তালিকাতে একটা মেয়ে আছে যার কাহিনীটি বাবলু ভাইও জানে (FGD-তে উপস্থিত)। এই এলাকার লালমাই মঙ্গলমুড়াতে মেয়েটির বাড়ি আছিল (ছিল)। এই মেয়ের বয়স ছিল বারো (১২) বৎসর। [আমি কিন্তু পরের কথা আগে বলতে আছি]।

যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবিরা যখন আসে তখন মানুষজনের ভেতরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়, সেটা অন্যরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হইতো। কাকে ফেলায় কে যাবে, কাকে রেখে কে যাবে; এমন দৌড়াদৌড়ি করে চলে যাচ্ছে। মা আছে, চাচি আছে, জেঠী আছে, বড় ভাবি আছে, বড় বোন আছে, সব আছে। এই মেয়েটিকে ভালো সুন্দর

দেইখা (দেখে) বডি-সডি ভালো দেইখা (দেখে) পাঞ্জাবি হায়নার দল এই মেয়েটাকে ধরছে। যারা হানা দেয় তাদেরকে হানাদার বলে; আমি এই পাঞ্জাবিদের হানাদার বলব না, আমি বলব হায়নার দল। এই মেয়েটাকে তারা ধরেছে। সব ভাগি (ভেগে) গেছে গা, মেয়েটা তো রয়ে গেছে একা। তখন এই মেয়েটার বেইজ্জ্বতি করার জন্য চেষ্টা করেছে। যদিও সে নাবালিকা মেয়ে। বেয়োনেট দিয়ে তার গুপ্তাঙ্গ কাইটা (কেটে) সে তো সেন্সলেস হয়ে গেছে। মনের খায়েসকে জুড়ানোর জন্য এই কাজটা তারা করেছিল। যখন সে বেহুস হয়ে গেল, রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল, সব রক্তে ভেসে গেল, তখন তারাও ভেগে গেল এখান থাইকা (থেকে)। নিজেরাই করছে আবার নিজেরাই ভেগে গেল সব। ঐ সময় কিছু সাহসী বাঙালি ছিল যারা মেয়েটাকে নিয়ে গোপনভাবে চিকিৎসা-টিকিৎসা দিলো। বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির জনক, উনি কতো বড়ো সম্মাননা দিয়ে দেশে ফেরত এসে, বীরাঙ্গনা, কতো বড়ো সম্মান এটা। লম্বা ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতার। এই মেয়েটার নাম হলো ফুলবানু। এই রকম হাজারো ফুলবানুকে বঙ্গবন্ধু নাম দিলেন বীরাঙ্গনা। আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তর, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক খেতাব দিলেন; আমাদেরকে দিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধার টাইটেল। তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল এই মেয়েরা, যারা ২ লাখ, ইজ্জত হারাইল মা-বোনেরা। আমরা ক্যান্টনমেন্টে যখন গেছি, তখন আমাদেরকে যে ব্যারাকে যায়গা দিছে, তখন দেখছি শাড়িগুলো কাটা-কাটা অবস্থায় বাঁধা ছিল খুঁটির সাথে। এর কারণ কী? আমরা নিজে পর্যবেক্ষণ করলাম রক্তের ছটা। নির্যাতন এভাবে চলেছে নারীদের ওপর। এই নির্যাতনের প্রতিকার করার জন্য আমাদের মনে ব্রত তখন করলাম। তখন আমি ভারতে চলে গেলাম।

আমি আমার ঘটনা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। আমি সোজা মার্চ করে সোনামুড়া হয়ে হাতিমারা ক্যাম্পে গিয়ে উঠছি। হাতিমারা ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন; ক্যাপ্টেন দিদারুল আলম। ১২/১৪ জন এমন ভাইগা (ভেগে) আসা সেনাবাহিনীর লোক, পুলিশের লোক মিলায় তারা একটা সেকশন করে রাখছেন। আর আমরা যারা ছাত্র, শ্রমিক, দিনমজুর একত্রিত হয়েছি। প্রায় ৩,০০০ লোক আমরা সেই ইউথ ক্যাম্পে অবস্থান করলাম। এখানে থাকতেই দিদারুল আলম সাহেব বললেন কুমিল্লার উত্তরে যে রাজাপুর স্টেশন আছে, সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের পারমানেন্ট একটা ডিফেন্স ছিল; এটি আক্রমণ করব। তো কী দিয়ে আক্রমণ করব? আমাদের তো অস্ত্র নাই; প্রশিক্ষণও নেই নাই। শুধু ৪টা

পজিশন শিখাই (শিখিয়ে) দিছে: standing Position (দাঁড়ায় গুলি করা); লিলিং পজিশন (.. .. .. . দিয়ে গুলি করা); সিটিং পজিশন (বসে গুলি করা); লাইং পজিশন (শুয়ে গুলি করা)। এই ৪টা পজিশন আমাদেরকে শিখাই দিছে। ট্রেনিং সম্পর্কে আর কিছু জানা নাই। এরপর উনি আমাদের ফলোয়িং করলেন, যে যেভাবে পারেন তিনহাত তিনহাত লাঠি বানায় নিয়ে আসেন। কীভাবে বানাবেন জানি না, বানানো (পয়দা করা) চাই; দুই মিনিট সময় দেওয়া হলো। ঠিকই আমরা চারপাশের বন-জঙ্গলের গাছ থেকে ডাল ভেঙ্গে, বাঁশ ভেঙ্গে ওনার কমান্ড মতো লাঠি বানাই। দা কই থেকে আনাব? ওনার কমান্ড তো শুনতে হয়। আমরা প্লাটুন বাই প্লাটুন ভাগ হয়ে গেলাম। ইন সিংগেল লাইন, বাংলাদেশ, গো মার্চ। মার্চ করায় দিলো রাজাপারার দিকে। এই শুরু হলো। বাবুল ভাই (FGD-তে উপস্থিত) যেভাবে বললেন, সেলিংকরা। সেলিংগুলা আয়া পরতেছে (এসে পড়তেছে) আমাদের মধ্যে। একটা ছেলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা। আমরা পানিতে ভেসে গেছি। পানিতে ভেসে যায়া (ভেসে গিয়ে) সামনের যে পাহাড়ের টিলা আছিল, সেই টিলার মধ্যে ছোটোছোটো গাছ গাড়া ছিল। এই টিলাগুলার পাশে পাশে আমরা তিন হাজার ছেলেপেলে অবস্থান নিয়েছিলাম। এই ট্রেন লাইন যেটা রাজাপোর থেকে ঢাকা গেছে সেটার পুবে (পূর্ব পাশে)। তো আমরা পজিশনে গেছি। সারাদিন অনরগল একচেটিয়া গুলি তারাই করছে। তারা ভেবেছে এতো গুলি করা হলো, সন্ধ্যার সময়, তবু সাড়া-শব্দ নাই কেন। আর তাদের অবজারভেশন ফোর্স বড় একটি গাছের উপরে উঠে ফলো করতেছে ভারতের বর্ডারের দিকে। তখন সে নিচে কল করতেছে যে, “স্যার, সবসময়ের বর্ণনা আমি দিছি। কিন্তু আজকের অস্ত্রের বর্ণনা আমি কী দিবো; সবার হাতে কালা-কালা (কালো-কালো) অস্ত্র, ওগুলা কী আমি জানি না।” আসলে সেগুলো লাঠি; দুরবিনে আসছে এমন ভাবে যে কালো অস্ত্র। এই ভয়ে ভীত হয়ে দুনিয়ার গুলি তারা উড়াইছে সারা দিন। তো সন্ধ্যার পরে আমরা তো কিছু খাই নাই। সেই সকাল-ভোরে এইখানে আসা। রাত প্রায় আটটা; অন্ধকার হয়ে গেছে, তখন গুলিটা স্থিমিত হয়ে পড়েছে।

আমার এক বন্ধু, এক রণাঙ্গনের সাথি, আজম করে নাম ছিল। বাড়ি মনে হয় হাজীগঞ্জের চাইর..., যদি বেঁচে থাকে তো রইল, আর না হলে তো নাই। সেই আজম একটা বাঁশি দিয়েছিল যে, “আমি তিনটা বাঁশি দিবো- একটা বাঁশি দিয়ে আপনাদেরকে স্মরণ করাইলাম আমাদের কেহ নাই। আমাদেরকে আগুনের মধ্যে

ফেলে দিয়ে উনি (দিদারুল আলম) চলে গেছেন।" আসলেই চলে গেছেন উনি। আমাদের তো হাতে অস্ত্র নাই। আশপাশ থেকে কোনো আর্মিবাহিনী যদি বেয়োনেট নিয়ে আসত, তাহলে মাছ যেভাবে ধরে সেইভাবে আমাদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে পারত বেয়োনেট দিয়ে; এই তিন হাজার ছেলেকে। কিন্তু তারা ভেবেছিল আমরা অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে নেমেছি। ভাববেই না কেন, আমরা তো তাদের বোগলে (কাছে) চলে গেছি; একদম তাদের টার্গেটের ভেতরে চলে গেছি। এভাবেই ছিলাম আমরা। এটা আমার ট্রেনিং-এর আগের অভিজ্ঞতা।

এরপর ক্যাম্পে গেলাম রাত্রে। আরও কয়েকদিন গেছে। তখন ভারতীয় এক কর্নেল সাহেব, কর্নেল ওমর বাগচী; উনি আসলেন। তখন আমাদেরকে রিক্রুট করার জন্য এই তিন হাজার ছেলের থেকে দেড়শ মাত্র আমরা টিকেছি। ওনার সিলেকশনে। উনি আমাদেরকে সিলেক্ট করলেন। এরপর দিন গেল, তারপর ভারতীয়দের একটা ট্রাকে আমাদের নিয়ে গেল লোহারবন। আমরা ভৌগোলিক বিবরণে শুনেছি লুসাই পর্বতমালা পার হয়ে লোহারবন। সেইখানে আমি গেছি। আমার ভাগ্যের পরিহাস হোক আর যাই হোক, আমার তো এরাদাই (উদ্দেশ্য) ছিল মরণ খাতায় আমি নাম লিখিয়েছি। বাড়িতে ফেরার আর কোনো আশা করি না। (কান্না)। এটি মনে করিয়ায় (করে) তো আমি নাম দিয়া আছি। এজন্যই লোহারবন ট্রেনিং-এ গেছি। সেখানে ৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাপে কেটেছে। দুই জনকে মাটিতে গর্ত করে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে; একজনকে বাঘে নিয়া গেছে। এতো গহীন জঙ্গলে। এটা থেকে বাহির হবার কোনো কায়দা নাই। শোয়ার জায়গা করছে গলা পর্যন্ত মাচা করে যেটাতে আমরা ঘুমাতাম। যাইহোক, ট্রেনিং শেষ করছি। একমাসের ট্রেনিং এক সপ্তাহে করছে; এক বছরের ট্রেনিং এক মাসে করছে। তারা মানে আমরা এক মাস বা তার ওপারে কিছু সময় গেরিলা ট্রেনিং করেছি।

আশফাক হোসেন: তখন কোন মাস ?

উত্তর: যুদ্ধের সময় আমরা যোদ্ধা। তখন ক্যালেন্ডার বা তারিখ আমাদের স্মরণ থাকার কথা না। যুদ্ধ শেষ করে আমি, অন্তত আমরা ১০৩ জন আমরা কুমিল্লার দেড়শ জনের মধ্যে ৪৭ জন সিলেটের দিকে গেছি। আমরা কত স্ট্রাগল করে আসছি। আমাদের টার্গেট ছিল আমরা আগরতলা সেক্টরে যাবো। আগরতলায় এসে সেখান থেকে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিল মেলাগড় (মেলাঘর)। মেলাগড় আছিলাম

কয়েকদিন। মেলাগড় থেকে গেলাম কাঁঠালীয়া। কাঁঠালীয়াতে আসার পরে আমাদেরকে অস্ত্র বরাদ্দ করা হলো। যার যে অস্ত্র, রাশিয়ান অস্ত্র। আমার দোস্ত কাজী .. .. (FGD-তে উপস্থিত) বললেন এসলার সেল্ফ লোডিং রাইফেল যেটা নিজে নিজে লোড হয়। নিজে নিজে যখন লোড হয়ে যাবে আপনি সিংগেল শট করতে পারবেন। আর একটা আছে টু-থ্রি। এগুলো ব্রাস্ট হয়। আর যেটা সিংগেল সেটা তো সিংগেল শট ফায়ার হয়। আবার এলএমজি লাইট মেশিনগান এগুলো ছিল। আর এসএলআর এবং স্টেনগান যেটার আরেকটা নাম আছে কার্বন। এগুলো আমরা অস্ত্র পাইছি; গ্রেনেড পাইছি। যথেষ্ট অস্ত্র পাইছি। এরপর বলা হলো একজন গেরিলা একজন কমান্ডার, একজন গেরিলা একজন ইউনিট; আপনারা যে যেভাবে পারেন যুদ্ধ তো যুদ্ধই। আপনারা যুদ্ধ করেন; বাংলাদেশে দুইকা যান। না হলে মইরা যান-এটা তখন আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র সব দিয়ে দিলাম। তখন আমরা বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করলাম। আমার এলাকার সীমান্তে আইসা (এসে) একটা জাগাতে (জায়গাতে) অবস্থান নিলাম এক বাড়িতে। সেখান থেকেই আমরা আপারেশনে আসি। পাঞ্জাবিরা চলেছে দিনেরবেলা রাস্তা দিয়ে। আর আমরা নিশাচরের মতো কাজ করেছি। তারা যে পথে চলেছে আমরাও সেই পথেই চলেছি। চলছি এই ভেবে বুকে বল রেখে যে হাতে তো অস্ত্র আছেই; অস্ত্র যখন থাকবে না তখন না হয় মরণ আসবে। যুদ্ধ করেছি সময় সময়। যুদ্ধ হয়েছে খণ্ড খণ্ড আমাদের সাথে। আমরা যুদ্ধ করেছি খনছতলাতে ....। আমাদের গ্রুপের সাথে রাতেরবেলা মুখোমুখি হয়ে গেল চুয়াড়া ক্যাম্পে। এখানে মুখোমুখি হওয়াতে খুব গোলাগুলি হয়েছে। কয়েকজন রাজাকার মারা গেছে। একজন চিহ্নিত রাজাকার, সুলতানপুরে বাড়ি। যে পাঞ্জাবিদের সাথে ছিল; মারা গেছে। এমন খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ আমি করেছি। লাস্ট যেটার কথা বলব সেটা হলো আমাদের এদিকে সোহাগাজী বাজারের যুদ্ধের কথা। এই সোহাগাজী বাজার আক্রমণের জন্য আমরা পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা করার পরে আমি .. .. .. । মধ্যখানে আরেকটা কথা বলি, ভারতীয় বাহিনীর সাথে আমরা কম্বাইন যুদ্ধ করেছি। ভারতীয় বাহিনীর সাথে যৌথভাবে মিলিয়ে আমরা অপারেশন করেছি রাতে। এখন এই সোহাগাজীকে উড়ানোর জন্য তখন দুইমুখী আক্রমণ করা হয়। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পাশে; পাশ্চিম দিকে ফায়ার। আর ভারতীয় বাহিনী যারা, তারা দক্ষিণ পাশে, উত্তরে দিকে ফায়ার। তো দ্বিমুখী ক্রস-ফায়ার। ক্রস-ফায়ার কাকে বলে? এটিই ক্রস-ফায়ার। একটা এসেছে দক্ষিণ দিকে থেকে উত্তর দিকে; আর আমাদের গুলি গেছে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে। তাহলে এটি ক্রস হয়া (হয়ে) গেল। এক-দুই ঘণ্টার

সাড়াশি অভিযানে ইনশাল্লাহ সোহাগাজী বাজারকে আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। পাঞ্জাবিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অপ্রিয় হলেও সত্য এটা যে, মানুষ মরে গেলে মানুষের মাথার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলা দুঃখজনক। কিন্তু শত্রুর মাথার খুলি দিয়ে আমাদের ছেলেপেলেরা তা করেছে। লাশ পড়েছিল সোহাগাজীর বুকে। এখানে দুইটা বটগাছের মাঝে তখন একটা পুল আছে যেটার কথা উনি (আগে একজন বলেছেন) বললেন, সেখানের নিচে পড়েছিল সাত-আট জন পাঞ্জাবির লাশ। ভয়ে মানুষজন ধারে-কাছে আসেনি। শিয়াল-কুকুরে খেয়েছে রাতের বেলা; দিনে পাখি-কাক-শকুনে খেয়েছে। হাড্ডি থেকে মাংস পর্যন্ত খেয়ে কঙ্কাল পড়ে রয়েছিল। পরে মাথাটা দেহ থেকে খুলে গেছে। পোলারা তা দিয়ে বল খেলেছে।

এই হলো আমার যুদ্ধের সময়ের জীবনের খুবই সংক্ষিপ্ত কথা। আমার জীবন সার্থক। বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আমার সার্থকতা এটাই যে, ঘরে ঘরে নয় আমি এলাকাতে সোহাগাজীর বুকে একটা ক্যাম্প করতে পেরেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ করতে পেরেছিলাম। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় বাংলা ... বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সিরাজুল ইসলাম, আর্টিলারি অফিসার (কুমিল্লা)

ভাই ভাইয়ের উপর গুলি চালাবে তা আমরা জানতাম না। যদি আমরা জানতাম তাহলে পাকিস্তান আমাদের কাছে আসতে পারেনা। তারা গুলি দিয়ে ভয় দেখিয়েও আমাদের কাছ থেকে কোনো তথ্য বের করতে পারেনি। যদি বের করতে পারত তাহলে আমাদের রহিম...।

আমরা ছিলাম সৈয়দপুর, রংপুর (থার্ড বেঙ্গল)। সমস্ত ক্যান্টনমেন্টে তারা একসাথে রাতে হামলা করেছিল।

প্রশ্ন: সৈয়দপুরে কী হয়েছিল? ঐখানে কতজনকে পাকিস্তানিরা মারল?

উত্তর: ... ঐখানে আমরা মরি নাই। আমাদেরকে মারতে পারে নাই। আমাদের সকল অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। যত অস্ত্র, গাড়ি যা ছিল তা সবকিছু নিয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন: কী বলেছিল? অস্ত্রটা দিয়ে দেন?

উত্তর: না। আমরা তাদের সাথে লড়াই করে ভাগছি। ...

উসমানী সাহেব ছিল আমাদের কমান্ডার। সেখানে যুদ্ধ করে তাদের সাথে বেশি কিছু পারা যাবে না। সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যেত। এখান থেকে লড়াই করতে করতে পরে আমরা বেঙ্গলেতে পড়ছি। ফাস্ট বেঙ্গল, সেকেন্ড বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গল। তখন আমাদের কমান্ডার ছিল সাফায়েত জামিল। সে খুব ভালো লোক ছিল। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ছিল আকবর সাহেব। তিনি ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। আমি ছিলাম ড্রাইভার। আমি থার্ড বেঙ্গলে যাওয়ার পর থেকে অফিসারদের সাথে ড্রাইভারি করা শুরু করেছি।... আমাদের কাজ ছিল কখন, কোথায় থেকে ফায়ার করবে, কী করবে সবকিছু ব্রিফ করা। পরে একইভাবে দেশ স্বাধীন করলাম। পরবর্তীতে সিলেট আসলাম।

প্রশ্ন: সিলেট তখন কার গাড়ি চালাতেন?

উত্তর: আমি নিজে গাড়ি চালাতাম। অফিসার ছিল সাফায়েত জামিল।

প্রশ্ন: অফিসারদের ডিউটি করতেন আপনি?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: যুদ্ধ দেখেছেন আপনি?

উত্তর: যুদ্ধ তো আমাদের সামনেই হয়েছে। কেউ ...

প্রশ্ন: হাসপাতাল ছিল কোথায়?

উত্তর: হ্যাঁ ছিল। মেলাগঞ্জসহ আরো বিভিন্ন জায়গায় ছিল। সকল জায়গায় ছোটো ছোটো ক্যাম্প ছিল রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। আমাদের (আর্মির্তে যারা ছিল তাদের সবার কাছে) কাছে কিছু ঔষুধ থাকত।

প্রশ্ন: খাওয়া-দাওয়া কীভাবে হতো?

উত্তর: যা পাইতাম তাই খাইতাম। উসমানী সাহেব যখন ছিলেন .....

প্রশ্ন: একাত্তর সালে উসমানী সাহেবকে দেখেছেন?

উত্তর: আমাদের সাথেই তো ছিল। আমরা আর্মির লোকদের সাথেই থাকত।

প্রশ্ন: ঐসময় আর্মির বড়ো বড়ো অফিসারও তাদের পরিবারদের সাথেই তো থাকতেন? কোনো স্মৃতি মনে আছে?

উত্তর: আমি থাকতাম বর্ডারে। ..... আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আমরা ভাত থেকে ধরে সব পেয়েছি। বেতনও দিয়েছে আমাকে। আমি সম্ভবত ৮২/- টাকা বেতন পেয়েছি। .... আমার বাবাকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম যুদ্ধের সময় যে বাবা দেশের অবস্থা তো ভালো না। আমার বাবা, মাকে এখানে ধরে নিয়ে আসছে। রাজাকারেরা পাকিস্তানিদের আমার বাড়ি-ঘর দেখিয়েছে। এবং পরে তা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন: রাজাকারদের নাম মনে আছে?

উত্তর: না।

জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার বাড়ি-ঘর। আরো অনেক ঘটনা আছে। আমি কারো উপর অত্যাচারও করিনি, বদলা নেইনি। রাজাকারদের তালিকা আমরা চাই। যদি আপনার কোনো অপশন থাকে তাহলে রাজাকারদের তালিকা করেন। আমি সিলেট থেকে কুমিল্লা-ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ....

প্রশ্ন: অবসরে গেলেন কবে?

উত্তর: ১৯৮৯ সালে।

প্রশ্ন: এখনও পেনশন পান?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: কমান্ডার স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন- স্যার আপনি তো এই এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। আপনার পরিবারের সাথে কী তখন যোগাযোগ হতো?

কমান্ডার

চট্টগ্রাম গ্রান্ট রোডের পূর্বপাশে যত মানুষ পশ্চিমে চলে আসছে। আমার বাবা-মা জীবিত ছিল ঠিকই, কিন্তু কোথায় ছিল তা আমার জানা ছিল না। ঐটা জানতে

গেলে তো আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। আমার বুকের ভেতরে তো প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। দেশ মুক্ত হওয়ার পরে মায়ের কাছে গিয়েছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড, কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত, বর্ডার পর্যন্ত দুই কিলোমিটার, পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত মতো লোক ছিল বাংলাদেশি, পাকিস্তানি সব এইদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐপাশ খালি করে দিয়েছে।

প্রশ্ন: রাস্তার ঐপাশে তো ইন্ডিয়া, পাকিস্তানিরা ঐদিকে পুশ করছে আর সকল মানুষ এইদিকে চলে আসছে? তাই তো?

উত্তর: সকল বসবাসকারী ৭-৮ মাস আমাদের এইদিকেই ছিল। এখানে সচরাচর যারা .... তারা যাওয়ার কথা ছিল ভারতে। কারণ যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ছিলেন আশরাফ আলী, ওনাদের নাম ব্যবহার করেও অনেকেই নিজেদের মাঝে একটা শক্তি সঞ্চয় করে যে, ওনাদের নাম ব্যবহার করলে পাকিস্তানিরা ওনাদের আক্রমণ করবে না, এরকম একটা ধারণা ওনাদের মাঝে ছিল। অনেক সময় পাকিস্তানিরা এও বলেছে যে এই স্থানে পাকিস্তানিদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ হবে এবং মুক্তিযোদ্ধারা এখানে এসে গোপন ক্যাম্প করে আশ্রয় নেয়। এজন্য সব খালি করে দেয়।

এই এলাকা বাফার জোন হিসেবে ব্যবহার করে। যুদ্ধের একটা কৌশল হিসেবে। কিছু আত্মীয়-স্বজনের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিছু ইন্ডিয়াতেও চলে গিয়েছে।

শহিদ আব্দুল শুকুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা

আমি সেনাবাহিনী থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

প্রশ্ন: তখন সেনাবাহিনীর কোন পদে ছিলেন আপনি?

উত্তর: সিপাহি পদে।

প্রশ্ন: কোন ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আমি সোয়াগাজী এলাকায় পাকসেনাদের সাথে ট্রেনিং করেছি। পাকিস্তানিরা যে-কোনো সময় ভারতের সাথে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে বিধায় পাকিস্তানিরা (বাংলাদেশের যুবকদের) সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

প্রশ্ন: আপনি নিয়মিত সৈনিক ছিলেন, না পরে হয়েছেন?

উত্তর: এটা পুরোপুরি সেনাবাহিনীর ট্রেনিং। মুজাহিতদের ট্রেনিং দিয়েছে ঠিক আছে। কিন্তু নিয়মিত সেনাবাহিনী অন্য আরেকটা।

প্রশ্ন: আপনি মুজাহিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যুদ্ধ শুরু হলে আপনি সেনাবাহিনীতে ঢুকে গিয়েছেন। তাই তো?

উত্তর: হ্যাঁ। তারপরে ২রা মার্চ রাতে যখন আক্রমণ করে সেনাবাহিনীর প্রহরীদার ও বর্ডার গার্ডসহ যারা ছিল সবাইকে বের করে দিয়েছিল। এরপরে এলাকায় ঘুরতাম, এলাকার নমুনা, হাল-অবস্থা দেখতাম। এরপরে এক মাস পরে বুঝেছি এখানে আর থাকা যাবে না...... পাঞ্জাবিরা আমাকে খুঁজছে। এরপর ভারতে গেছি। সেখানে বিএসএফ ক্যাম্পে জলিল নামে আমার এক ফুফাতো ভাই ছিল। জলিল সাহেব আমাকে এক সার্টিফিকেট দিছিল (দিয়েছিল)। মুজাহিতের সার্টিফিকেটটা নেই। এখান থেকে গেছি বারমুড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে সার্টিফিকেট (ক্যাপ্টেন মামুন সাহেব সার্টিফিকেট দিয়েছিল সিল মেরে) দিলো। এখানে ২-৩ দিন ছিলাম। ঐখান থেকে আবার ট্রেনিংও নিয়ে আসছি ফাঁকে দিয়ে ছাত্র থাকাকালে। রাইফেল, গ্রেনেড......।

এখান থেকে নিয়ে গেল আঁগরতলা দুর্গ - চৌধুরীপাড়া। এখান থেকে নিয়ে এলো ইয়ুথ ক্যাম্পে। এখানে মাস-পনেরো দিন থেকে আবার নিয়ে এলো মেলাঘর। মেলাঘরের এক লোক তাকে দেখে বলে 'তুমি এতদিন পর কোথা থেকে এসেছ? ওকে চোখ বাধা।' আমাকে একটা বাসন, কম্বল, মগ, দিয়েছে। ঐদিন রাতে অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে রইলাম। এরপর দিন সকালে বড়ো বড়ো ট্রাক এনে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ঐখানে ট্রেনিং নিয়েছি। এর মাঝে ঐ ভারতের এক পাঞ্জাবি, হিন্দি ভাষা বলে আমাকে গালি দেয় কারণ ...... এর মাঝে কিছু অফিসার আসলো ভারতীয়। প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। সে আমাকে গালি দিলো কেন? আমি তাকে বলি।

এখানে মাস-খানেক থাকার পর আমি গেলাম আগরতলা মনতলা। এখানে এক মাসের মতো ছিলাম। ক্যাপ্টেন হারুন-অর-রশীদ ছিল সেনাবাহিনীর মেজর/আইনুদ্দীন সাহেব ছিল মেজর কমান্ডার। সুবেদার আগেয়ার, জলীল, সিরাজ, নুরুল হক স্যার ছিল।

পরিশিষ্ট: ৪

অনুলিখন: নরসিংদীতে গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ

(স্থান: নরসিংদী, তারিখ: ০২-১২-২০২৩)

১। ডা. কালু

আচ্ছা, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের এই গ্রামের কী অবস্থা তখন?

কালু মিয়া: আমাদের এই আলোকবালী গ্রামটা তো শহরের থেকেটু বিচ্ছিন্ন, নির্জন এলাকায় পড়েছে। কেন্দ্রবিন্দু তো হইলো নরসিংদী শহরে। নরসিংদী থেকে মেঘনা নদী দিয়া এদিক-ওদিক যাইতো। একবার আমাদের এলাকায় সেনাবাহিনীসহ একটা জাহাজ আটকা আসছিল। হয়তো আমাদের এলাকায় ঢুকত। তখন আমাদের এলাকার সব মানুষজন নিজেদের ধান-চাল, আসবাবপত্র যে যেইটা পারছে নিতে, এসব নিয়া গিয়া বড়ো গর্ত কইরা লুকাই আছিল। অনেক মালামাল তো, কেমনে নিব? এই কারণে এমন করছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কি রহমত টেকের যে তালের গাছ, এখানে আইসা জাহাজ লাইগ্যা গেছে। তখন তো আর এই জাহাজ আসতে পারছে না। পরে দুই-তিন জাহাজ আইয়া এই জাহাজ ছুটাইয়্যা লইয়া গেছে। কিন্তু আমাদের এলাকায় আর কোনো গণ্ডগোল হয় নাই। কিন্তু আমাদের এলাকায় ট্রেনিং হইছে। আমরাই কাজীরকান্দী ট্রেনিং করছি, আলোকবালী ইস্কুলে ট্রেনিং করছি, নরসিংদীতে ট্রেনিং করছি। ঐ নদীতে আমরা টহল দিছি যাতে নদী দিয়া যদি কেনো পাকিস্তানি জাহাজ আসার চেষ্টা করলে আমরা গুলি দিয়া যাতে তাদের জাহাজ ডোবাই দিতে পারি। আমরা অনেক চেষ্টা করছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনারা যে লুকাইতেন, এটা কি ভয় থেকে? ওরা তো আসে নাই।

কালু মিয়া : না আসে নাই, পাঞ্জাবিরা আমাদের এলাকায় আসে নাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কখনো তাদের দেখেছেন, দলবেঁধে অন্য কোথাও যেতে দেখেছেন?

কালু মিয়া: না। আল্লাহ ভালো রাখছিল। পাঞ্জাবিরা আমাদের এলাকায় উঠে নাই। পুরা ইউনিয়নে উঠে নাই।

প্রশ্নকর্তা: এই আতঙ্কের মধ্যে আপনাদের জীবন স্বাভাবিকভাবে চলেছে?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম চলত। তবে এই বাড়িরই গনি চেয়ারম্যানের আব্বা কিন্তু তখন নরসিংদীতে কাপুইরা পাড়াতে থাকত। হেরার মালামাল আনতে গেছি আমরা। হেরার বাসা-বাড়ির জিনিসপত্র বাড়িতে আনতে গেছি আমরা। যখন বোমা ফালাইতেছিল, আমরা তখন নরসিংদী। এই হইল কাহিনি। কিন্তু এমন কোনো কাহিনি হয় নাই আমাদের এলাকায় যে এখানে আক্রমণ করছে।

প্রশ্নকর্তা: ওই বছর তো ইদ হয়েছিল তখন কি সব স্বাভাবিকভাবেই পালন করতে পেরেছিলেন?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই পালন করছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা খাওয়া-পড়া কীভাবে চলত? বাজার বসতো নিয়মিত?

কালু মিয়া: বাজার-টাজার তো না। যখন সংগ্রাম ইয়া হয়ে গেছে, তখন বাজারের দাম তো আগুন। আমরা নিজেরাই যদি সারাদিন কল (তাঁত) বুনলেও পাইতাম কত? মাত্র ৮/ ৯ টাকা। তখন বাজারে গেলে কি কিনব কি কিনব না? পান আনলে লবণ নাই, লবণ আনলে পানি নাই। তারপরে মানুষ কী করতো; গাছে যে লাউ ধরত, কদু কয় ওটারে, ওই লাউ দিয়া আলু দিয়া জাউ রানত। মানে কোনোমতে জীবন আর কি। আমাদের এলাকায় গিরস্তি করতো তো।

প্রশ্নকর্তা : অন্য এলাকা থেকে আপনাদের এলাকায় এসেছিল কেউ আশ্রয়ের জন্য?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, আসছিল তো।

মুক্তিযোদ্ধারা অন্য এলাকা থেকে আসছিল। আর ঢাকার লোক তো আইসাই পড়ছে। যেমন শাজাহান কাকারাই তো আইসা পড়ছিল। জাহাঙ্গীর কাকা তো তখন এমএ পড়ে। ওই এমএ পরা অবস্থায় আইসা পড়তে হইছে।

প্রশ্নকর্তা: তাদের কাছ থেকেও তো ঢাকা সম্পর্কে জেনেছিলেন?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরাও তো দেখতাছি, জানতাছি সবই।

প্রশ্নকর্তা: খবর কীভাবে শুনতেন? রেডিও ছিল?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, রেডিও তো ছিলই। শহরের যারা ছিল, গ্রামে বাড়ি সব চলে আসছিল গ্রামে।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের বছর আপনাদের গ্রামের স্কুল কলেজ কি খোলা ছিল?

কালু মিয়া: যখন সংগ্রাম লাগছে তখন তো বাচ্চাদের মনে ভয়-ভীতি ডুকছে। কেউ যায়, তো কেউ যাইত না এরকম অবস্থা ছিল আর কি।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের গ্রামের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন ছিল?

কালু মিয়া: আমাদের গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে মোটামুটি খায়া-পইড়া বাঁচছে। কিন্তু অগাধ পরিশ্রম করতে হইছে।

প্রশ্নকর্তা : যুদ্ধের বছর ফসল তুলতে পেরেছিলেন আপনারা?

কালু মিয়া: হ্যাঁ, পারছিলাম তো। সবাইতো জমি করতো। আমার বাবা-জেঠারা ব্যবসা করতো নৌকার। বড়ো নৌকা দিয়া পাট বেঁচতে আমরা নারায়ণগঞ্জে গেছি। আমিও গেছিলাম সাথে। তখন গজারিয়ার মইশারচূড়ার কাছে গিয়ে দেখি আমার জ্যাঠার বড়ো দুইটা নৌকাভর্তি পাঠ প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো মণ পাট আমাদের চোখের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে ওই পাট বোঝাই নৌকার মধ্যে আগুন লাগায় দিছে।

প্রশ্নকর্তা : কে দিয়েছিল আগুন?

কালু মিয়া: এইসব করতো রাজাকাররা। ওরাই আগুন লাগায় দিছে। আমার জেঠা তখন পাগলপারা হইয়া গেছিল। আমাদের এলাকার ৯জন মানুষরে গুলি কইরা

মাইরা ফালাইছিল, আশুগঞ্জে ওরা নৌকা করে চাল আনা-নেওয়া করতো। তখন ওদের নৌকা নিয়া ওদেরকে মাইরা ফালাইছে।

প্রশ্নকর্তা : বিজয় দিবসের সময়কার কথা মনে আছে কিছু? আপনাদের গ্রামের পরিস্থিতি তখন কেমন ছিল?

কালু মিয়াঃ ঐদিন ইন্ডিয়ার বিমান জোনাকির মতন জ্বলতেছিল। আর আমরা রেডিওতে রাতে শুনছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হইছে। খুশি হইছি আমরা সবাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের গ্রামের কেউ তখন পড়ত বা চাকরি করতো?

কালু মিয়াঃ না না, আমরা তখন শুনি নাই এত নাম-ডাক।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ওই বছর গ্রামের অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে, গ্রাম্য মেলা এগুলো কি হয়েছিল?

কালু মিয়াঃ সংগ্রামের বছর তো আসলে বিয়েশাদির তো মাইনষের খবরই ছিল না। এরকম চিন্তাধারাই খুব কম করছে।

২। বাচ্চু মিয়া

প্রশ্নকর্তাঃ যুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

বাচ্চু মিয়াঃ আমার বয়স তো তখন ১৭-১৮। আমরা কৃষি কাজ করতাম। আর আমি টুকটাক ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথায় করতেন? কোন কোন এলাকায়?

বাচ্চু মিয়াঃ ধীরাই, সাস্তা এসব এলাকায় গেছি। আমাদের বাংলাদেশের লোকেরা তো ইন্ডিয়া গিয়া ট্রেনিং নিছে। আর পাঞ্জাবিরা তো মাত্র নয়মাস ছিল।

প্রশ্নকর্তা : এই সময়টাতে আপনাদের কেমন লেগেছিল? ভয় ছিল?

বাচ্চু মিয়া: হ্যাঁ, ভয় তো পাইছিই। আমরা তো ওই সময় নৌকা দিয়া যাতায়াত করতাম। আমাদের এই পাড়ার মধ্যে মোটামুটি পাটের ব্যবসা, ধানের ব্যবসা, আলুর ব্যবসা করার জন্য ধীরাই-এর দিকে যাইতাম সবাই। আমরা তো মুক্তিবাহিনীর খাবার নিয়াও গেছি। তবে আমাদের এলাকায় মোটামুটি মুক্তিবাহিনী কমই ছিল।

প্রশ্নকর্তা: রাজাকার ছিল?

বাচ্চু মিয়া: ওই সময় এগুলা মানুষ বুঝেই নাই। কি করলে যে কি হবে কেউই তেমন কিছু বুঝে নাই। এখনকার ছেলে-মেয়েরা যত বুঝে সব বিষয়ে, আমরা তত বুঝতাম না।

প্রশ্নকর্তা: বিভিন্ন জায়গায় যে নৌকা নিয়ে যেতেন, পাকিস্তানিদের সামনে পড়েছেন কখনো?

বাচ্চু মিয়া: হ্যাঁ হ্যাঁ, কয়েকবারই তো। আমরা চুপ করে থাকতাম। আমাদের ভাষা ওরা বুঝত না, আমরাও ওদের ভাষা বুঝতাম না। পাঞ্জাবিদের সাথে যে সকল বাঙালি থাকত, ওই রাজাকাররা নানান সময়ে টাকা পয়সা নিতো আমাদের কাছ থেকে।

প্রশ্নকর্তা: মুক্তিবাহিনীর জন্য যে খাবার নিয়ে যেতেন, সে সম্পর্কে কিছু বলেন।

বাচ্চু মিয়া: আমরা নিয়া যাইতাম মাঝেমধ্যে। তবে ওরা নিজেরাও রান্না কইরা খাইত।

প্রশ্নকর্তা: সেবারের ইদের কথা মনে আছে?

বাচ্চু মিয়া: ওটা মনে নাই তেমন। কত আগের কথা এটা।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের এলাকায় ছেলেরা মিলে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল, তাদেরকে এলাকার মানুষ কেমন চোখে দেখত?

বাচ্চু মিয়া: আমাদের এলাকার লোকেরা ভালো চোখেই দেখত। সবাই তো ঠিকই কইতো।

প্রশ্নকর্তা: বিজয় দিবসের কথা কিছু মনে আছে?

বাচ্চু মিয়া: কত তারিখ তা তো বলতে পারব না। তবে আমরা শুনছি, পরে অনেক খুশি হইছি। পাঞ্জাবিরা হাইরা গেছে আর আমরা জিতছি।

৩। সওদাগর

প্রশ্নকর্তা: আপনার বয়স তখন কত ছিল?

সওদাগর: তখন আমার বয়স ৫০-এর নিচে হবে না।

প্রশ্নকর্তা: এখন আপনার বয়স কত?

সওদাগর: এখন ১০১ থেকে ১০২ বছর।

প্রশ্নকর্তা: তখন এলাকার অবস্থা কেমন ছিল? আপনারা তো ভয় পেতেনই?

সওদাগর: যে সময় পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছে, তখন এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন রেজন চৌধুরী। তখন তার বাড়িতেই আমি বেশিরভাগ সময় থাকতাম। নরসিংদী থানার হেডকোয়ার্টার ছিল মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার। হারু, কাশেম, আরাফাত, গণেশ, এখানকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। নরসিংদীর বাচ্চু নারায়ণগঞ্জে চাকরি করতো। উনি প্রথম ভারতে গিয়েছেন। উনি ভাটি এসে তালিকা করেছেন কোন কোন জায়গায় আসবে। মুসাপুর পর্যন্ত এসে পরে বাঁশবাড়ী, পরে আলোকবালী, পরে আমার বাড়ি এসেছে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে। পরে এসে আমাকে বলে। আমার ঘর হলো তখন রাস্তায়, যেখানে আমি তাদের থাকতে দেই। কিন্তু একজন এসে বাধা দেয় যে এখানে তারা থাকতে পারবে না। কিন্তু অনেক কষ্ট করে আমি তাদের এখানে থাকতে দেই। প্রথম যে সিভিল পোশাকে দলটি এসেছিল, আমি তাদেরকে নারায়ণগঞ্জে পাস করেছি। এর নাম ছিল বাচ্চু, যিনি ১৮জন লোকসহ এসেছিল এবং আগের দিন এসে আমার এখানে ছিল। রাত্রে একটার সময় সোহরাওয়ার্দী ও পরে গোপালওয়ার্দী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসছি। এই দলটা প্রথম গিয়ে পাকবাহিনীর সাথে টুকটাক যুদ্ধ করেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের এলাকা তখন কেমন ছিল, আপনাদের পরিবারে তখন কে কে ছিলেন?

সওদাগর: আমার পরিবারে ছিলাম আমি, আমার মা, স্ত্রী এবং আমার ছেলে ছিল হারুন এবং মোজাম্মেল।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তখন কাজ কী করতেন?

সওদাগরধ: আমি ১৯৬২ সালে প্রথম ইউনিয়নের মডিফাই ডিলার ছিলাম। তখন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছে কোনো কাজ ছিল না। আমাদের মাল দিয়েছে এবং আমরা মাল এলাকার মাঝে বিক্রি করেছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কত বছর ডিলার ছিলেন?

সওদাগর: আমি ডিলার ছিলাম অনেকদিন পর্যন্ত। পাঁচ বছর ছিলাম বাহার মিয়া চেয়ারম্যানের আমলে।

রেজনের সময় ছিলাম দেড় বছর।

প্রশ্নকর্তা: আপনার তো ডিলারের কাজে বাহিরে যাতায়াত ছিল।

সওদাগর: হ্যাঁ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ছিল।

প্রশ্নকর্তা: পাঞ্জাবিরা আপনাদের তখন ধরেনি?

সওদাগর: কতবার ধরেছে! হিসাব নাই।

প্রশ্নকর্তা: কী করেছিল তখন?

সওদাগর: তখন নরসিংদী আমরা পাটের ব্যবসা করতাম। নরসিংদী পাটের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা নারায়ণগঞ্জ যেতাম। নারায়ণগঞ্জ নৌকা নিয়ে বৈদ্দার বাজার গেলে পাকবাহিনী তাদের ধরত। তখন তাদের ২০ টাকার উপরে না, দশ টাকার নিচে না, টাকা দিতে হতো। যখন তাদের কাছে দশ টাকার নিচে, টাকা একেবারেই নাই বলা হতো, তখন দশ টাকা নিয়ে তাদের গালে একটা থাপ্পড় (চটকনা) দিয়ে বলতো, "যা শালারা।" আসার সময় খালি নৌকা আবার ধরছে। তখন আবার দশ টাকা দিতে হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: আসা-যাওয়ার মাঝে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি?

সওদাগর: না। মাঝে মাঝে মুক্তিবাহিনী পাটের নৌকার মাঝে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: কারণ?

সওদাগর: কারণ হচ্ছে এটা তো তাদের বিপক্ষে। তাদের কথা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ করো, যাতে করে পাকবাহিনীকে ঘায়েল করা যায়।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের পরিচিতির কারো নৌকায় মুক্তিবাহিনী আগুন লাগিয়েছিল কি?

সওদাগর: না।

প্রশ্নকর্তা: এই এলাকায় কি অন্য এলাকা থেকে কেউ আশ্রয় নিতে আসছে? ঢাকা থেকে কেউ আসতো আশ্রয় নিতে?

সওদাগর: যারা ঢাকায় থাকতো, তাদের বেশিরভাগই তো চলে আসছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা এতগুলো মানুষ, কীভাবে খাওয়া-দাওয়া চলত?

সওদাগর: যে মানুষগুলো আসছে, সবগুলো মানুষের বাজার করছি আমরা। এখানে টেঙ্গী ছিল। আর যারা ইন্ডিয়া থেকে আসছে, সবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমরা। আমরা মনে করছি, তাদের কাছে টাকা নাই। কিন্তু তারা যে ভারত থেকে টাকা নিয়ে আসছে সেটা আমরা জানতাম না। তাদের সম্পূর্ণ খরচ আমরা বহন করছি। আমাদের অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: তখন কৃষিকাজ কি চলতো?

সওদাগর: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন সে খবরটা কীভাবে পেলেন?

সওদাগর: যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন বাংলাদেশের চতুর্দিকে লোক এগিয়ে গিয়েছে। তখন ভৈরবের ব্রিজটা তারা ভেঙে দেয়। পাকবাহিনী যখন পেছনে হঠে আসে, তখন ব্রিজটা ভেঙে ফেলে। ইন্ডিয়ার সকল লোক হেলিকপ্টারে করে এসে আশুগঞ্জে এসে নামছে। যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, তখন ইন্ডিয়ানরা এসে সব জমায়েত হয়। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে যখন, তখন তাদের সবাইকে

নরসিংদী নিয়ে যায়। ৪৪,০০০ হাজার সৈন্যকে বিনিময় করেছে। পরে এদেরকে নিয়ে গিয়েছে পাকিস্তানি। আর বাঙালি যারা পাকিস্তানে বন্দি ছিল, তাদেরকে বাংলাদেশ আনে। মুক্তিবাহিনী বেশি মানুষ মারছে। যত বড়ো বড়ো মুসলিম লীগ নেতা ছিল, তাদেরকে ধরে এনে মারছে, কাটছে, গাঙ্গে নিয়ে গিয়ে ছাড়ছে। বারো আনা লোক ছিল পাকিস্তানের আন্ডারে। আর চার আনা দেশ স্বাধীনের আন্ডারে। তখন সবাইকে নিয়ে এসে এক করেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের তখন খাওয়া-পরা কীভাবে চলত?

সওদাগর: এখন যেভাবে চলে, সেভাবে চলত।

প্রশ্নকর্তা: জিনিসপত্রের দাম?

সওদাগর: না, কোনো ব্যাঘাত হয়নি।

প্রশ্নকর্তা: মানুষের ফসলের কোনো ব্যাঘাত হয়নি?

সওদাগর: না। সব ঠিকই ছিল। পাকবাহিনী একদিন যখন এখানে আসে, তখন ঐ পারের সব মানুষ এখানে চলে আসে। পাকবাহিনী একবার চরে আটকে যায়। তাদের লঞ্চ আটকে যায়। তখন এখানকার মানুষের মাঝে আতঙ্ক জন্মায় যে, তারা হয়তো আক্রমণ করবে। যখন লাইট জ্বলে তখন লোকজন ভাবে তারা আক্রমণ করতে আসছে। আসলে তারা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তা: তখন মুক্তিবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করেনি?

সওদাগর: না। তাদেরকে আটকায়নি। মুক্তিবাহিনী তো তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল না। যারা মুক্তিযোদ্ধা, তারা তো সাবধান হয়ে গিয়েছিল তখন। তবে যে এলাকায় রাজাকার ছিল, সে এলাকায় তারা রাস্তাঘাট চিনেছে। রাজাকাররা তাদের রাস্তা চিনিয়েছে। ওরা তো রাস্তাঘাট চিনতো না। ওরা তো শুধু একটা ম্যাপ নিয়ে ঘুরেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং যে হয়েছে, ঐগুলো মনে আছে না?

সওদাগরঃ যারা বাহির থেকে এসেছে, তাদেরকে আমরা টাকা-পয়সা দিয়েছি, খাইয়েছি। যারা ইন্ডিয়া থেকে এসেছে, তারা সেখান থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা সেগুলো খরচ করেনি।

প্রশ্নকর্তাঃ তারা ইন্ডিয়া থেকে চলে এসেছিল কেন?

সওদাগরঃ ইন্ডিয়া তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। ইন্ডিয়া তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। এখানকার মানুষের মাঝে তো এত অস্ত্র ছিল না। তখন ইন্ডিয়া তাদেরকে অস্ত্র সহযোগিতা করেছিল। এখানে যারা ছিল, তার মাঝে অনেকে আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য শুনে শখের বশবর্তী হয়ে দেখতে গিয়েছিল। তাহের মিয়া যখন চেয়ারম্যান ছিল, তখন আমি সম্পূর্ণ মাল পাবলিককে দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তাঃ নেতা-কর্মীদের নামগুলো কী কী ছিল?

মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের মাঝে প্রথমে চেয়ারম্যান ছিলেন রেজন মিয়া, তারপর লাল মিয়া, মিজান মিয়া, সুরুজ মিয়া, মোতালেব মিয়া। এরা ছিল মুসলিম লীগের নেতা। এরা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, বিদ্রুপ করে যে, দেশ স্বাধীন হবে না। তারা রাজাকার ছিল না। তবে হাসি ঠাট্টা করতো। পরবর্তীতে তাদের কী হয়েছিল? তাদের কিছুই হয়নি। তারা গ্রামেই ছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ তাদের ছেলেমেয়েরা এখন কই আছে?

সওদাগরঃ তাদের ছেলে-মেয়েরা এখন আরও বড়ো নেতা হয়েছে। গফরগাঁওয়ের ফিরোজ মিয়াকে মেরে ফেলা হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব-স্থানীয় একটি লোকই মুক্তিবাহিনী কর্তৃক মারা গিয়েছে। মুক্তিবাহিনী একটা সাইডে ছিল, আর মুসলিম লীগের নেতৃত্ব-স্থানীয় লোকেরা আরেকটা সাইডে ছিল। কিন্তু তারা আবার একজন আরেকজনকে আক্রমণ করেনি।

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব-স্থানীয়রা মুক্তিবাহিনীকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু তারা তাদেরকে বলতো, "দেশ স্বাধীন হবে না। তোরা দেশ স্বাধীন করতে পারবি না।" এটার প্রতিশোধ নিতে চাইলে দেশে স্বাধীনের পর মুক্তিবাহিনী তাদেরকে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু তারা তো করেনি। কেবল ঐ একটি লোকই মারা গিয়েছিল। নরসিংদীর খলিলুর রহমান প্রফেসর আর খাইয়েরকে ধরে

নিয়ে আসছে সবাই আমার কাছে যে, আমি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। পরে আমরা খুব সুপারিশও করেছিলাম। কিন্তু তারা বলল, বলেন না; বললেও কাজ হবে না।

ঐ একজনকে মারার পরই যত মুসলিম লীগের লোক ছিল, সবাই তাদের সাথে চলে আসে এবং বলে যে, ভাই আমরা তোমার সাথে আছি। ওরা চাইলেও কিন্তু রাজাকার হতে পারত। কিন্তু ওরা এরকম পজিশনে ছিল যে, ওরা এলাকার ছিল তো, তাই উল্টা হয়নি। ফিরোজ দখলদারের ছেলে ছিলেন তাহার। তাহারের ছোট্ট আরেকটা ভাই ছিল। আমাকে রাজ্জাক নামের এক মাঝি অনেক বড়ো উপকার করেছিল এই বলে যে, আলোবাড়ি না যেতে। ওইখানে....।

৪। হযরত আলী

আমি তো মুক্তিবাহিনীতে দুইবার গিয়েছি। কিন্তু মাই লাক ইজ ভেরি ব্যাড। আমি আব্দুর রাজ্জাক, আফগানি মাস্টারের ছেলে মন্টু মিয়া, একদিনে একইসাথে গিয়েছি। তাদের বডি আমার চেয়ে আরো হালকা। লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে তিনদিন ক্যাম্পে। ঐখান থেকে বেছে বেছে কর্নেল, মেজররা ট্রাক ভরে ভরে নিয়ে গিয়েছে। প্রথমবার ১৩ দিন থেকে টাকা-পয়সা নেই, খাবার দাবারও তেমন ছিল না। সকালে একটা রুটি, দুপুরের সামান্য কিছু ভাত, রাতে সামান্য কিছু ভাত, ডালের সঙ্গে পানি কুমড়া দিয়ে রান্না করে দেয়। দাড়ি(চাটাই) বিছানো। ইট মাথার নিচে। তখন প্রথমবার ছিল ফাল্গুন-চৈত্র মাস। দ্বিতীয়বার যখন গিয়েছি, তখন ছিল বৈশাখ মাস। মরিচাকান্দি বাজারটাতে পাঞ্জাবিরা আগুন দিয়েছিল। আমি আসার সময় আগুনের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন। মাধবদীর বর্ডার ক্রস করার সময় বুদ্ধি করে আমার তখন গামছা, লুঙ্গি, সেন্টু গেঞ্জি পরা ছিল। সেন্টু গেঞ্জি দেখলে তো আরো মনে করতো ছাত্র। তখন আমি লুঙ্গি-গামছা বেধে আস্তে আস্তে ধান ক্ষেত থেকে উঠিয়ে হেঁটে হেঁটে হাতে নিয়েছি......। এরপর নৌকা দিয়ে আসছি মেলা গাঙ ঘুরা; এরপর দেওয়ানের নৌকা দিয়ে বাড়ি আসছি।

লাইন ধরে প্লেট নিয়ে সবাই বসতো। সবাই একজন একজন করে খাবার দিত। প্রায় মানুষই ভাত আর ডাল দিয়ে খেয়ে ফেলত। সপ্তাহে একদিন গরুর মাংস

দিত। ঐ সময় তো ফার্মের মুরগি ছিল না। আর যে আটার রুটি দিতো, তা ছিল আমাদের বাড়িতে যে চটা বানায়, তার মতো করে। একটাই রুটি দিত। সাথে মিষ্টিকুমড়া আর না হলে ডাল। দাঁতের মাঝে বালি, পাথরের কতা লাগতো প্রায়শই। মানে খুবই নিম্নমানের আঠা। এগুলো ইন্ডিয়ায় খেতাম। এটার নাম ছিল হাঁপানিয়া।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের গ্রামের কী অবস্থা ছিল? জীবন স্বাভাবিক ছিল?

হযরত আলী: আমাদের গ্রামে কোনো সমস্যা হয়নি। পূর্বের মতোই সবকিছু চললেও একটা আতঙ্ক ছিল। একটা লোক চাচ্ছিল আর্মি আনার জন্য। তাকে পরে মুক্তিবাহিনী চোখ বেঁধে মেরে ফেলে। আমরা সবাই পরের দিন সকালে তার লাশ পাই। উনি রাজাকারই ছিলেন। আর রাজাকারদের সাহায্য সহযোগিতা করতো। পরেরদিন উনি পাঞ্জাবি আর্মি নিয়ে আসবে গ্রামে এরকম খবর শোনার পর মুক্তিবাহিনী তাকে আগের দিন রাতে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। উনি রাজাকারে নাম লিখেয়েছিল। হাত-পা বাঁধা, চোখ বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ক্ষেতে পরের দিন সকালে।

দেশ যেদিন স্বাধীন হবে, ১৬ই ডিসেম্বর, সেদিন দুইটা রাজাকার তারা সহোদর (একই মায়ের সন্তান) সেদিন বিকেল বেলা (কুমিল্লা জেলায় বাড়ি) তাদের মন্টু মিয়া আটকিয়েছে। ঐদিন দেশ স্বাধীন হলো। ছয়টা করে হেলিকপ্টার যেতে লাগল আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে। তখন দুইটা রাজাকারকে ধরে নিয়ে এসে মন্টু মিয়ার বাড়িতে মারধর করে। যখনই দেশ স্বাধীন হয়, তখনই উনারা; মানে রাজাকাররা জীবন বাঁচাতে যে যেভাবে পেরেছে, পালিয়েছে। উনাদের কথাবার্তা শুনে আন্দাজ করতে পেরেছে যে তারা রাজাকার। অনেক রাজাকার আবার অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছে মুক্তিবাহিনীকে।

প্রশ্নকর্তা: কীভাবে?

অনেক রাস্তা-ঘাটে যখন আর্মিরা থাকতো না, আর্মিদের জিপ থাকত না, তখন রাজাকারেরা মুক্তিবাহিনীকে সিগন্যাল দিত যে, রাস্তা ক্লিয়ার। যেমন বদনাবাড়িতে এখনও ব্রিজ আছে। এই দিক দিয়ে যদি বটতুলী যেতে হয়, তাহলে এই ব্রিজ দিয়ে যেতে হবে। আর কোনো বিকল্প নেই। এই ব্রিজের নিচে নৌকা দিয়েই যেতে হবে।

এছাড়া বিকল্প ছিল না। এই ব্রিজ দিয়ে পাঞ্জাবিরা অনবরত আসা-যাওয়া করতো, টহল দিত।

যখন পাঞ্জাবিদের কোনো ডিউটি ছিল না, আশেপাশের রাস্তা ক্লিয়ার ছিল, তখন রাজাকাররা ফাঁকা ফায়ার করেছে। তখনই বুঝা গেল রাস্তা ক্লিয়ার। তখনই দশ, বিশ, পঞ্চাশটা নৌকা মুক্তিবাহিনীর পাস হয়েছে। এভাবে সাহায্য করেছে। অন্য কোথাও না। আমি আব্বার সাথে পালপাড়া বাজারে গিয়েছিলাম। আমাদের বড়ো নৌকা ছিল, তাই বাঁশ কেনার জন্য গিয়েছিলাম। সেদিন আমাদের নৌকাটা রাতে রেখে দিয়েছিল। যেদিন পাঞ্জাবিরা ব্রিজটা উড়াইয়া দেয়, ব্রাশ ফায়ার করে, তখন অনেক বিকট শব্দ হয়। তখন যত নৌকা ছিল সকল নৌকা এখান থেকে ছেড়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: ১৬ই ডিসেম্বর এই এলাকার পরিস্থিতি কেমন ছিল বা আপনার অনুভূতি কেমন ছিল?

১৬ই ডিসেম্বরের দিন আমাদের এলাকা যেহেতু নরসিংদীর মাঝে সবচেয়ে নিম্ন এলাকা হচ্ছে চর এলাকা, সেহেতু এখানে তেমন কোনো উল্লাস ছিল না, লোকজন চলাচল ছিল না।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কোন সময়ে, কোন মাসে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলেন? আবার আসছেন কবে? ট্রেনিংটা কয়দিন ছিল?

হযরত আলী: আমাকে ট্রেনিংয়ে নেয়নি তো। ঐ যে বললাম, বাছাই করে করে নিয়েছিল। নিলে তো আমি মুক্তিবাহিনী সদস্যই হতাম সরাসরি। এমন অনেক লোক ছিল আমার থেকে হালকা। আমি, কাদির, মন্টু মিয়া (কামরুজ্জামান), আব্দুর রাজ্জাক, আমরা একসাথে গিয়েছিলাম। নিয়ে গিয়েছিল মাতোয়ালি বাড়ির বেপারির মেয়ের ঘরের নাতি। উনার বাবা চাকুরি করতো। ঐখান থেকে অবসর হয়ে এসেছে। আমরা তো রাস্তাঘাট চিনতাম না। আমাদেরকে বাতলে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা প্রথম গেলাম সলিমগঞ্জ। সলিমগঞ্জ থেকে নবীনগর। নবীনগর থেকে নৌকা দিয়ে গেলাম বকদর। বকদর থেকে গেলাম মাধবপুর বর্ডার। মাধবপুর বর্ডার ক্রস করেই ওপারে ইন্ডিয়ার হাঁপানিয়া। হাঁপানিয়া থেকে আধা কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে গেলাম আট আনা দিয়ে বাসে করে গেলাম আগরতলা। জয় বাংলা

অফিস। ঐখান থেকে স্লিপ দিলেই ক্যান্টিন-ক্যাম্পে ঢুকা যেত। তখন রেজন চৌধুরী ছিলেন, বাদলের বাপ বজলুর রহমান ছিলেন, তাঁর কথা আমরা শুনতাম।

পরিশিষ্ট: ৫

অনুলিখন: খুলনায় গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহ

(স্থান: খুলনা, তারিখ: ২-১২-২০২৩)

১) **এফজিডি-১**

আপনি ইন্ডিয়া গেছেন কয় তারিখে?

৫ তারিখে। আমি কিন্তু ৬৯-এর এই হুইপ বাবুর সঙ্গে। উনি এই মোল্লা সাহেবের বাড়িতে পার্টি করতো। পার্টির এখানে ছিল ইন্দ্রজিৎ জদ্দার। উনি ছিল এখানকার মুক্তিকমিটির লিডার। উনার নেতৃত্বে এখানে মোল্লা সাহেবের বাড়ি দখল করা নিয়ে একটা 'কেস' হয়ে গেল, তখন এই হুইপ বাবু ছিলেন গাঁওপাড়া স্কুলের মাস্টার। উনি কিন্তু গোলকপুর থেকে ছাত্র ইউনিয়নের ভিপি ছিলেন।

প্রশ্নকর্তা: হুইপ সাহেবের পুরো নাম কী?

নারায়ণ গুলজার: পঞ্চানন বিশ্বাস। ক্যানভাস ও থানা থেকে উনাকে সরিয়ে দিলো যে, আপনি সরে যান তা না হলে আমরা অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

প্রশ্নকর্তা: ১৯৭০ সালের এইটা?

নারায়ণ গুলজার: ভোট যখন হলো তখন উনার সাথে আমি ছিলাম আগামাথা। পরবর্তীতে খুব নিকটতম আমার আত্মীয় হয়। তারপরে তো গণ্ডগোল।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যুদ্ধের আগে কী করতেন? পেশা কী ছিল আপনার?

নারায়ণ গুলজার: আমি তখন পড়াশোনা করতাম। তখন ক্লাস নাইনে পড়তাম। এখানে কোনো স্কুল ছিল না, দূরের এক স্কুলে পড়তাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবার নাম? বাবা কী করতেন?

নারায়ণ গুলজার: চাষাবাদ। বাবার নাম পরিমল গুলজার।

আমি তখন পার্টি করি। পার্টিতে আমি সব ছোটো, ইনারা তখন সিনিয়র। গণ্ডগোল তো বেঁধে গেল। গণ্ডগোলের সময় আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করি। এই গণ্ডগোলে যারা বাংলাদেশের পক্ষে লোক তাদের অন্তত সাহায্য করার জন্য এই নিতাই বাবু, বোস বাবু (অস্পষ্ট) ছিলেন। এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের লোক তেমন ছিল না। এখানকার লোক বেশিরভাগই কমিউনিস্ট ন্যাপ করতো। আওয়ামী লীগের কর্মী হাতেগোনা দু'একজন পাওয়া যেত। সব কিন্তু ম্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি করতো।

প্রশ্ন: ম্যাপ কি মোজাফফর ন্যাপ?

নারায়ণ গুলজার: হ্যাঁ, মোজাফফর ন্যাপ। অজন্ত বাবু পার্টি করতেন। এই হুইপ বাবু করতেন ন্যাপ। এখন গল্লামরীর যেখানে ভার্সিটি হয়েছে, সেখানে আগে ছিল রেডিও সেন্টার। গণ্ডগোলের সময় ইপিআররা আসে ঘাঁটি করল। ইস্ট-পাকিস্তান পুলিশ যেটা, মুক্তিফৌজ হিসেবে আসলো। (অস্পষ্ট) বিক্রি করছি আমি নিজে, ডাব-চাল-ডাল। তখন তো দেশে এত স্বাবলম্বী ছিল না। দেশে খুব অভাব-অনটন ছিল। দেশে লবণ জল আসতো, অজন্মার মতো হয়ে গেছিল। এজন্যই এইখানে একটা বেড়িবাধ দেওয়া হয়। এইখানে বেড়ি দেওয়া হয় লবণ-জল ঠেকানোর জন্য। এদেশে (এই এলাকা) প্রায় অজন্মার লাইনে গেছিল। তখনকার সময়ে ৪০০ টাকা বিঘা জমি কেনারও মানুষ ছিল না। এইরকম অবস্থা আমরা গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে এনে ইপিআরদের খাবার দিছি শেষের দিকে। শেষের দিকে যেদিনকে খাবার দিতে গেলাম সেদিনকে হলো কী (অস্পষ্ট) যে স্কুলটা ওইটার পাশ দিয়ে নদী চলে আসছে। এখান থেকে গানবোট ঢুকে গুলি আরম্ভ করল আর্মি। তখন একটা খালে অবস্থান করি। আমার নৌকা ভরা জিনিসপত্র। তারপরও গিয়ে হটায় দিলো, হটায়া দিলে সেইখান থেকে চলে আসলাম। গল্লামারি সেন্টারে ওখানে দখল করা নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে মানে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধটা আরম্ভ করলো। এই অবস্থা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল তখনকার অবস্থা কেমন ছিল?

নারায়ণ গুলজার: যখন আক্রমণ করল... পাকবাহিনি যখন আক্রমণ করল তখন ওখানে ছিলাম না। কারণ কী? আমাগো তো বিভিন্নভাবে গুলি করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল। এখানকার লোকজন সব চলে গেছিল, কিন্তু তার আগে আমাদের উঠিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্নকর্তা: এই কাজটি কারা করেছিল?

ধরেন ওইপারে যে মুসলমানরা ছিল তারা করেছিল। তারা খানিকটা সুবিধা নেওয়ার জন্য আগে বিহারিদের ডাইকা লইয়াছে, তারপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের। বোঝাইছে এখানে মুক্তিবাহিনী লোক রয়েছে। বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে আর্মি এনে আমাদেরকে উঠে যেতে বাধ্য করেছে। গুলি করে বহু লোক মারিছে। আমরা জীবন বাঁচাতে চলে গেছি। আমার এই জীবনে একটা জিনিস হয়েছে; চেয়ারম্যান বাবুর বাড়ির সামনে যে খালটা ছিল এখন কালভার্ট হয়েছে, ওখান থেকে আমার সামনে গুলি করল ডক্টর সুনীল বাবুকে। উনার স্ত্রী, উনার ছেলে, আরো অনেককে মারলো আমার সামনে। যেমন আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল ইয়াং ছেলেপেলে দেখলেই ওরা গুলি করতো। আমার মা, ভাই-বোনকে টেনে নিয়ে ওরা পার হয়ে গেল। পরে তো আমি ওইখানে পেয়ারা বাগানের মধ্যে বসে রয়েছি। ভাবছি ওই দেশে সেনাবাহিনী আসলো। ৬৪ সালের রায়তে হাবিবুল্লাহকে হারাইলাম। আমাকে বললো হাবিবুল্লাহ ধরা খেয়ে গিয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি বলছি আমি তোমার কথায় ফিরব না। উনি ওই কথার পরে ফিরে আসলো। যখন দেখলাম আসার সাথে প্রথমে ধরে রাইফেল দিয়ে বাড়ি দিলো কী আছে বাইর কর তখন ওর সোনা দানা টাকা-পয়সা যা ছিল বের করল। বাইর করে দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে দিলো ২০-২০ জনকে। তার মধ্যে সিজন বাবু, (অস্পষ্ট) মেজ ভাই ছিল দীনেশ, ভালো লোক ছিল। ওরে কিন্তু লাইনে দেয়নি, পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। যখনই গুলি করল, গুলি করলে ও বাবারে কইয়া এইখান থেকে ওই তফাতে গিয়ে পড়ল। আমি কিন্তু পেয়ারা বাগানে লুকিয়ে আছি। আমি সব দেখতেছি কিন্তু আমাকে ওরা দেখতে পারবে না। চুকনগরে ওইখানে আমরা সবাই অবস্থান করলাম।

প্রশ্নকর্তা: ওইখানে কীভাবে হামলা হয়েছে?

নারায়ণ গুলজার: ওখানে হামলা মানে কয়েক হাজার মানুষকে মারিছে। পাশে বসে আছে যে ওর আব্বাকেও মেরেছে।

প্রশ্নকর্তা: ওখানের কোনো স্মৃতি মনে আছে আপনার?

না, চুকনগরের গুলির ভিতরে আমি ছিলাম না। ওইখান থেকে আর একটা গুলিতে পড়লাম ঝাউডাঙ্গায়।

প্রশ্নকর্তা: ঝাউডাঙ্গার কোনো ঘটনা আপনার মনে আছে?

নারায়ণ গুলজার: ঝাউডাঙ্গার ওখানে ব্রিজের ওপারে থাকলাম। ওপারে একসের গুলি করতাছে। পাখি মারার মতো গুলি ছুড়ছে। গুলি চলছে, গুলি কম হয়ে গেল কি না ওরা আর গুলি করতেছে না। রাস্তার লোক এত গেদারিং, মানে আমরা সব যাচ্ছি। আর্মি আসতেছিল আর খোঁচায় বেয়নেট দিয়ে। খোঁচায় রাস্তা ফাঁকা করতেছে। খোঁচা দিয়ে মানুষ পার করতেছে। সামনে গিয়ে একটা রাস্তার পাশে গেছি, দেখি পাটকে পাট হয়ে মানুষ পড়ে রয়েছে। ওইখানে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর বাবা মারা গেছে। আমি ডাকতাম টাকবাবু, টাকবাবু করে। তা আমি এখানে দেখে (অস্পষ্ট) মাকে বললাম, মা ওই যে টাকবাবু শুয়ে রয়েছে। নিচ দিকে মাথা, ঠ্যাং উপরের দিকে। ওখানে লোক যারা আহত হয়েছে তারা জল জল বলছে।

প্রশ্নকর্তা: ঝাউডাঙ্গা থেকে পরে কোথায় গেলেন?

ঝাউডাঙ্গার পাশেই ইন্ডিয়া। বর্ডার পার হয়ে গেলে ওরা আপ্যায়ন করে নিয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: কোন ক্যাম্পে ছিলেন?

নারায়ণ গুলজার: আমডাঙ্গা ক্যাম্পে।

পাশেরজনকে প্রশ্ন: দাদা আপনার বাবা চুকনগরের ওখানে মারা গেলেন, পরে আপনার পরিবারের অন্য মানুষজন ইন্ডিয়ার ওখান থেকে আবার ফিরে আসছেন কবে নাগাদ মনে আছে?

উত্তরদাতা: দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরে।

নারায়ণ গুলজারকে প্রশ্ন: তখন কি শুধুই পড়াশোনা করতেন না কি বাবার কাজে সাহায্য করতেন?

নারায়ণ: না, কোনো সাহায্য করতাম না। ওইখানে গিয়ে পড়াশোনা শেষ, আর দেশে ফিরে পড়াশোনা করি নাই। দেশে আজন্মা ছিল। কাজ করে সংসার চালাতে হতো। তখন সেই আটা খাওয়ানোর যোগ্যতা আমাদের ছিল না। আটার জাউ খাইত সবাই। মাইনসের কাজ-টাজ পাই, মাটির কাজ করি সংসার চলতো। এই সময়ের ডাল যেমন চুমক দিয়ে খায়, আটার ঘটাও সেভাবে খাইতে হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে তখন অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল?

নারায়ণ: হ্যাঁ, এক বছর পর থেকে আপনারা যেখানে গেলেন এখানকার আবাদের অবস্থা ছিল না। সব জমি অনাবাদি ছিল।

প্রশ্ন: যুদ্ধের আগে কি বছরে একবার চাষ করতেন।

হ্যা, আমন ধান।

প্রশ্ন: আপনাদের এই জায়গায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি কেমন ছিল?

নারায়ণ: এই গোটা অঞ্চলে হাতেগোনা কয়েকজন মুসলিম ছিল। না তবে এক নং ইউনিয়নের কয়েকজন ছিল।

প্রশ্ন: চট্টগ্রামের দিকে গিয়ে কেউ চাকরি করতো না?

নারায়ণ: উচ্চশিক্ষিত যারা তারা ইন্ডিয়া চলে যাইতো। আর সবাই এলাকাতেই থাকতো। এই বাংলাদেশ ছাড়া এত ভালো জায়গা কিন্তু এই পৃথিবীতে নেই। আমাদের পূর্বপুরুষ যারা এখানে আইছে সুন্দরবনের গাছ কেটে এইখানে পরিষ্কার করে বসতি করে তুলেছে। এই বাঘের সাথে, প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে লড়াই করেছে। জল পানিতে প্রভাবিত হয় এই জল খেয়ে কলেরায় মারা গেছে। এক বংশের সব খালি বিধবা পড়ে থাকতো। যে বাড়িতে ধরছে কলেরা সে বাড়ির সব শেষ। এর মধ্যে কয়েক পুরুষ বসবাস করেছে। তাহলে এই মাটিতে আমাগোর কত প্রজন্ম রক্তের সাথে কঠিনভাবে সম্পর্ক আছে। ইন্ডিয়াতে আমরা চাইলেই আমাকে বস্‌তি দিত। যেগুলো গেছে তারা চলে গেছে। বহু লোক আছিল যারা গরিব হয়ে গেছে, তারা চলে গেছে। তারা কিন্তু এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। এক একজনের গাড়ি-বাড়ি, নানান জায়গার মালিক।

অন্য আরেকজনকে প্রশ্ন: একাত্তর সালের অভিজ্ঞতা ও আপনাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাই। যুদ্ধের আগে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সম্পর্কে জানতে চাই আর কি।

উত্তরদাতা: কৃষি কাজ করে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করতাম।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তরদাতা: ৩০ থেকে ৩৫।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা সবাই একসাথে বের হয়েছিলেন ভারতের উদ্দেশ্যে? তার আগের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরদাতা: রাইতে গুলি করল। এই অনেক কিছু দেখছি আর কি।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিবারে কারা কারা ছিলেন?

মা-বাবা দাদি।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি তখন বিবাহিত ছিলেন?

হ্যা, সবে বিয়ে করেছি।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি আপনি চাষাবাদ করতেন?

হ্যাঁ। আমাদেরই বাপ-দাদার জমিতে চাষাবাদ করতাম।

প্রশ্নকর্তা: সবাই কি একসাথে বের হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, একদিনই রওনা হয়েছিলাম, বুধবার।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা তো গুলি ছোড়া দেখে এখান থেকে চলে গেছিলেন। নদীপথ কীভাবে পার হইলেন?

আমাদের এলাকাকে আঁটোসাঁটো হিন্দুস্থান কইতো। তখন সমস্ত হিন্দু আমাদের এইদিকে আইসা জমা হলো। খুলনা শহরের লোক আমাদের এদিকে আসে আশ্রয় নিয়েছিল। সাতক্ষীরা থেকে লোক আসতো। ওদের এলাকায় বড়ো বড়ো নৌকা ছিল। ওই নৌকার পথ ধরে এইভাবে পার হয়েছি। এইভাবে অবশ্য বহু জায়গায় রাজাকাররা এসেছে, মেরেছে। সবশেষে আমরা নদীপথে যাওয়ার অবস্থা থাকলো না। বাহিরে থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ আসছে। এমন কোনো বাড়ি নেই, স্কুল নেই, মাঠ নেই, সেখানে বরিশাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাজারের মানুষ তারা আমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। একদিনে ৪০০-এর উপরে নৌকা এসে আমাদের এখানে নামাইছে। পাকিস্তানি আর্মিরা তাদের ওই পথে ছিল, নেভি দিয়ে টহল দিত। ১৫০ নৌকা যাওয়া মানে ওই নৌকায় গুলি। কচুরিপানা যেভাবে থাকে,

এইখান দিয়ে এই নদীর পাড় দিয়ে লাশকে লাশ পড়েছিল। কখনো পুরো লাশ তো আর ছিল না, ছিল হাড়গোড় মাথার খুলি আর হাড় পরে। এইখান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার বাস ভরে ভরে এই হাড় উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এই গল্লামারি আর খুলনায় যত মানুষ মারিছে, তত আর কোথাও মারে নাই। এই মানুষগুলো ছিল নির্ভেজাল। আমি টাঙ্গাইল গিয়ে ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, আওয়ামী লীগের ছিলেন তার বাড়িতে আক্রমণ হলো। উনার বাড়ি আক্রমণ হলে উনি পায়খানার ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন। উনার বাড়িটা ছিল বড়ো। ব্যারিস্টার শওকত আলীর বড়ো বাড়ি যখন আর্মিরা এসেছিল, পায়খানার ভিতর কূপের মতো ছিল। যাইহোক, টাঙ্গাইলে আমাকে যখন বিশেষ অতিথি হিসেবে নিয়ে গেল, তখন আমি বললাম, ৩০ লক্ষ মানুষ মারলো, তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নিলো, ১ কোটি শরণার্থী হলো। তা আমি সেই এক কোটির ভিতরে একজন। তখন কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সবাই। আমাদের পূর্ব-পুরুষ যা করে গিয়েছিল, বাড়ি এসে কিছুই পাইনি। বাংলাদেশ হওয়ার পরে বহু সাল পরে থেকে আমরা ভাত খাচ্ছি। এর আগে তিনবেলা ভাত খাইনি। শরণার্থী যখন ছিলাম, আমাদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসা-প্রশিক্ষণসহ অস্ত্র দেওয়া, যুদ্ধ করা, এমন কোনো কাজ নাই যা ইন্ডিয়া গভমেন্ট করে নাই। কাঁটাতার পার হয়ে গেছি সাথে সাথে পানির গাড়ি, চিড়ের গাড়ি, গাড়ি আইছে নিতে। ওইখানে আমরা চাল ডাল মিলিয়ে খিচুড়ি খাইতাম। আহত মানুষের জন্য গাড়ি আসি রেডি থাকত। আহত ফ্যামিলিকে গাড়ি আসি নিয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কি তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন?

না আমাদের নেয়নি আগে। আহত লোকদের নিয়ে গেছে। ঝাউডাঙায় এত মানুষ মারা গেছে, এতো মানুষ আহত হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই, চিকিৎসা করার জন্য আগে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার নাম?

হায়াত মন্ডল (অস্পষ্ট)

প্রশ্নকর্তা: বাবার নাম?

সন্তোষ মন্ডল

প্রশ্নকর্তা: মায়ের নাম?

আনারতি মন্ডল

প্রশ্নকর্তা: আপনার বয়স?

৮০

প্রশ্নকর্তা: আপনার পেশা?

সেলাইয়ের কাজ করছিলাম। এখন বয়সের কারণে কিছু করি না।

প্রশ্ন: আপনার পরিবারে কে কে আছে?

আমরা স্বামী-স্ত্রী দুই জন আর ছেলে আছে একজন।

প্রশ্ন: দাদা আপনাদের সময়টা কেমন ছিল?

উত্তর: সময়টা খুবই চিন্তাযুক্ত ছিল। একমাত্র নৌকাই ছিল মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম।

প্রশ্নকর্তা: মাঝি যারা ছিলেন, তারা কি আপনাদের মধ্য থেকে ছিলেন না কি বাহিরের?

গ্রামের সবলোক একসাথে নৌকায়। দায়িত্বে সবাই, নিজেরা নিজের নৌকায় উঠে গেল চুকনগর। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি মাঝি। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে নৌকা ছিল তখন। ধান তিন টাকা মণে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের আগে আপনাদের ধানের দাম কেমন ছিল, ১৯৭০ সালের দিকে?

খাওয়ার পর অল্পস্বল্প বিক্রি করা যেত। তখন ১৫-১৬ টাকা ধানের মণ ছিল।

প্রশ্নকর্তা: গতকালকে যখন ডাকড়ায় ছিলাম, শুনলাম সেখানে হাট বসতো বুধবার করে। আপনাদের হাটে কী ধরনের জিনিসপাতি বিক্রি হতো?

শাকসবজি, চাল, ডাল, তিল অনেক কিছু।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কিছু বিক্রি করতেন না?

বাঁচার তাগিতে সহজে কেউ সম্পদ ছাড়তে চায় না। নিজের খেয়ে সম্পদ যদি থাকিতে পারে তখম বিক্রি করে। আর না হলে নাই। আমরাও সেরকম। যদি আমাদের সম্পদ দিয়ে কাজ হতো তাহলে আমরা কিনতাম না। সেই বাড়তি সম্পদ বিক্রি করতাম যেটা বেশি হতো প্রয়োজনের তুলনায়।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের পরে এসে কি সব ফিরে পেয়েছিলেন?

না কিছু না। সব লুটপাট করে নিয়ে গেল। বিক্রি করার কোনো কায়দা ছিল না তখন। সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: জমি ঠিকমতো ছিল কি?

জমি ঠিক ছিল। জমিতে লম্বা লম্বা ঘাস ছিল। জমি সব অজন্মা ছিল। আটা-ঘাটা খেয়ে খুব কষ্টে দিন তাই তো।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের পরে কি হাট-বাজার সব ঠিকমতো ছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

প্রশ্নকর্তা: দাম কীরকম ছিল?

চাল-ডালের তখন দাম কম হয়েছিল। তখন দাম কমই ছিল। যুদ্ধের আগের মতোই।

প্রশ্নকর্তা: বাজারে জিনিসপত্র কি কমে গিয়েছিল?

তখন অজন্মা ছিল। জিনিসপত্র তো কমেই গিয়েছিল, যা পাইতো তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। আমাদের জীবনগুলো খুব কষ্টের ছিল।

প্রশ্নকর্তা: নৌকাগুলোকে নিজের জন্যই রেখেছিলেন তা দিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে গেলেন?

হ্যাঁ। নৌকা বেয়ে চুকনগর গিয়েছিলাম। সমস্ত নদী নৌকায় ভর্তি ছিল। ওইখানে গেলে গোলাগুলি হলো, সব ফেলে রেখে চলে গেলাম। চুকনগরে যখন গুলি হয়, ভারতের সেনাবাহিনী ঝাউডাঙ্গা সীমান্তে রেডি হয়েছিল। কমান্ড দিলেই ফায়ার হতো। নৌকার আগে কত লোক আছে, পরে কত লোক ছিল তা দেখা যায় না।

যার জীবন সে নিয়ে চলে। বাবা মরে গেলে আমি তো বাবার পাশে ছিলাম না। গুলিগোলা হলো সব দৌড়াইয়া সেদিকে ছুটে গেছে। চুকনগরে ঠাকুরবাড়ি কাছে পুকুর আছে। পুকুরটা ছিল খুব গভীর। সেই পুকুরের মধ্যে লুকায় ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি আপনি জানতেন না আপনার বাবার কী অবস্থা?

না, পরে শুনেছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মা?

মা ছিল, ভাই ছিল আর বোন ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বোনটি ছোটো ছিল?

ছোটো বোন ছিল, দুই বোন মারা গেছিল আগে। এক বোন, আমি আর মা ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তখন কী করতেন?

আমি তখন পড়াশোনা করতাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবা কী করতেন?

বাবা কৃষি কাজ করতেন।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের এলাকার বেশিরভাগ মানুষ কি কৃষক ছিলেন?

হ্যাঁ, বেশিরভাগ মানুষ কৃষক। আমাদের বাড়ি এখানে ছিল না। আমাদের বাড়ি ছিল ওই থানার ৪ নং সুরখালি ইউনিয়নে। এদিকে এসে এখানে বাড়ি করেছি ৩০-৩৫ বছর হলো। ওখানকার বাড়ি এখনও আছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা সবাই কি একই ক্যাম্পে ছিলেন?

না না। বিভিন্ন ক্যাম্পে। এত লোক আমরা ছিলাম লবণরথ ক্যাম্পে। সেখান থেকে আমাদেরকে নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশ মানা ক্যাম্পে। ওইখান থেকে স্বাধীন হলে আমরা দেশে ফিরি।

প্রশ্নকর্তা: কলকাতার ক্যাম্পগুলো থেকে মধ্যপ্রদেশের ক্যাম্পগুলোতে খাবার-দাবার ভালো ছিল কি?

নাহ, আমাদের বাঙ্গালিদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ছিল না। পানি আমদের পরিবেশের সাথে মিলতো না।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে আপনারা দুর্গাপূজা করেছেন?

না, সেসময় মানুষ বাঁচতে পারে না আবার দুর্গাপূজা! ক্যাম্পে ৬০ হাজার লোক ছিল। আমাদের ক্যাম্পে মানুষের টান ছিল দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশে আসবে, কবে বাড়ি যাব। তবে স্থানীয়রা দুর্গাপূজা করেছে তাই একটু দেখেছি।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের পরবর্তীতে কি আপনাদের কোনো নেতা ছিল যিনি পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন? বা আপনারা সবাই তাকে সমর্থন করেতেন এমন কেউ?

আগে ছিল চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান থেকে এমপি হয়েছে। যুদ্ধের পরে তিনি নেতা হয়েছেন।

প্রশ্নকর্তা: সরকার থেকে কোনো সাহায্য বা অনুদান পাননি?

না, যা করেছি শুধু নিজেরাই করেছি। বা আমরা নিজেরাই করেছি। তখন যার যার জীবিকা সে নির্বাহ করতো যে যেভাবে পারে। যে যেভাবে পারে দুটো ফসল ফলায় যাতে খেতে পারি। সেভাবেই চলতো।

ধন্যবাদ দাদা

নারী

প্রশ্নকর্তা: আপানর নাম কী দাদি?

শান্তি মন্ডল

প্রশ্নকর্তা: বয়স?

৭০/৭৫ হবে।

প্রশ্নকর্তা: বাবার নাম?

সুরেন মন্ডল

প্রশ্নকর্তা: বাবার পেশা?

বাবা কিছু করতো না।

প্রশ্নকর্তা: মায়ের নাম?

স্বারদি দেবী মন্ডল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবার বাড়ি কোথায় ছিল?

ফুলতলা।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাচ্চা-কাচ্চা কয়জন?

৩জন। ২টা ছেলে, ১টা মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা: সবাই বড়ো?

হুম। আমার মেয়েটা বড়ো। যুদ্ধের সময় মেয়েটাকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ৭ মাস ওপারে থাইকা চলে আসছি।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের শুরুর দিকে আপনি আপনার বাবার বাড়ি যাওয়া-আসা করতেন?

হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: হাট-বাজারে যাইতেন?

না, কখনোই না। কোনোদিনই যাই নাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের খাবার-দাবার কেমন ছিল?

সেসময় ভালো ছিল। হাইফাই খাবার ছিল। মাছ-মাংস সস্তা ছিল। এখন যেরকম দাম হয়েছে, তখন এমন ছিল না। আগে ৪ আনার বাজার করলে অনেকদিন চলে যাইত।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের পরিবার কি যৌথ পরিবার ছিল?

আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আর ওই (স্বামী) লোক ছিলেন। আমার দিদি শাশুড়িরে নিয়ে গেলাম, ঐ পাশে গিয়ে মারা গেল গণ্ডগোলের সময়

প্রশ্নকর্তা: উনি কি ক্যাম্পে থাকতেই মারা গেছেন?

হ্যাঁ। রোগ-বালাই তো ছিলই। বয়স হয়েছিল ভালো।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের পরে এসে খাবার-দাবারে পরিবর্তন দেখলেন কেমন?

খুব কষ্ট রে বাপ! আমরা বাড়ি আইসা সব পাইলাম। জমিজমা, একটা গরুও আছিল। আমাদের বাড়িতে মুসলমান একটা ছেলে ছিল। ওপারে যাওয়ার মেলা কয়দিন আগে থেকে আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল তার। ও ছিল আমাদের বাড়িতে। সে কিছুই নেয়নি। আমাদের এখানে থাকত আর জমিজমা দেখে শুনে রেখেছিল। চাষাবাদ করেছিল কি না অতো মনে নেই এখন। আর জয় বাংলা হয়ে গেলে আমরাই তো বাড়ি এসে গেলাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনার সাথে পাড়া-প্রতিবেশি যায় নাই ভারতে?

না, যে যার মতো দৌড়াইল। কী কষ্টের মধ্য দিয়ে যে গেছি! স্থানীয় মুসলমানরা দৌড়ে চলে যেতে কইল।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের ভয় ছিল না যে মিলিটারি নারীদের ধরছে?

ভয় থাকবে নাহ!

প্রশ্নকর্তা: গতকাল ডাকরার দুইজন দাদি বললেন ওনাদের শাশুড়ি ওনাদের গায়ে কাঁদা মাখিয়ে দিতেন, মেয়েদের জোর করে শাঁখা পরিয়ে রাখত যাতেকরে বয়স্ক দেখা যায়।

সব জায়গায় এমন ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবা কি যুদ্ধের সময় ভারতে চলে গেছেন?

নাহ, আমার বাবা ৬৪'র রায়তের সময় ভারতে চলে গেল। আবার জয় বাংলা হইলে দেশে ফিরে আসছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মেয়েরা স্কুলে যায় নাই?

ছেলে-মেয়ে সবাই যাইত স্কুলে। আমি কোনোদিন স্কুলে যাই নাই। আগে পড়াশোনার এত চাপও ছিল না আরকি।

ধন্যবাদ

বয়স্ক লোক:

প্রশ্নকর্তা: ব্রিটিশ আমলের কোনো স্মৃতি মনে আছে আপনার?

২য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল, ১৯৪৫ সালে এরোপ্লেন গেছিল পশ্চিম দিক থেকে এক লাইন ধরে, ফিরি আসতে দেখি নাই অবশ্য।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবা কী করতেন?

আমার সাত বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন। তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনি বড়ো হয়ে কাপড়ের দোকান করেছেন?

আমি কাপড়ের দোকান করতে পারি নাই আর। আমার আরো দুই ভাই ছিল, বড়ো ভাই ছিল, ছোটো ভাই ছিল। আমি ছোটো থাকতেই আমার বাবা মারা গেল। পড়াশোনা আর হলো না। পড়েছি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত। ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠেই আর ক্লাস করতে পারিনি। তারপর সংসারের হাল ধরেছি। আমার সংসার যার কোনো সার নাই।

প্রশ্নকর্তা: পাকিস্তান আমলে আপনার পরিবারের আর্থিক অবস্থা, এলাকার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যদি বলতেন কিছু?

মোটামুটি ছিল সবকিছু। গরিবও ছিল, মহৎও ছিল; সবমিলিয়ে ছিল। পাকিস্তান আমল ভয়ের ছিল। দারোগা পুলিশ আসলে ঐ ভয় করতো। দারোগা পুলিশের সামান্য নাম শুনলেই ভয় করতো। এখন যেমন দারোগা পুলিশের সাথে খাওয়া-চলাফেরা সব হয়, তখন তেমনটা হতো না।

প্রশ্নকর্তা: পাকিস্তান আমলে আপনাদের জমি ১২০ বিঘার মতো ছিল। এখন কমে এসেছে না বেড়েছে?

নদী ভাঙন এসেছিল, পদ্মায় শেষ করেছে। যে জমিতেই আগে চাষ করেছি, সবকিছু করেছি; সেই জমিই ভেঙে গিয়েছে। মাছও মারতাম। সাথে ভালোরকম জাল ছিল আমার। আমার জাল বানানো দেখে বড়ো ভাই আমাকে পাগল বলেছিল। পরে আমার জালে মাছ বাঁধা দেখে বড়ো ভাই বললো তুইই কাজ

করেছিস। ১ মণ, দেড় মণ করে মাছ আসত। ৪টা মাছে হইতো ১ গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় ১মণ হইতো।

প্রশ্নকর্তা: মাছ কী শুধু নিজেরা খেতেন? না কি বিক্রি করতেন?

না, টাকায় ২, ৩, ৪টা করে বিক্রি করতাম। তখন চালনায় বন্দর ছিল। সেখানে তখন বিভিন্ন প্রকারের লোকজন থাকতো, বাইরের লোকজনও থাকতো। মোংলা পোর্ট তখন আসলে চালনা পোর্টই ছিল। আমি এক টাকায় ৬দিন কিশান ঘাটাইছি, আর এখন ৬০০ টাকায় একদিন।

প্রশ্নকর্তা: দাদা, যুদ্ধের সময় আপনাদের হাট-বাজারে জিনিসপত্রের দাম কীরকম ছিল?

৪ আনা কেরোসিন, সরিষার তেল ২ টাকা। তখন সম্পদ ছিল প্রচুর, কাজের সোর্স ছিল কম। কারণ হলো এক ফসল হতো। গরিব মানুষদের এক মৌসুমে কাজ থাকলেও আরেক মৌসুমে কাজ থাকত না। তাদের এক মৌসুমে ফসল হতো না। ৭৩/৭৪-এ একটা দুর্ভিক্ষ হয়, ঐ সময় একটু অভাব ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের হাট কী মঙ্গলবার করে বসতো?

এই হাটের আগের নাম ছিল জলমার হাট, এখন বটিয়াঘাটা হাট। এই হাটের চাল ছিল পুরো সেদ্ধ চাল, বলা হতো জলমার চাল।

প্রশ্নকর্তা: চালের কেজি কত করে ছিল?

৩ টাকা, ৫ টাকা, ৭ টাকা। সিদ্ধ চাল হতো পুরোটাই।

প্রশ্নকর্তা: লবণের কেজি কতো করে ছিল?

লবণ ৪/৫/৮ আনায় বিক্রি হতো। লবণের দাম বাড়িছে যুদ্ধের পর। ৮০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল।

প্রশ্নকর্তা: এতো দাম কেন হয়েছিল?

লবণ তো যুদ্ধের সময় উৎপাদন হয় নাই, লবণ চাইলেই বানানো যেত না। যুদ্ধের আগে আগে আর যুদ্ধের সময় লবণের চাষ হয় নাই। এছাড়া যখন পেটে খাবার

নাই তখন লবণ আমদানি করার চিন্তাও হয়নি। তখন তো গম কোথায় পাওয়া যাবে সে চিন্তা হইতো। বাধ্য হয়ে আটা খাওয়ার চল শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন। পেটের ক্ষুধায় লবণ ছাড়ায় আটা খাওয়া হতো তখন। যুদ্ধের সময় পিপাসা লাগলে অনেক সময় রক্তেমাখা কাদা পানিও খেতে হয়েছিল। যেমন, গলা শুকায় গেছে, কী খাবো! ওগুলোই খেতে হয়েছে। গুলির মধ্য থেকে যখন বেঁচে বের হয়ে গেলাম, মরলাম না, তখন লাশের ওপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছি। দুপুরের পরপর জৈষ্ঠ্য মাসের সময়, প্রচণ্ড রৌদ্রের মাঝে ফাঁকা মাঠে আমরা খাইছি। আমরা ঝাউডাঙ্গার ওখানে ব্রিজের উপরে উঠে গেছি। ঝাউডাঙ্গায় মাইটে কলশিতে পানি নিয়ে এসে দৌড়ে দৌড়ে সবাইকে খাওয়াইছি। একদল বাঁচাচ্ছে, আরেক দল মারি শেষ করছে। সাতক্ষীরার বহুত লোক আইছে। বলে আমাগো পথ দেখান। সাইকেল দিয়ে দেখে এসেছে পুলিশ আছে কি না বা আর্মি আছে কি না। কেউ যত্ন করে বাঁচিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বা রাখছে, আর কেউ যত্ন করে নিয়ে গিয়ে তাকে মারতেছে।

প্রশ্নকর্তা: দাদা, আপনি সপরিবারে গিয়েছিলেন ভারতে?

হ্যা, সবাই গিয়েছিলাম। আমার শ্বশুর ছিলেন এলাকার ধনাঢ্য একজন লোক।

১) এফজিডি-২

খুলনা-১ (ডাকরা, খুলনা)

শিশির কুমার বিশ্বাস: আজকে ১লা ডিসেম্বর আমরা ছিলাম ডাকরা, রামপাল, বাগেরহাট। মূলত আমরা জানতে চাচ্ছি এই হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম একেবারেই মফস্বল গ্রাম। এইখানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আথ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? মুক্তিযুদ্ধের সময় কী কী অভিঘাত, পরিঘাত।

স্যার আপনার পরিচয়টা?

উত্তরদাতা: জি, আমার নাম শিশির কুমার বিশ্বাস। শিক্ষকতা করতাম। ২০১৫ সালে অবসর নিই। ৭৯ সালে এই স্কুলে যোগদান করি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

উত্তরদাতা: এই জায়গাটা স্কুলের পশ্চিম পাশে।

নারী:

নাম: তামালিনি চক্রবর্তী

স্বামী: রফিল লাল চক্রবর্তী

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় কী ধরনের খাবার রান্না করতেন?

উত্তরদাতা: ভাত নামিয়ে, তরকারি নামিয়ে শুনি গোলগুলি হচ্ছে। ইন্ডিয়া দিকে চলে গেছি।

প্রশ্নকর্তা: এখন দেখি বাজারে মহিলারা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বসে তখন কি মহিলারা বাজারে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বসতো। হাঁস-মুরগি নিয়ে বিক্রি করতে যেতো।

উত্তরদাতা: আমাদের সোনা-দানা সবকিছু নিয়ে যায়। ঘর-দর সবকিছু নিয়ে যায়। রাজাকাররা সবকিছু নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: বাড়িতে যুবতি মেয়ে ছিল না?

উত্তরদাতা: মেয়েদের শাড়ি পড়িয়ে রাখতো যাতে করে বয়স্ক মনে হয়। আমাদের মুখে কাঁদা মাখিয়ে রাখা হতো যাতে করে কালো দেখা যায়। যাতে বয়স্ক দেখা যায়। আমাদের অনেক টেনশনে থাকতে হতো।

প্রশ্নকর্তা: আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছিল। জমা-জমি কেমন ক্ষতি হয়েছিল?

উত্তরদাতা: আমাদের জমা-জমি বর্গা ছিল। যুদ্ধের পর এসে এগুলো ফেরত পাই। কোনো সমস্যা হয়নি। সম্পর্ক ভালো ছিল। মুসলমানরা ভালো ছিল। এমনিই তাদের ভালো রাখতো। তারা অনেক ভালো।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা এখনও রান্না-বান্না করেন?

উত্তরদাতা: না, আমাদের বউরা রান্না-বান্না করে।

আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। বড়ো বাড়ি ছিল। সব আগুন ধরিয়ে দিয়ে সব শেষ করে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের পর আপনাদের অবস্থা?

উত্তরদাতা: আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়। আমরা দেশে রয়ে যায়। আমাদের শরিকরা ইন্ডিয়া চলে যায়। নদী ভাঙনে সব শেষ হয়ে যায়। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্নকর্তা: মূলত আমরা কথা বলছি স্মৃতিস্তম্ভের পাশে।

উত্তরদাতা: এই জায়গাটা দিয়েছিলেন জি সি বাবু। উনি এখানে নাই, চলে গিয়েছেন মোংলায়। সেখানে ব্যবসা করেন। এটি ২০১৩ সালে করা। নাহিদ সরকার পরে আরো একটা পদক্ষেপ নিয়েছে। সেটা এতো বড়ো না। ছোটো বা মাঝারি আকারে। এটি স্থানীয়ভাবে করা।

প্রশ্নকর্তা: তখন আপনার বয়স কত?

উত্তরদাতা: তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। আমরা এখানেই পড়াশোনা করি। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। তখন এটি এখানে ছিল না। নদীর অবস্থা এখানে ছিল না। নদীটা উত্তরে ছিল। এখানে অনেক জায়গা ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্নকর্তা: এই গ্রামে স্কুল কয়টা?

উত্তরদাতা: এই গ্রামে একটা হাইস্কুল, একটা প্রাইমারি স্কুল।

প্রশ্নকর্তা: ভোটার কেমন?

উত্তরদাতা: দুই মিলিয়ে একটা। ডাকরা ও কুমারখালী। সেন্টারের নাম ডাকরা। ১২৫০ ভোট। ঐ স্কুলটা এইখান থেকে ছিল। ১২৫ হাত লম্বা ছিল। ভেঙ্গে যাওয়ার পর সরকারিভাবে করা হয়। সুন্দরবনের ভালো মানের এখানে একজন এমপি ছিলেন- খুবের চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উনার প্রচেষ্টায় এটা। এখানের আরো স্কুল উনার করা। গিলাতলা, নদীর উপারের কালিগঞ্জ। নদীর পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকটায় পাড়া ছিল মুসলমান। উত্তর পাড়া ছিল হিন্দু।

প্রশ্নকর্তা: হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরদাতা: সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। আমরা দেখেছি। আমাদের বয়সে মামাদের, বাবা-কাকাদের সাথে মুসলমানদের ভালো সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্নকর্তা: স্কুলে যখন আপনারা পড়েছেন, তখন কতজন ছাত্র-ছাত্রী ছিল?

উত্তরদাতা: ২৫/২৬ জন হতে পারে ১৯৭২ সালে। ১ বছরে ২ পরীক্ষা হয়। পরের পরীক্ষায় পাস করে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিবারে কি শুধু আপনিই পড়াশোনা করতেন?

উত্তরদাতা: আমার বড়ো ভাই ব্যবসা করতো। আমার ছোটো ভাই পড়াশোনা করতো।

প্রশ্নকর্তা: ছোটোভাই কী করেন?

উত্তরদাতা: ছোটো ভাই ইন্ডিয়া। ঐখানে ডাক্তারি পাশ করে চাকরি করে।

এই দিকটা এখনো হিন্দু (স্কুলের পশ্চিম দিক) দক্ষিণ দিকটা মুসলমান।

আমরা যেখানে, ১৯৭১ সালে সেখানে ঘটনা ঘটে সেটা ছিল মন্দিরের পাশে মন্দিরসহ। সেখানে মূলত গণহত্যা হয়। মন্দিরটা যেখানে সেটাকে মন্দিরবাড়ি বলা হতো। তারাই দেখাশোনা করত। সেখানে একজন গুনিনবা তান্তিক ছিল। দেখা যাচ্ছে তিনি আমাদের রোগ বালাই হলে এসব দেখাশুনা করতো। এইভাবে গ্রামের সেবা করতো এবং আমরা দেখেছি অনেক সময় আমাদের জঙ্গলে অনেক গোল কাঠ দেখেছি। ঠাকুরবাড়ি দিয়ে এই পথ দিয়ে যখন যেত, তখন এই বাড়িতে থাকতো। ঐ লোকটার নাম বিনোদ চক্রবর্তী। তার আগে আমরা চেষ্টা করি এখানে তো আর থাকা যাচ্ছে না। তখন ভাবলাম ইন্ডিয়ায় চলে যাই। ১৫টা/১৬/২০টা বড়ো বড়ো নৌকার ব্যবস্থা করি। আমরা যখন নৌকায় উঠি রাতে, তখন গ্রামের মানুষ যারা ছিলাম নৌকায় গিয়ে আমরা জায়গা পায়নি। বাইরে লোকরাও নৌকায় উঠেছিল।

তার আশেপাশে অনেক শিষ্য ছিল। তারা ভাবছে যে গুরুদেবের সাথে যাবে। কারণ গুরুদেব এখানে আসে। আরো দু'তিন দিন আগে থেকে এখানে আসছে। সেখানে রান্না-বান্না করে খেত। সেখানে রাতের বেলায় যখন নৌকায় উঠি, তখন আমরাই জায়গা পাই না। কি করে যাবে। যখন যারা বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, তারা বলেন আমরা তাহলে আরো কয়েকটা নৌকা ঠিক করি। বৃহস্পতিবারে যখন আমরা রাতে যেতে পারলাম না। পরের দিন সকালবেলায় কিছু নৌকা ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করল। তখন দুইটা আড়াইটার সময়, সেখানে মন্দিরের আশেপাশে ঐখানে বাজার ছিল। বাজারে সিরাজ মাস্টার ওদের কিন্তু দুটো বড়ো নৌকায় তারা ছিল। এই জায়গায় যথেষ্ট লোক মারা যায়।

প্রশ্নকর্তা: এই জায়গার কোনো নাম আছে? যেমন তান্ত্রিক বাড়ি?

উত্তরদাতা: তাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতো। ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে।

প্রশ্নকর্তা: স্যার এই সময় এখানে ঘের ছিল?

উত্তরদাতা: না না ঐ সময় ঘের ছিল না। ঐ সময় এখানে ধান হতো।

প্রশ্নকর্তা: ৭১ সালের গ্রামটা কেমন ছিল?

প্রশ্নকর্তা: ফসল কেমন হতো? অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তরদাতা: গ্রামের অবস্থা বলতে নারিকেল, সুপারি ছিল প্রচুর। প্রত্যেক বাড়িতে সুপারি গাছ ছিল প্রচুর।

প্রশ্নকর্তা: স্যার, ধান উৎপাদন কেমন হতো?

উত্তরদাতা: এখানের প্রচুর ধান হতো।

প্রশ্নকর্তা: যুদ্ধের সময় কেমন ফসল হতো?

উত্তরদাতা : ৭১-এর সময় মানুষেরা যারা চলে যায়, তারা ধান রোপণ করেনি। যারা ছিল তারা ধান রোপণ করে। ঐখান থেকে যারা হিন্দুরা এসেছিল, তারা কিছু পেয়েছিল। (আমরা এখন উঠোনে বসছি) তখন খুব ভালো ধান হতো। প্রত্যেকের বাড়িতে প্রচুর সুপারি হতো। এখন কারোর বাড়ি এখন আর সুপারি গাছ নেই। সম্ভবত লবণের কারণে এরকম হয়। আমাদের এখানে চৈত্র মাসে প্রচুর লবণ আসে। এসব লবণ ছিল যে, পানি গালে দেওয়া যেত না। এর কারণে সুপারি গাছ নেই। এখন সেরকম নারিকেল গাছ নেই।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে ৭১-এর আগে কি লবণ-পানি ঢুকত না?

উত্তরদাতা: ছিল, এতোটা না। পানিটা আবদ্ধ থাকতো।

এই সেই মন্দির, যে মন্দিরের আশেপাশে ঘটনাগুলো ঘটেছিল। কিন্তু এই মন্দির এখানে ছিল না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পরিচয় ?

উত্তরদাতা: বাবা কেদারনাথ, (বুড়ো) আমার এক ছেলে, এক মেয়ে ছিল। বয়সে তারা খুব ছোটো ছিল।

বাসার: আপনার বয়স?

উত্তরদাতা: বয়স ৩৭ বছর।

উত্তরদাতা: স্যার, এই যে মন্দির দেখছেন, এই মন্দির এখানে ছিল না। পরে এখানে হয়। ৩০০ গজ উত্তরে ছিল। নদীটা ভেঙে এদিকে আসে। এটি নদীর কূলে ছিল। তখন এমপি ছিল খুবের চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি মন্দিরটা করে দিয়েছিল। একবারে নদীর ককূল ছিল। মন্দিরের পাশে বহু লোকজন ছিল। দুই/তিন দিন আগে থেকেই মানুষ জড়ো হওয়া শুরু হয়েছিল। আর নদীর কূলে লোকজন, আর এই বাজার আপনারা যে বাজার দেখছেন এইটা এখানে ছিল না। এই দিক দিয়ে শুরু করে। নদীর পাশ দিয়ে বাজার ছিল। এই বাজারের পাশে রান্না করে খাচ্ছিল। অনেক বড়ো ছিল।

প্রশ্নকর্তা: বাজারের গল্পটা শুনি?

উত্তরদাতা: অনেক বড়ো ছিল। লম্বায় ২০০ গজ ছিল। ঐখানে থাকার কিছু বসতি দোকান ছিল। প্রতি বুধবারে হাঁট ছিল। এই ঘটনাটা ঘটেছে শুক্রবার।

প্রশ্নকর্তা: হাটে মূলত কারা আসত? যেমন নদীর পাশে যে হাট বসতো, বাজারে কী নিয়ে আসতো?।

উত্তরদাতা: আচ্ছা, বাজার সাধারণত প্রতি বুধবারে বাজার বসতো। এখানে একটা নদী আছে, মাদারতলী নদী।

এখানে প্রচুর পরিমান ধান বিক্রি করতো। আর এমনে কাচামাল প্রচুর, কাপড়ের দোকান ছিল। প্রচুর সুপারি, নারিকেল বিক্রি হতো। অনেককিছু বিক্রি হতো। এই নদী দিয়ে আসতো, এই নদী মোংলার দিকে চলে গেছে।

৭১সালে যথেষ্ট বড়ো ছিল। এখন অনেক কমে গেছে। নদী আগের চেয়ে ছোটো হয়ে গেছে। সে-সময় যোগাযোগ ছিল নৌকা দিয়ে। এখন তো আবার নৌকা যোগাযোগ নাই। বাজার চলে ঐদিকে। বড়ো বড়ো দোকান ছিল।

প্রশ্নকর্তা: এটা ভাঙ্গছে কত সালে?

উত্তরদাতা: ৭১ সালের আগে ভাঙ্গা শুরু হয়েছে। ৭১ সালের পর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এদিকে চলে আসছে। আগের

মতো নাই। আমার বাবা একজন কৃষক ছিলেন।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা কী শুধু ধান ফলাতেন?

উত্তরদাতা: শুধু ধান হতো। এক ফসল হতো।

প্রশ্নকর্তা: কোন মাসে হতো?

উত্তরদাতা : আষাঢ় মাসে হতো।

প্রশ্নকর্তা: মানুষের আয়ের উৎস কি শুধু ধান ছিল?

উত্তরদাতা: হুম, আয়ের উৎস ধান ছিল। আমরা দেখেছি আশ্বিন মাসে মানুষের কিছু সমস্যা হলে তখন নারিকেল, সুপারি বিক্রি করে ঘাটতি পূরণ করতো। জীবিকা নির্বাহের জন্য ধানের বাইরে বড়ো উৎস ছিল নারিকেল, সুপারি। তখন ঘের বলতে কিছু ছিল না। বাংলাদেশ হওয়ার পরে ঘের শুরু হয়। তারও একটা কারণ আছে। লবণ এতো বেশি হয় যে, ধান রোপণ করলেও আমরা ধানের পাতা(গাছ) আর বানাতে পারি না। এতো লবণের চাপ ধানের পাতা আর হয় না। বাধ্য হয়ে আমাদের আর ধান লাগানো আর সম্ভব হয় না।

প্রশ্নকর্তা: পরিবেশ পরিবর্তন বা Climate Change-এর কারণে হয়।

উত্তরদাতা: এত লবণের কারণে ফসল হয় না।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে ঘেরে যাওয়া হচ্ছে একরকম বাধ্য হয়ে যাওয়া?

উত্তরদাতা: একরকম বাধ্য হয়ে যাওয়া। তখন আমরা বাধ্য হচ্ছি যে কিছু একটা করতে হবে। তখন আমরা বাধ্য হয়ে ঘের শুরু করি।

এটা শুরু হয় প্রায়...

(বৃদ্ধলোক):

প্রশ্নকর্তা: আপনারা ইন্ডিয়া কোথায় ছিলেন?

বৃদ্ধলোক: আমরা তখন প্রথমে ঠাকুরনগর যাই, বসিরহাট। পরে মানবোটা। আমার সাথে পরিবার সবাই ছিলেন।

প্রচুর লোক লাইনে। আমাকে কার্ড দেয়। আমি খুবের বাবুর ছাত্র বলি।

প্রশ্নকর্তা: এইটা একটু জানার দরকার ছিল যে, গণহত্যা যখন হলো তারপর আপনারা যাত্রাটা কখন শুরু করলেন?

বৃদ্ধলোক: আমাবতীর সময়। আষাঢ় মাসের ৬/৭ তারিখ আমাবতী হয়। ঐ সময় আমার ছিলাম। ভিক্ষা করেছি। বেতকাটা থেকে ফেরিখালী বাজার পর্যন্ত ভিক্ষা করেছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা একসাথে কতজন গিয়েছিলেন?

বৃদ্ধলোক : পরিবারে সবাই। মামার মা, মাসিমা। তারা মামার সঙ্গে। মামার ভাই, আমার মেয়ে। আমার মেয়ে ৩ জন অনেক ছোটো।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তখন কী করতেন?

বৃদ্ধলোক: আমি তখন নারিকেলের ব্যবসা করতাম। ২০০০ নারিকেলের চারা লাগিয়েছিলাম। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বিক্রি হতো মোড়লগঞ্জ, মঠবাড়ি। আমার ৮টা নৌকা ছিল। একশ মণি নৌকা।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তো তাহলে ব্যবসার সাথে জড়িত। আপনার পরিবারের অন্যরা কী করতো?

বৃদ্ধলোক: যার যার সুবিধার মতো কাজ করতো, অন্য ব্যবসা করতো।

প্রশ্নকর্তা: আপনি আর আপনার কাকা একসাথে ছিলেন?

বৃদ্ধলোক: আমি আর আমার কাকা একসাথে ছিলাম। আমার বাবা মারা যায় ১ বছর বয়সে। তারপর কাকা আর মাসিমার বিয়ে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের এখানে যখন গণহত্যা হয়, ঐ সময়টা কখন?

বৃদ্ধলোক: মনে হয় ১২টার দিকে।

অনিল কৃষ্ণমণ্ডল: রামপাল শান্তি মিটিং হলো। তারপর হিন্দুদেরকে লুট-পাট করে নিতে হবে। তারপর লুটপাট করা শুরু করলো। প্রত্যেক বাড়ি ঢুকে ঢুকে কার কি আছে মাল জিনিস নিয়ে আসে। আমরা তো ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম। আমরা এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলাম। তার পরেরদিন একত্র হই। তারপর কীভাবে ভারতে যাওয়া যায় ঐভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রশ্নকর্তা: আপনার এলাকার লোকই করেছে?

অনিল: আমাদের এলাকার লোক না। অন্য এলাকার

প্রশ্নকর্তা: যারা মিটিং করলো নাম বলতে পারবেন বা মনে আছে?

অনিল: রামপাল মিটিং হলো। মুজাম ডাক্তার মিটিং-এ ছিল অন্যতম। তারা মিটিং করেই তারা বলেছিল- তোমরা যারা আছো, হিন্দুদের যা আছে তা তোমরা নিয়ে নাও।

প্রশ্নকর্তা: আপনার পেশা কী?

অনিল: আমি ব্যবসা করি। এক জায়গায় মাতব্বর ছিল। লুটপাট রাতে হয়েছিল। তখন আমার বয়স ১৬ বছর। আমরা এক জায়গায় হই। মাদার তলিতে এক হই। কিছু লোক এপারে আর কিছু লোক ওপারে ছিল। তার মধ্যে আমাদের ডাক্তার বাবু হিন্দু ছিল, তিনি ভারতে যাবে না। চন্দ্রাখালিতে মুসলমান বাড়ি ছিল। উনারা সেই মুসলমানকে নিয়ে বলে আসে। ঐদিকে হাইউল ছিল, উনি এসে আমাদের ব্যাক দিলো তোমরা যেতে পারবা না, তোমরা ফিরে আসো। আমার গোলায় ধান আছে। মেশিন আছে। তোমাদের খাইতে দিব। আমরা সব অসুবিধা দেখব। পরে আমরা ফিরে আসি। পরে একদিন পর দু'দিন চাল দেয়, পরে আর দেয় না। তখন আমরা কী করব। কেউ ভিক্ষা করে, অন্যের ঘরে কাজ করে চলে। পরে দেখি চারপাশের লোক চলে যাচ্ছে। আমরা তখন কী করব। এভাবে আমরা আমাদের মাতব্বর ছিল। তখন তারা বলল যে, আমরা নৌকা করব। নৌকা নিয়ে এলো ৪খান। বুধবারে নৌকা নিয়ে উঠব। ঐ সময় দেখি লোক ভর্তি। অন্য এলাকায় থেকেই লোক আসে।.. .. .. .. উনি খুব নামকরা লোক ছিলেন। উনার সব শিষ্য এসে ভরে যায়। পরে আমরা আর উঠতে পারি না। এখন আমরা আর যেতে পারলাম না।

পরের দিন ভোরে আবার নৌকা নিয়ে আসে। আজকে তো আর আমরা যেতে পারব না। আমরা শুক্রবারে যাওয়ার পরিকল্পনা করি। শুক্রবারের বিকালে আমরা রওনা দিব। কিন্তু ঐদিন ২টার দিকে গুলি শুরু হয়। মানে শুক্রবারে নামাজের পর শুরু হয়। গ্রামের সব লোক এইভাবে পরিকল্পনা করে যে, আমরা একসাথে যাব। আবার কিছু কিছু অন্যভাবে আগে চলে যায়। আমাদের সাথে যায়নি।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে গণহত্যার আগে লোক যাওয়া শুরু করে?

হ্যাঁ, গণহত্যার আগেই যাওয়া শুরু হয়েছিল। লোক বেশি মারা যায় বাইরে লোক বেশি মারা যায়। কারণ বাইরে থেকে যারা আসে, তারা তো পথঘাট চিনে না। সেজন্য যখন অতর্কিত হামলা হয়, তখন তারা কোথায় পালাবে তা বুঝতে পারেনি। তাই তারা বেশি মারা যায়। আমাদের ডাকরা গ্রামের যায় ২৮জন। যেমন ধরেন আমি, আমি বেঁচে গেছি অলৌকিকভাবে। অর্থাৎ পথ-ঘাট চিনি। আমার বাঁচার কথা না। ধরেন নদী দিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে তারা আসে। আবার ঐখানে একটা নৌকা রেখে ঐদিক দিয়ে আসে। এখানে যা ছিল এইভাবে দুদিক দিয়ে আসে। আমরা প্রথম বুঝিনি, আমরা ভেবেছিলাম যদি সেনাবাহিনী আসে, ওরা তো আসতে পারবে না। পথে-ঘাটে, পুকুর-পাড়ে আসতে পারবে না। আসলে এটা আমাদের ভুল ধারণা ছিল। এরা তো কাছের লোক। সব পথঘাট চিনে। বেশি সংখ্যক লোক মারা গেল ঠাকুর বাড়ির ভিতরে। যখন নিচে ধানের জমির অনেকটা জায়গায় যখন লোকগুলো নেমে আসে, সেই সমস্ত লোকগুলোকে তারা গুলি করে মারে। সাব আমি এমন একটা জায়গায় ছিলাম। দেখতেছি গুলি হচ্ছে। আবার মাথা নিচু করছি মানে গুলিটা এমনভাবে হচ্ছে যে দুটি গ্রুপ দু'দিক দিয়ে চেখে আসছে। তার মধ্যে লোক বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। যারা দূরের লোক ছিল তাদেরকে গুলি করে মারে, আর যারা কাছে ছিল তাদেরকে বলল তোমাদের কাছে যা কিছু আছে দিয়ে দাও। আমি এদিক-ঐদিক তাকাই। আবার মাথা নিচু করি। তখন আমি এর ফাগা জানি সবকিছু দেখতেছি। আবার আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করি যাতে আমার গায়ে গুলি না লাগে। কিন্তু এমন পর্যায় হয়, আমি যেন একটু ভিতরে চলে আসি। ঐ সময় এগুলো লক্ষ্য করি। কোনো সেনাবাহিনী আসেনি। সব রাজাকার, আলবদর।

প্রশ্নকর্তা: ওরা সংখ্যাটা কেমন ছিল?

অনুমান হবে বড়ো নৌকায় ২৫জন হবে। ঐদিক দিয়ে নৌকায় সেটা দেখিনি। এরকম দুটো নৌকা আসে।

প্রশ্নকর্তা: এ যে আক্রমণ হলো, তার পিছনে কী কারণ বলে মনে করেন?

এটি একটি বড়ো প্রশ্ন। এই যে লুটপাটের কথা বলছি, তখন কিন্তু রামপালে মিটিং হচ্ছিল

জামাতে ইসলামী সে-সময় ছিল মুসলিম লীগ এবং এই মুসলিম লীগে যারা বয়স্ক ছিল, তারা সবাই মুসলিম লীগ ছিল। আওয়ামী লীগ ছিল, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিরা ছিল মুসলিম লীগ। যারা যুবক তারা হয়তো আওয়ামী লীগ করে।

প্রশ্নকর্তা: এই আক্রমণের পিছনে প্রতিবেশি মুসলমান জড়িত ছিল?

বাগেরহাট থেকে যারা আসে রজব আলী, তার গ্রুপটা যে এসেছিল। তারা লোকজন মারল, হত্যা করল, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ফাইলো। দূরের লোকেরা এই কাজগুলো করল। কাছের লোকেরা এই কাজ করেনি। তাদের একটা টার্গেট ছিল বিশেষ করে ইয়ং যারা তাদের মারা।

প্রশ্নকর্তা: এটার কারণ কী?

ইয়াংদের হত্যার কারণ হতে পারে তারা আওয়ামী লীগ করে এই জন্য। আমাদের গ্রামের একজন লোক আছে যার নেতৃত্বে হয়। সে কিন্তু লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। তার বন্দুক ছিল। যারা আহত অবস্থায় ছিল, সে আবার তাদের গুলি করে ফেলেছে। মানে যে লোকগুলোকে চিকিৎসা দিলে সুস্থ্ হয়ে যেতে পারতো।

প্রশ্নকর্তা: নামটা বলা যাবে?

তার নাম লিয়াকত গজনবী।

প্রশ্নকর্তা: তার ছেলে আওয়ামী লীগ কি না। তার ছেলে চেয়ারম্যান বা মেম্বার আছে এখন?

হ্যাঁ, এমন অনেক আছে। তার ছেলে আওয়ামী লীগ করে।

প্রশ্নকর্তা: সোনা-দানা কী নেবার ছিল?

অনিল: সোনা-দানা হিন্দু পরিবারের সবার কিছু কিছু ছিল। গহনা-কানা ছিল। সবাই মোটামুটি সামর্থ্যবান ছিলেন। আমরা ভালো ছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: গ্রামের বর্তমান আর্থিক অবস্থা আগের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক কেমন?

দুটোর মধ্যে তুলনা করলে একে-অপরের সহমর্মিতা ছিলেন। সেক্ষেত্রে কম ছিল। ঘোরাফেরা, খেলাধুলা

করেছি। সমস্যা ছিল যে, যা ধান পেত তা যদি কম হতো এবং তার পরিবারের জন্য যে ঘাটতি হলো তা পূরণ করতে সে পুষিয়ে নিত নারিকেল, সুপারি দিয়ে। তা দিয়ে না হলে মহাজনের কাছ থেকে পূরণ করতো। এই আর্থিক সমস্যাটা এখন আর নেই। আগের সেই কষ্ট নাই। সমিতিগুলো আমাদের লোন দেয়। এগুলো দিয়ে আমাদের সমস্যা মিটে যায়।

প্রশ্নকর্তা: পাকিস্তান সরকারের হিন্দুদের প্রতি একটা নেগেটিভ ধারণা ছিল। তার প্রভাব কি গ্রামে ছিল? পাকিস্তান রাষ্ট্র-কাঠামোতে হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক যে বিদ্বেষ ছিল?

ঐ সময় আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল। ঐরকম প্রভাব ছিল না। ঐ যে একজন দু'জনের নেতৃত্বে হয়েছিল। সামাজিক সম্প্রতি ভালো ছিল।

প্রশ্নকর্তা: আপনারা যখন বিপদে ছিলেন, তখন কেউ সাহায্যে করেছে কি না? যেমন, ভারতে যাওয়ার সময় কোনো স্মৃতি ছিল কি না বা বিপদে পাশে ছিল কেউ?

শুক্রবারে যখন গুলি হলো তখন লোকগুলো আমরা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমরা বেঁচেছিলাম যে কেউ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। আমার পরিবার দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল। বিশেষকরে মোংলার দিকে। ঐদিকে যাচ্ছি কেননা ঐখানে গেলে আমরা নৌকা পাব, যে নৌকা দিয়ে আবার ইন্ডিয়ার দিকে যেতে পারব। দেখা গেল, সেখানে কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হচ্ছে। এর ভিতর আবার আমাদের কিন্তু দেখা হচ্ছে না। রাতেরবেলায় আমরা গোপনে গোপনে এগোচ্ছি। যাতে দেখা না হয়। ঐখানে গিয়ে নৌকা নিলাম। আরো ৫/১০টি নৌকা ঠিক করলাম। বহুলোক যাচ্ছি একসাথে।

শিবসা নদী পার হয়ে গিয়েছি। দক্ষিণ পাশে জঙ্গল ছিল। উত্তর পাশে ঐ খাল দিয়ে যখন যাই, তখন পিছন থেকে একটি কার্গো এসে আমাদের ১৫/১৬ নৌকাকে এসে বলে আপনাদের পিছনে শত্রু আছে। এজন্য আমরা অনেকে নৌকা থেকে নেমে গেলাম। অনেক লোক ছিল। লোকগুলো ছিল অবদা সড়কের নিচে। তাদের ধারণা ছিল গান-বোট থেকে গুলি হলে মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। আমি বা আমরা এখানে থাকিনি। আমরা বড়ো বিল পাড়ি দিয়ে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর গান-বোট আসে। গান-বোট থেকে লোক এসে নামার পর দেখে যে যথেষ্ট লোক আছে। তাদেরকে পাখির মতো গুলি করে মারে। আমরা দূর থেকে দেখছি। এই লোকগুলোরে মারে। আমরা এখানে থাকলে আমরাও মারা যেতাম। গুলি করার পর এদিক-ওদিক ছিটকে চলে গেল।

আমাদের যেহেতু ঘিরে ফেলল। সে জায়গায় আমরা বসে আছি। আমরা ভাবছিলাম এত দূর গুলি করছে আমাদের কাছে আর আসার সুযোগ নাই। কিন্তু ঐ জায়গায় সেনাবাহিনীর লোক যাওয়ার রাস্তাঘাট আছে তারা যে জানে তাতো আমরা জানি না। ওরা কিন্তু সে জায়গায় যাওয়ার পরে যখন গুলি করছে। গুলি করলে আমরা এদিক সেদিক ছিটকে গেলাম। আমি কী করব। আমি তো কোনো জায়গা চিনি না। আমাদের এখানে ফগার বলে। যেটাকে আইল বলে। আইলের উপর নারিকেল পাতা, তারপর একটা অংশ উপরে নিচের একটা অংশ ছিল। আমি কিন্তু তখন (নারিকেলের পাতা দিয়ে অনেকটা জায়গা) পড়ে গিয়ে ফগারের ভিতর ঢুকে যাই। ঢুকে গিয়ে আমি আর মাথা উঁচু করতে পারি না। এখন দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। উপরে প্রচুর পাতা, একটু পাতা সরিয়ে নাকটা কোনোরকম উঁচু করে রাখলাম।

আর সময় ছিল ছোটো কাকড়ার সময়। জ্যেষ্ঠ মাসের সময় ছোটো কাকড়া ছিল। কাকড়া পা খামড়াচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারছি না। ঐখানে একই অবস্থা ছিল। ওরা এখানে এসে মেরে গেলো, তখন উঠে দেখি আশেপাশের বহুলোক গুলি করে ঘিরে ফেলে। এপর আমরা নৌকায় আর যাইনি। এরপর হেঁটে যাই তখন কোনো মানুষ বলছে "মামা বাড়ি যাচ্ছেন আপনারা। মামা বাড়ি যাচ্ছেন।" আবার অনেকে বলছে "হায়! কি কষ্ট" আপনারা ৪টি (কিছু মুড়ি) মুড়ি নিয়ে যান। চিড়া নিয়ে যান, তার মানে আমরা খুব কষ্টের মানুষ পাইছি। তবে মামা বাড়ি যাচ্ছেন এই কথা বলা মানুষের সংখ্যা একদম কম পেয়েছি। এর সংখ্যা কম। থাকার কষ্ট পেয়েছি এ

কথাটা বেশি শোনেছি। তখন গামলায় করে চিড়া, মুড়ি দিয়ে দেয় এছাড়া আর কি দিবে, তাদের মন।

প্রশ্নকর্তা: এখানে মারা গেলে লাশ দাফন কীভাবে হলো। মানে মুসলিম পাড়া প্রতিবেশি এসেছেন কি না? যেমন বলেছেন দু'চারজন লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। অন্যরা জড়িত ছিল না?

এখানে একজন দাঁতের ডাক্তার ছিল। সে করিছিল যে ঠাকুর বাড়ির ভিতরে যারা মারা গিয়েছিল, তাদের একত্রিত করে নারিকেল পাতা এটা-ওটা দিয়ে সে পুড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাকি যেগুলো ছিল, সেগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। বিলে যে অনেক লোক মারা গিয়েছিল, তাদের আর কিছু করা হয়নি। অনেক লোক তো দু'তিন দিন পরে গন্ধে এদিকে আর আসা যায় না।

প্রশ্নকর্তা: ভারতে যখন শরণার্থী হিসেবে গেলেন, তারপরে গ্রামের অবস্থা কেমন ছিল? যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর হিন্দু কমিউনিটির কেউ গ্রামে ছিল কি না?

ছিল।

প্রশ্নকর্তা: ঐ গ্রামে কী আক্রমণ হয়েছিল?

বৃদ্ধলোক: লুটপাট হয়েছিল। গ্রামের নাম ছিল বেতকাটা।

প্রশ্নকর্তা: যারা মুসলিম লীগে জড়িত ছিল, তারা লুটপাঠ করতো?

লুটপাঠ বলতে যেমন দেখা গেল, মিটিং-এ যা বলল সেটা লুটপাঠ বা জবরদস্তি করে হয়েছে। আমি তো থাকবো না চলে যাব। পাড়া প্রতিবেশিরা আমাদের জিনিসগুলো বলে নিয়ে গেল। ভাই তোমরা চলে যাচ্ছো, আমাকে দিয়ে যাও। যেমন, আমার ৫ টা গরু দিয়ে গেলাম। মূলত তাদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক ছিল। মানে Mutual সম্পর্কের মাধ্যমে।

প্রশ্নকর্তা: ২১ মে চলে গেলেন, যাইতে চাওয়া ভীতির কারণ কী?

যাইতে চাওয়ার কারণ হলো ঐ যে মিটিং হলো, ঐ মিটিং-এ বলা হয়েছিল যে হিন্দুদের লুটেপুটে নেওয়া।

একটা কথা বাংলা ছিল, “লুট পুট খাও।” ঐখানে মুজাম নামে একজন ডাক্তার ছিল। সে না কি বলেছিলেন- হিন্দুদের লুট, পুট খাও। কিছু কিছু গ্রাম আছে এ কথার শুনার পরে তারা কিন্তু তাদের সম্পদের দিকে তাকায়নি-ঐ রাতে চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা: নদীর ওপারে কি হিন্দু এলাকা আছে?

আছে।

প্রশ্নকর্তা: স্যার আপনারা যে ভারত চলে গেলেন, ঐখানের কী অবস্থা ছিল? বা শরণার্থী হিসেবে আপনাদের অবস্থা কেমন ছিল?

ঐখানে আমরা যেখানে গিয়েছিলাম, এটাকে বলে টার্কি স্টেশন। সেখানে প্রচুর লোক ছিল। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কিছু চাল-ডালের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পরে দেখলাম এখানে এই অবস্থায় থাকলে আমরা বাচ্চা নিয়ে বাঁচতে পারব না। ইন্ডিয়া সরকার একটা ব্যবস্থা করছিল যে তাকে পাঠাবে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় শরণার্থীদের পাঠায় এবং যেখানে পাঠায় সেখানে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমরা চলে গিয়েছিলাম মধ্য প্রদেশ। সরকার নির্ধারণ করলো মধ্য প্রদেশ যেতে হবে। আমরা ট্রেনে গেলাম। অনেকে আবার বিমানে গিয়েছিলাম।

প্রশ্নকর্তা: মধ্য প্রদেশে কয়দিন ছিলেন?

আমরা মধ্য প্রদেশে ছিলাম মে মাসের ২৪ তারিখ ভারত যাই। ঐখানে সর্বোচ্চ ১৬দিন ছিলাম।

বৃদ্ধলোক: এই দোকান খুলো। সত্যি কথা বলো বাড়ি কোথায়?

প্রশ্নকর্তা: কার্ড কি ঐখানে হয়েছিল?

বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের আত্মীয় আছে। এখন আমরা দু'জন তিনটা পরিবার নিয়ে গিয়েছি তা নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।

প্রশ্নকর্তা: যে চাল-ডাল পেয়েছেন তাতে কোনো সমস্যা হয়েছিল, মানে চলছিল?

তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না। রান্না করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠ দেওয়া হতো। তখন দু'টাকা করে দেওয়া প্রতি জনে। তারপর ৪টাকা করে দেওয়া হতো। কলকাতায় যারা ছিল তাদের অসুবিধা হতো।

প্রশ্নকর্তা: ঐখানকার একটা বিষয় জিজ্ঞেস করি, দূর্গা পূজা কেমন করে পালন হতো ক্যাম্পে থাকা অবস্থায়?

ঐখানে দূর্গা পূজা হয়েছিল সরকারিভাবে। প্রচুর লোক ছিল। তবে আমরা বেশ এনজয় করেছি। ভালো শিক্ষিত লোক ছিল। অনুষ্ঠানের ভিতর জাপানি মেয়েরা এসে অনুষ্ঠান করছে। জাপান থেকে আসছে। গান-বাজনা। মানে আনন্দ দেওয়ার কোনো ঘাটতি ছিল না।

প্রশ্নকর্তা: উৎসবমুখর কেমন ছিল আর এখন কেমন?

সে-সময় তো আসলে এতো কাছাকাছি পুজো হতো না। এখানে দূর্গা পুজো হতো এক জায়গায়। আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই একসাথে যেতাম।

প্রশ্নকর্তা: এখন যে সবার ঘরে ঘরে পুজো হয়। এটা কি সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য?

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তো আছে। অর্থনৈতিকভাবে এখন আগের চেয়ে ভালো। সবাই এনজয় করে সবাই।

প্রশ্নকর্তা: টাকা যত বাড়ে আন্তরিকতা তত কমে। এই জায়গাটা কেমন?

এটি তো বাস্তব কথা। কিছু কিছু লোক আছে যাদের আদিখ্যেতা আছে। সবাই আমাকে সম্মান করে। যাই

এনজয় করি। কিন্তু ভিতরে আমাদের আন্তরিকতা কম। তারপরও এটাও না থাকলেও হিন্দু-মুসলমান আমরা একটা সামঞ্জমতার মধ্য দিয়ে আছি।

প্রশ্নকর্তা: স্যার আপনারা সবাই ১৫দিন পর এসেছিলেন। কীভাবে এসেছিলেন?

আমরা একদম খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে আসি। তখন খুলনা থেকে বাগেরহাট রূপসা নদী পার হয়ে সন্ধ্যার দিকে ট্রেনে করে বাগেরহাট চলে আসি। আসার পর রাতেরবেলায় থাকি। সকালবেলায় ট্রেনে তারপর নৌকা করে বাড়ি আসি।

প্রশ্নকর্তা: বাড়ি এসে কী দেখেন?

বাড়ি একদম জঙ্গল হয়ে যায়। ৯মাস যেখানে আমরা নাই। পথঘাট আমার ঘর ছিল।

প্রশ্নকর্তা: ঘরের কী অবস্থা ছিল?

মন্ডল বাড়ি যেদিন গুলি হয়, সেদিন পুড়িয়ে দেয়।

প্রশ্নকর্তা: কতগুলো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়?

৪টা ঘর। ভাইয়ের ঘর, টিনের ঘর।

গোপাল: আমার নাম গোপাল চক্রবর্তী, গ্রাম: ডাকরা, কালীবাড়ির কাছে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাড়ির কে কে মারা গেছেন?

গোপাল: এখানে রজব আলী ফকির শুক্রবারে এসে সেদিন আমাদের মেরে দিয়ে গিয়েছে। একদিনে ৭৫০ লোক মেরেছে। আর আমরা ব্রিজের নিচে পালিয়ে জীবনটা কোনোরকমে রক্ষা করেছি। আর বাবা, জ্যাডা মশাই, বাবার বড়ো ভাই, ফুফাতো ভাই, ফুফা, শ্বশুর, আরেক কাকার ছেলে, মার কাকা। আমাদের সংসারে ৫/৬ জন মারা যায়। মার একজন ভগ্নিপতি এখানে এসেছিলেন। সেও মারা গিয়েছিলেন। তারবাড়ি ছিল তানেশ্বর।

প্রশ্নকর্তা: ভারতে গিয়েছিলেন না দেশে ছিলেন?

গোপাল: আমরা ভারত যেতে পারিনি। বর্তমান যে চেয়ারম্যান, তার বাড়ি ছিলাম। কাটাখালি হাওলাদার বাড়ি। আমিও যেতে পারিনি আমার ভাইও যেতে পারেনি।

প্রশ্নকর্তা: আপনি তো দেশে ছিলেন। ঐ সময় ঠিক হাটবাজার হতো?

গোপাল: আমি কাটাখালি গিয়েছি। আর দেশ স্বাধীন হলে আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। কাটাখালি অল্প অল্প হতো। আর আমাদের ডাকরা কী হতো জানি না।

প্রশ্নকর্তা: সবাই যখন ফিরে আসলো তখন এইখানকার অবস্থা কেমন ছিল?

গোপাল: আমি কি করে বলব, আমি তো আসিনি। তখনো ভালো ছিল। মরা মানুষের হাড় গুছিয়ে আগুন দিয়েছে এখানে একটা ভিটের উপর।

প্রশ্নকর্তা: দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় কেমন ছিল?

গোপাল: মানুষ একটু খোঁড়া হয়ে গেল.....

প্রশ্নকর্তা: ভারতে ক্যাম্পে আপনাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন?

চব্বিশ পরগনার আমডাঙ্গা ক্যাম্পে ছিলাম। এটি বারাসাত থেকে উত্তর দিকে ছিল। সেখানে আমাদের এদিকের লোকজনই ছিল বেশি। সেখান থেকে ট্রেনে করে বারাসাতে নিয়ে যায় আমাদেরকে। বারাসাত আর সাধনপুর ক্যাম্প দুইটি ছিল পাশাপাশি। আমডাঙ্গা থেকে বারাসাত, তারপর সাধনপুর ক্যাম্পে যাই আমরা। সাধনপুর ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শিবব্রত সেন। আমডাঙ্গায় আনন্দ বাবু ছিলেন দায়িত্বে। ছিল অনেকেই। আনন্দ বাবু, অরুণ বিশ্বাস ছিল। ক্যাম্পে তাবু দেওয়া ছিল ঠিকই, তবে আমরা থাকতাম না। আখের পাতা দিয়ে ছোটো করে ছাপড়া বানিয়ে থাকতাম। ক্যাম্পে চাল, ডাল, তেল দিতো।

প্রশ্নকর্তা: রান্না করতো কারা? রান্নার কাঠ কোথায় পাওয়া যেত?

গোপাল: কাঠ দিত, কিন্তু তা দিয়ে হতো না। গ্রাম থেকে আনা লাগতো। মাইনসের বাড়িতে কাজ করা লাগতো। স্থানীয় অনেকে খাতির দিতো, যত্ন করতো। আমডাঙ্গায় এক বন্ধু আমাকে ডাকত অমল বলে। বলল তার সাথে দৈনিক যেন কিছু কর্ম-টর্ম করি। সে জ্বালানি-টালানি দিতো। একদিন কাজ করলে ১টাকা, দেড় টাকা বা ২টাকা দিতো। উনার ফ্যামিলিতেই ৬/৭ জন ছিলেন। বাচ্চাগুলো ছোটো ছিল।

প্রশ্নকর্তা: দূর্গাপূজা করেছিলেন ক্যাম্পে থাকতে?

গোপাল: আমার তেমন খেয়াল নাই। ৫০ বছরের বেশি আগে তো, মনে থাকে না। আমডাঙ্গা থেকে বাসে নীলরতন (অস্পষ্ট) হাসপাতালে যাওয়ার জন্য শ্যামনগরে নামি, নীলরতন হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে ৩টার দিকে ধর্মতলা থেকে ৭/৮জন মিলে চিড়িয়াখানা যাই। ধর্মতলা থেকে সিদ্ধিরপুরে বাসে উঠেছিলাম। আমরা শরণার্থী বলায় পয়সা নিলো না।

চিড়িয়াখানা দেখলাম। তারপর বাড়ি আসব আর বাস পাই না। আমাগের দেখলেই কয় 'জয় বাংলা'। এরকম পাকা রাস্তা, চিকন একটা রাস্তা দিয়ে গেছিলাম। যাইতে যাইতে আশেপাশে সব দেখতে দেখতে যাইতাম। পাঁচটার দিকে বর্ষা পড়তাছে। এখন যাব কী করে! বললাম হাঁটো! সবাই বলল যাব কোথায়? আমি হাঁটা দিলাম সবার আগে কিন্তু আমি আগে থেকে পথ দেখাতে পারলাম কী করে? কারণ যাওয়ার সময় আমি বাসের জানালার পাশে বসছিলাম, আমার সব মনে আছে। কোন গাছ কোথায়, কোন সাইনবোর্ডে কী লেখা, সেসব মনে ছিল বলে। ক্যাম্পের বাহিরে গেলে এভাবেই হতো।

প্রশ্নকর্তা: দেশে কবে ফিরে আসলেন আপনারা?

গোপাল: দেশে আইছিলাম মাঘ মাসের শেষে ধান-টান কাটা হয়ে গেছিল তখন।

ধন্যবাদ দাদা।

নির্ঘণ্ট

অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ২৮

অপারেশন সার্চলাইট ১৫, ১৬, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ১৩৯,

আবদুস সোবহান ২৩, ৪৯, ৫০, ৫১, ১৫৫

আব্দুল খালেক ১৯, ৩৮, ৪২, ৭৩, ১৪৭, ১৫৫, ২০৭

আব্দুল জলিল ১৪৭

আব্দুল মজিদ ১৪৭

আব্দুস শহীদ ১৪৭

আব্দুস সামাদ ১০৮, ১৪৭, ২০৬

আমির হোসেন ৪১, ৪৪, ৮১, ৮২, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৪৩, ১৬১, ১৬৯, ১৭৯

আলী আক্কাস ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯৩, ৯৪, ১৪৩, ১৫৫, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩

আলী হোসেন ২৪, ১৪৮

আহমেদ আলী ১৮, ১৯, ১৪৮

ইকবাল হল ১৫, ৫১, ১৭৯

উমা রানী ৩৬, ৫৩, ৫৪

এ. কে. এম আব্দুল্লাহ ভূঞা ১৪৮

খগেন্দ্র চন্দ্র দে ১০৬, ১৫৫, ২১৪

গিয়াসউদ্দিন দেওয়ান ৪০, ৭৬, ৯৬, ১৪৮

গীতা রানী ২০, ২২, ৩৬, ৬১

গোপাল চন্দ্র দে ৩০, ৬৪, ৬৫, ৬৬

গোপাল দাস ১৭, ১৮, ৮৪, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৪৩, ১৫৭, ১৫৮

গোবিন্দ চন্দ্র দেব (জি.সি.দেব) ২০, ৭০

চান্দ দেব ৬৮, ৬৯

চিৎবল্লী ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

চুন্নু মিয়া ৭৫, ৭৭, ১০৩, ১৪৯

জওহর লাল রাজভর ১৪৯

জগন্নাথ হল ৫, ৮, ১৫, ২৯, ৩০, ৩৩, ৪০, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৬৮, ৭২, ৭৮, ৯৩, ১০৬, ১১২, ১১৯, ১৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৮১, ১৮৭, ২০৫, ২০৬, ২১৪, ২১৫

জমিলা খাতুন ২১, ৫১, ১০৫, ১৪৩

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ৩১, ৬৪, ৬৫, ৬৬

ডাকসু ১৭, ১০১, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৯৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ২৪

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ৬১, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮১

দাসুরাম রাজভর ১৪৯

দুঃখী রাম মন্ডল ১৪৯

নমী রায় ২৭, ৪২, ৫২, ৭৬, ৮০, ১৪৯, ১৫৬

নুরুল ইসলাম ১৫০

নেওয়াজ আলী ৩৬, ৩৭, ৭৩, ৭৭, ১৫০, ১৫৫

নোনা মিয়া ১৫০

পীর মোহাম্মদ ওরফে পিরু মিয়া ১৫০

প্রিয়নাথ রায় ১৫১

ফুলবানু বেগম ৭৪, ৭৫, ৭৭

বকুল রানী দাস ১৯, ৩৫, ৫২, ৫৩, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৩

বাসনা দে ২৯, ৫৮, ৫৯, ৬০, ১০৬, ১০৭, ২১৭

বাসন্তী গুহঠাকুরতা ৩১, ৬৬

বাসুদেব ১৫১

মধুর ক্যান্টিন ১৭, ৮২, ৮৪, ৯০, ১১৮, ১৪৩, ১৫১, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৭৬, ১৮০

মধুসূদন দে ১০, ২৫, ৬৩, ৬৮, ১১৫, ১১৬, ১৫১

মনভরণ রায় ৫৮, ১১২, ১৫২

মনির হোসেন বাচ্চু ৪৪, ৫৫, ৮৩, ১১৯, ১৩০, ১৭৩, ১৭৪

মিস্ত্রী রাজভর ২২, ১৫২

মোঃ মনিরুদ্দিন ১৫২

মোঃ শামসুদ্দিন (শামসু মিয়া) ১৫২

মোশারফ ১৯, ৮৫, ৮৬, ১১৫, ২০৮

মোহসীন ৪০, ৪১, ৭৫, ৭৬, ৮০, ২০৮

রাজকুমারী দেবী ২০, ২৫, ২৬, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ১১১, ১১২, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯

রেনুবালা দেবী ২৮, ১০৭

রোকেয়া হল ৯, ১৫, ১৮, ৪২, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১০৩, ১০৫, ২০৬

লাড্ডু লাল ১৫৩

শিববাড়ি ২১, ২৫, ৩৪, ৫১, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৮২, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৫, ১৫০, ১৬২, ১৭০, ১৭২, ১৭৭, ১৮১, ২১০, ২১৫

শিবু মোদক ১৫৩

সিরাজুল হক ২৪, ১৫৩

সুনীলচন্দ্র দাস ১৫৩

সুনীলচন্দ্র দে ১৫৪

সোলায়মান খান ১৫৪

সোহরাব হোসেন ২৪, ১৫৪

হাবুল মিয়া ৩৯, ৭৬, ৭৭, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০৪

হাসিনা হাফিজ ৩৬, ৩৭, ৭২, ৭৩, ৭৭

হোসেনী দালান ১১১